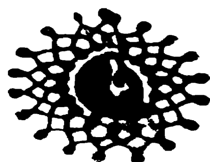
গঙ্গা থেকে টেমস

গঙ্গা থেকে টেমস্

কৃষ্ণা দত্ত



নবপত্র প্রকাশন

আমার দেশের মাটিকে

এক

শনিবার। লণ্ডন আরাম করে আড়মোড়া দিয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। ঘরে ঘরে এলার্ম ঘড়ি বেজে ওঠে না। গতকাল কাজের বা কাজের ভান করা কাজের শেষে অধিকাংশ ক্লান্ত লণ্ডনবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলে, উইকএণ্ড—পুরো ছুটো দিন ছুটি। কিন্তু ঘর-ক্লান্তরা বিরক্ত হয়ে ভাবে—ইস ছুটো দিন কেমন করে কাটবে!

শনিবার, ফলে অফিসে যাবার তাড়া নেই সত্যি, কিন্তু রাস্তাঘাটে মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাড়ির ভিড়। বাসগুলি বিরাট লাল সবুজ দেহ নিয়ে কোনরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। দোকান-বাজার জমজমাট ছ-টা পর্যন্ত। কনসিউমার সোসাইটি একেবারে ক্ষেপে যায়। শপিংয়ের দিন।

কত কাজ। সপ্তাহের বাজার করে ফ্রিজ আর ফ্রিজার আর তাক ভর্তি করে রাখা, ঘর বাড়ি পরিষ্কার, মেরামত—কাজের কি শেষ আছে! এ দেশের ডবল কাজ ভারতীয়দের বাড়িতে, অতিথি আপ্যায়ন তো লেগেই আছে।

দশ বছর আগেও উত্তর লণ্ডন উডগ্রীনে বলতে গেলে ইংরেজদেরই রাজত্ব ছিল। দীপক শুয়ে শুয়ে ভাবে। পাশের বাড়ির কর্কশ গলার গ্রীক ভাষা কানে আসে। এখন রং আর কালচারের বাহার হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে ভারতীয়, হুহু করে এসেছে উগাণ্ডা কেনিয়ার ভারতীয়রাও, ওদের এদেশে বলা হয় উগাণ্ডা বা কেনীয়ান এশিয়ান—ভারতীয় নয়। তাছাড়া টার্কিশ আর গ্রীক-সিপ্রিয়ট আর কিছু ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দখল করে বসেছে এ অঞ্চল। আর আছে আইরিশ। বহু ইংরেজ আস্তে আস্তে বাড়ি দোকান

বিক্রি করে সরে গেছে হয়তো তথাকথিত ভদ্রপাড়ায় অথবা লণ্ডনের বাইরে। কোথায় ওরা চলে যায়? দীপক ভাবে।

বিছানা থেকে উঠতে উঠতে দীপক নিজের মনে মনে বলে, আমরা ওদের দেশে বাস করে ওদের নূন খেয়ে হরদম ওদেরই গালাগাল দিচ্ছি। ওরাও আমাদের গালাগাল দেয়। এমন সুন্দর সোনার লণ্ডন গুচ্ছের বিদেশী এসে লুটেপুটে খাচ্ছে। চেঁচামেচি করে নোংরা করে জবরদখল করে বসছে। দীপক নিজের মনেই হাসল। শ্বেতশুভ্র লণ্ডন, কালো বাদামী, হলদে, অধিবাসীতে আর ট্যুরিস্টে ভরে গেছে। কোথায় যাবে শ্বেত বৃটিশ?

কদিন হল হঠাৎ গরম পড়েছে। আবার হয়তো দুদিন পরে বরফ পড়বে। মৌসুমি ফুলে, ফলে, সবুজে, রোদ ঝলমল করে উঠেছে। রোদের তাপ বাড়লেই ওদের মুখে হাসি, উলবিহীন বেশবাসের কত বাহার। দীপক পর্দা সরিয়ে দেখল এক তরুণী পুশচেয়ারে বাচ্চাছেলে নিয়ে বেরিয়েছে। সুন্দর পা দুটো, ব্রা'র রেখাবিহীন ফিনফিনে ব্লাউজ। খারাপ লাগে না দেখতে। ডাকল, মলি ওঠ। ভারি সুন্দর দিনটা।

হুঁ। মলি পাশ ফিরে শুয়ে শুয়েই উত্তর করে।

চা এনে দেব?

না।

দীপক রান্নাঘরে নেমে চা তৈরি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চায়ে সিপ করল। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যায় খেলার মাঠ। শান্ত সবুজ। অলসভাবে যেন জিরিয়ে নিচ্ছে। ছেলেমেয়েরা দৌড়-ঝাঁপ করতে এল বলে। গাড়ি ছুটে চলেছে একটার পর একটা।

শ্যামবাজারের ভিড়ে ওর জন্ম, বড় হওয়া। বাথরুম ছাড়া যে একা হওয়া যায় সে জানত না। আর বাথরুমেই কী শান্তি ছিল? কে ঢুকেছে? দুমদাম। কতক্ষণ লাগে এতটুকু ছেলের! দীপক একটু দুঃখ-আমোদ মেশা হাসি হাসল।

ঐ বাড়িতে উপরে নিচে দুটি বাথরুম। নিচেরটা ও নিজে করিয়ে নিয়েছে। মলি ঠাট্টা করে বলেছিল বাড়ির আর কোথাও কিছু হোক না হোক বাথরুম তোমার আগে চাই। বাথরুমে বসে কি তুমি পুজো কর? সত্যি বাথরুমে ঢুকলে নিশ্চিন্তি।

পরীক্ষার সময় অসহ্য লাগত ভিড়। এখন এ বাড়িতে টু শব্দটি নেই। হাঁফ ধরে যায়। দীপক চা খেতে খেতে ফ্রিজের ওপর রাখা ট্রানজিস্টার চালিয়ে দিল। খবর বলছে: মিসেস থ্যাচার মস্কো অলিম্পিক বয়কট করার ডাক দিয়েছেন। দীপক বোতাম টিপে শব্দ বন্ধ করল।

তনি, তপু চলে যাওয়ার পর বাড়িটা যেন শীতের ফাঁকা মাঠ হয়ে গেছে। কাজ যদি না থাকত, দীপক মনে মনে বলল, আমি পাগল হয়ে যেতাম। সে নিজেকে আশ্বাস দিল, আর তো কটা মাস। তনি চলে এল বলে! আর তপুর ছুটি তো এসে গেছে, যে কোনো দিন সেও হুট করে এসে হাজির হবে।

তপুর সঙ্গে যদি সে কথা বলতে পারত। দীপকের মনে পড়ল ওর নিজের বাবার কথা। ভদ্রলোককে সে সমীহ করত, ভয় করত, ভালও নিশ্চয় বাসত, কিন্তু মানুষটার ধারেকাছেও সে যেত না। কোন ছেলেরাই যেত না। এমন কি বিয়ের পরেও মনে পড়ে না সে বাবার সঙ্গে বসে গল্প করছে। যত গল্প মা-মাসি-পিশির সঙ্গে।

দীপক প্রতিজ্ঞা করেছিল সে বাবার মতো হবে না। তপুর সঙ্গে খেলা করেছে, গল্পের বই পড়েছে সুযোগ পেলেই। কিন্তু তপু দূরে সরে গেল। তপু মলির ছেলে হয়ে গেল। দীপক কি তনিকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে, তপু যে সরে গেছে সে বুঝতেও পারে নি। তপু তো বড়ো হয়েছে, এবার আসুক ছুটিতে, নিশ্চয় আমি এ-দেয়াল ভাঙব। দীপক মনে মনে ভাবল, আমার বাবাও কি আমার মতো একা হয়ে গিয়েছিল? নাকি আরো একা? অল্প বয়সে অন্ধকারে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ, বুড়ো বয়সে খাবার সময়ে যেটুকু কথা। কখন ওরা

গল্প করত, সুখ-দুঃখের গল্প! মা-বাবাদের যে আবার সুখ-দুঃখ থাকে, বিয়ে করার আগে সে বুঝতেও পারে নি।

কি করছ? মলির গলা শোনা গেল সিঁড়ির উপর থেকে। চিঠি এসেছে কিনা দেখলে না? দশটা তো বাজে।

উঠেই প্রথম কথা মলির, চিঠি এসেছে কিনা দেখলে না? অর্থাৎ তপুর চিঠি।

ছেলেও তেমন। এত তো ভালবাসা! চিঠি দেয় না কেন?

ময়লা। দীপক ডাকল ওর স্ত্রীকে। মেজাজ খারাপ থাকলে ডাকে, মলিনা। মলি মলিনা নাম সহ্য করতে পারে না। কি সেকেলে নাম! বিয়ের পরে দীপক স্ত্রীকে আদর করে কত নামে না ডাকত, আমার ময়লা হীরে, ময়লা কয়লা, ময়লা সোনা, ময়লা মণি। বিশ বছরে কবে যেন বিশেষণগুলো হারিয়ে গেছে, থেকে গেছে শুধু বিশেষ্য।

মলি তরুণীর মতো এক দৌড়ে ট্রাউজারের জিপ লাগাতে লাগাতে কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি বেয়ে নামল। মলি দীপকের হাত থেকে খামটা ছিনিয়ে নিল। খুলতে গিয়ে খামে নাম দেখে বলল, তোমাকে লেখা। তুমি খোল।

দীপক খাম খুলে চিঠি পড়তে পড়তে বলল, কেন বাবাকে বুঝি চিঠি লিখতে নেই! নাও, তোমাকেও লিখেছে।

তুমি পড়।

দীপক পড়ল। ইংরেজিতে লেখা :

প্রিয় বাবা ও মা, আমি সুজানকে নিয়ে ইউরোপে বেড়াতে যাব। ছুটি ফুরোবার আগে বাড়িতে আসব ক'দিনের জন্যে। কার্ড পাঠাব। তোমরা ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে আস না কেন? পরীক্ষা ভাল হয়েছে।

ভালবাসা রইল। তপু।

পুঃ আশা করি তোমাদের আপত্তি হবে না সুজানকে যদি নিয়ে আসি ক'দিনের জন্য! তপু।

মলির দৌড়ে নামা ঝলমলে মুখ দপ করে নিবে গেল। দীপক অফিসিয়াল চিঠি কটা খুলতে খুলতে বলল, কি, মন খারাপ? ছেলে আসবে না বলে, না সুজান-এর নাম শুনে!

মলি উত্তর দিল না। দীপক মলির মুখের দিকে তাকাতে ওর হাসি মুছে গেল ঠোঁট থেকে।

তুমি বস। আমি চা করে আনছি।

মলি বসল না। স্বামীর পিছন পিছন রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তপু আসবে বলে সে ঘরবাড়ি ঝকঝকে করে তুলেছে, তপুর ঘর সাজিয়েছে, ফ্রিজার ভর্তি খাবার কিনেছে। তপু যা ভালবাসে। কত স্বপ্ন দেখেছে, তপু আসলে ছুটি নেবে। কত বেড়াবে। সিনেমা, থিয়েটার, কনসার্ট। কন্টিনেণ্টে।

সুজান কে?

বাঃ, তপু তো তোমাকেই চিঠি লেখে। সুজানের কথা আগে লেখে নি?

না তো! তপু সেজন্যেই ইস্টারের ছুটিতে আসে নি। কে সুজান?

বান্ধবী নিশ্চয়ই। এতদিন যে তপুর বান্ধবী হয় নি এটাই তো আশ্চর্য!

হুঁ। মলি আবার বলল। বান্ধবী ছাড়া তপুর একুশ বছর হল কি করে! আশ্চর্য! সবাই বলত।

তুমি বাজারে যাও। আমার মাথা ধরেছে। মলি চা নিয়ে উপরে উঠে গেল। দীপক এক পলক দেখল মলিকে। ট্রাউজার পরলে ওকে ভাল দেখায় না। পিছনটা বড় মোটা হয়ে গেছে।

তবে কী দীপেনদের বারণ করে দেব আসতে?

না বারণ করার কি আছে? মলি সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে বলল,

তুমি বাজারে যাও তো।

মাথা ধরেছে বললে যে তুমি মলিনা।

মলি এবার সিঁড়ির মাথায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বেশ রাগত গলায় বলল, তোমার পায়ে পড়তে হবে মলিনা না ডাকার জন্যে ?

সরি। দীপক বলল।

শোবার ঘরের দরজা দড়াম করে বন্ধ করে নরম খাটে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মলি। স্যাঁতস্যাঁতে শীত সহ্য করেছিল এতদিন, কবে গ্রীষ্মকাল আসবে, কবে তপু আসবে ছুটিতে। তপু আর কোনো দিনও একা আসবে না মার কাছে! তপু এখন বড় হয়ে গেছে! সুজানের সঙ্গে চলে গেছে! কে ঐ মেয়েটা ?

দীপকের মনে হল সে যেন মলির কান্নার শব্দ বহু দূর থেকে শুনতে পেল। মলি কাঁদছে ? কাঁদুক। বুকটা হালকা হবে।

সে প্লাস্টিকের ক্যারিয়ার ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে উঠল। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দীপকের ঠোঁটে হাসি ফিরে এল, সাবাস তপু, এতদিনে সাহস করে পাখা মেলেছ তাহলে। বাঁ দিকের ইণ্ডিকেটর দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। লণ্ডনের ট্রাফিক রবিবার ছাড়া সবদিনই খারাপ। শনিবার যেন অসম্ভব। হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। তারপর পার্কিংয়ের মুশকিল। দীপক খুব অপছন্দ করে শনিবারে বাজারে যেতে, কিন্তু উপায় নেই। এ তো দেশ নয়, চাকর সঙ্গে করে বাজারে যাবে। ট্রাফিক লাইটে গাড়ি থামাতেই হুড় হুড় করে মানুষ এ-পার ও-পার হতে লাগল। ঐ তো তনির মতো একটি মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। আজকাল কে যে কোন দেশী, বোঝার উপায় নেই। শাড়ি-টাড়ির পালা প্রায় উবেই গেছে। ছেলে না মেয়ে তাও সব সময় বোঝা যায় না। ইউনিসেক্সের যুগ নাকি! তনির মতো মেয়েটি রাস্তার মাঝখানে দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছে, দীপকের মনে হল ওর দিকে তাকিয়ে আছে। লাল

যে কখন সবুজ হয়েছে টের পায় নি। পিছন থেকে হর্নের শব্দ। দীপক চমকে উঠল। হাত তুলে ক্ষমা চেয়ে গাড়িতে মন দিল। এদেশে কেউ হর্ন দেয় না সহজে। সেজন্যে হর্নের শব্দ শুনলে চমকে উঠতে হয়। দীপক চমকে উঠতেই বুকের ব্যথাটা চনমন করে উঠল। এদেশের ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলেই পালিয়ে যেতে চায় কেন বাড়ি থেকে? তনি যদি ওর পাশে বসে থাকত, ওর একটুও কষ্ট হত না গাড়ি চালাতে, বাজার করতে। হাসিতে, গল্পে, টিপ্পনীতে ভুলিয়ে রাখত দীপককে। দীপক যেন বুক ফুলিয়ে লোকের চোখে চোখ রেখে বলত, দেখ কি রূপসী মেয়ে আমার। কালো? কালোর মতো সুন্দর কি হয়? তনির মতো সুন্দরী ও কাউকে দেখে না। মলিকেও না।

তনি! মাঝে মাঝেই দীপকের বুক মুচড়ে ওঠে ব্যথায়। মলিকে না জানিয়েই সে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। থ্রম্বসিস হল না কি? চেক আপ হল। ব্লাডপ্রেসার ঠিক আছে, ই. সি. জি. ঠিক। হার্টের পাম্প ঠিক মতোই কাজ করে চলেছে। তবু বুকে ওর ব্যথা ওঠে। ফাংশ্যানাল: ডাক্তার বলল। এত ভাবনাচিন্তা কেন? স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সব ভাল তো? তবে? চাকরি? সব ভাল। তবু বুকে ব্যথা।

থামিয়ে থামিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে দীপকের চশমা ঝাপসা হয়ে এল।

তনি সেই একদিন প্রথম এসে বলেছিল, বাবা শোন, আমি নার্সারি মেড-এর কাজ পেয়েছি প্যারিসে। এক বছর ভাষা শিখব। ফিরে এসে আরো একটা 'এ' লেভেল দেব।

দীপক হাঁ করে ওর ছোট্ট মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, যেন সে ভুলভাল কি শুনছে।

কি বলছ তুমি তনি?

তুমি ঠিকই শুনেছ। তনি হাসির ভাব দিয়ে বাবাকে শান্ত

করার চেষ্টায় বলল, আমি প্যারিসে যাব ফরাসি শিখতে !

ফরাসিতো লণ্ডনেই শেখা যায়।

আমি ফরাসীদের মতো ফরাসি বলতে চাই। তনি এবার শক্ত হয়ে বলল।

মা, দীপক আরো শক্ত হয়ে বলল, তুমি এতটুকু বয়সে কি করে বাড়ি ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে পারলে ? দীপক রাগে গলা চড়িয়ে বললে, তুমি কি করে ভাবলে আমি তোমাকে যেতে দেব ?

বাবা, তনি দীপকের হাতে হাত রেখে বলল, বাবা আমাকে বড়ো হতে দাও। আমি এতটুকু আর নই। আমার আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে। আমাকে তোমরা একটা বাচ্চা মেয়ে করে রেখেছ।

কি চাও তুমি ? পার্টিতে যেতে চাও, বন্ধু আনতে চাও। আমরা তো বারণ করি না, বেশি রাত করে যদি—

না, বাবা। তুমি বুঝছ না। তনি দাঁড়িয়ে উঠে বলেছে, আই ওয়াণ্ট টু সি লাইফ, আই ওয়াণ্ট টু ফেস লাইফ—

জীবন তো পালিয়ে যাচ্ছে না, দীপক বোঝাবার চেষ্টা করল, আরেকটু তোমার বয়স হোক। তারপরে—

তারপরে বিয়ে কর। বিয়ে করে যেখানে ইচ্ছা যাও। তনি বাবার গলা নকল করল। তারপর পিছন ফিরে বলল, আমি যাবই। তুমি আমাকে যেতে দিলে আমি মনে শান্তি নিয়ে যাব।

তোমার মা কিছুতেই রাজি হবে না। দীপক শেষ চেষ্টা করল।

তনি দপ করে জ্বলে ওঠে দীপকের চোখে চোখ রাখে, তুমি মার পিছনে লুকোচ্ছ !

বেশ, সাতদিন সময় নিয়ে ভাব তারপর আবার কথা হবে।

তনি দাঁড়ায় নি। নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল।

মলি যোগাসনের ক্লাস করে ফিরে এসে দেখে দীপক অন্ধকার ঘরে বসে আছে, টিভি না চালিয়ে।

কি ব্যাপার!

তনি চলে যেতে চায়।

কোথায়?

প্যারিসে?

কার সঙ্গে? বেড়াতে?

না একা। এক বছরের জন্যে।

তুমি কি ক্ষেপে গেছ। ঐটুকু মেয়ে চলে যেতে চায় বললেই চলে গেল। কোথায় তোমার মেয়ে?

ওর ঘরে। ছেড়ে দাও, পরে কথা হবে।

তুমি আদর দিয়ে মেয়েকে মাথায় তুলেছ। তনি! মলি চিৎকার করে ডাকল।

পপ গান ভেসে আসছে উপর থেকে। রেকর্ড প্লেয়ার পুরো ভল্যুমে না চললে ওরা কানে শুনতে পায় না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কালা হয়ে জন্মায়? মলি দুমদাম করে উপরে গিয়ে তনির দরজায় ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে বলল, নিচে নেমে এস। আর ঐ ছাইভস্ম গান বন্ধ কর। কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

তনি বাধ্য মেয়ের মতো রেকর্ড প্লেয়ার বন্ধ করে মার পিছু পিছু এল। দীপককে এক অনুযোগের ঝলক দিয়ে সে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

মলি দীপকের পাশে বসে বলল, বস।

তনি উল্টো দিকের সোফায় বসল।

কি শুনছি?

তনি মার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি এক বছরের জন্যে প্যারিসে যাচ্ছি।

কে তোমার মাথায় এ সব বুদ্ধি দিয়েছে?

আমার নিজের মাথা।

নিজের মাথা যখন বড়ো হবে তখন কাজে লাগিও। আমি বলে দিচ্ছি তোমার প্যারিসে যাওয়া হবে না।

আমি যাবই। তনির ঠোঁট কাঁপতে লাগল, আমি আর সহ্য করতে পারি না। আমি এ বাড়ি ছেড়ে যাবই যাব—

দীপক অত্যন্ত অস্থির হয়ে চমকে ওঠে, হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঘুষি মেরে কেউ যেন ওকে বসিয়ে দিল। সারা বুকে অসহ্য যন্ত্রণা।

বাবা! তনি এক লাফে দীপকের পায়ের তলায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, কি হয়েছে বাবা!

কিছু না। দীপক দম নিয়ে একটু পরে বলল।

মলি বলে উঠল, তোমার এত স্পর্ধা তনি। আমাদের খেয়ে-পরে এত লেখাপড়া শিখে মুখের উপর বলছ, এ বাড়িতে সহ্য হয় না। এত স্পর্ধা। তোমাদের জন্যে আমরা কি না করছি!

আজকে থাক। দীপক ক্লান্তস্বরে বলল। চল খেয়ে নেওয়া যাক। আমি একটু সূপ খাব শুধু।

তিনজন দম দেয়া পুতুলের মতো কোনো কথা না বলে খাওয়ার পালা শেষ করে শুতে চলে গেল।

দীপকের সে রাত্রে এতটুকু ঘুম হল না। মলি কথা ওঠাবার চেষ্টা করেছিল, দীপক থামিয়ে দিয়ে বলেছে, আজকে থাক। সারারাত তনির একটা কথা বার বার মনে পড়েছে—'আমি আর সহ্য করতে পারি না।' তনি ওর এত কাছের এত আদরের, কেন সে টের পায় নি যে এ বাড়ি ওর 'অসহ্য' হয়ে উঠেছে? তনি তো—না কি তনি তাকে বলেছে, বলার চেষ্টা করেছে, দীপক শুনেও শোনে নি। কোথায় ভুল হয়ে গেছে। কি অন্যায় সে করেছে। না, এ নিশ্চয় এদেশের হাওয়ার বদ গুণ। পাখা গজাবার আগেই এরা উড়ে যেতে চায়!

দীপক তনিকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে। বলেছে দুষ্ট মানুষের কথা। ভারতীয় মূল্যের কথা। ছাত্র বয়সের সময় চলে গেলে সময় ফিরে আসে না। জীবনে একটা বড়ো ভুল করলে সারা জীবন তার দাম দিতে হয়।

তনি শুনেছে। বাবাকে বলেছে দুষ্ট মানুষের কথা সে জানে। সে তো কচি খুকি নয়। সে পুরো ভারতীয় নয়—এদেশের স্কুলে তার শিক্ষা। দুই সংস্কৃতিকেই সে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে আবার দুটোর দোষ সম্বন্ধেও সে সজ্ঞান। জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর সময় নষ্ট হবে কেন? সে তো অল্পবয়সেই 'এ' লেভেল দিচ্ছিল। আর ভুল—ঠেকে না শিখলে শেখা হয় না; ভুল করতে সে ভয় পাবে কেন? ভুল শোধরাতে না পারলে তখন তো চিন্তা। তনি আশ্বাস দিয়েছে, ওর মনে সাহস আছে, সে ভুল শোধরাতে পারবে। আজকাল তো বলে, বছরখানেক জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তারপর আবার পড়াশুনো করতে। স্কুল কলেজ বাড়ি তো কাঁচের—গ্রীন হাউসের মতো, সে উদার আকাশ চায়, ডালাপালা মেলে নিঃশ্বাস নিতে চায়। নাঃ, সে তো বলে নি যে বাড়িতে ফিরে আসবে না। বাড়িতেই তো তার শিকড়।

তনি বাবার দুহাত তুলে ওর ছোটো সুন্দর হাতে জড়িয়ে বলেছে, আমাকে যেতে দাও। আই ওন্ট লেট ইউ ডাউন।

আবার সেই বুকে ব্যথা!

বাবা, কি হচ্ছে তোমার?

দীপক এক মুহূর্তে চোখ বুজে ব্যথাটাকে চলে যেতে দিল।

বাবা!

কিছু না। দীপক জানে যদি সে বুকে ব্যথার কথা বলত তো তনি চলে যেত না। ভালবাসা দিয়ে পারল না, যুক্তি দিয়ে পারল না। বুকে ব্যথার ভয় দেখিয়ে কি করে সে মেয়েকে ধরে রাখবে! আঠারো বছরের মেয়ে তো সব যুক্তি জেনে বসে আছে। কিন্তু যুক্তির খাতির করে কি হৃদয় চলে, না জীবন চলে!

সেই যুক্তি দিয়ে মলিকে বোঝাল। মলি হুমকি দিল, তোমার মেয়ে আউট অফ কন্ট্রোল, সোসিয়েল সার্ভিস-এর হাতে তুলে

দাও। দীপক স্ত্রীকে মনে করিয়ে দিল এ দেশে আঠারো বছরের পরে আইনত ওরা সাবালক। ষোল বছরে অনুমতি নিয়ে বিয়ে করতে পারে, বাচ্চা করতে পারে, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু আঠারো বছর না হওয়া পর্যন্ত বার-এ গিয়ে মদও খেতে পারে না, ভোটও দিতে পারে না। দীপক মেয়ের নকল করে বলল, ওকে যেতে দাও, ফিরে আসবে। জোর করে বেঁধে রাখলে পালিয়ে যাবে, ফিরে আসবে না।

কিন্তু প্যারিসের মতো জায়গা—মলি বলে।

জানি, দীপক আস্তে আস্তে বলে, সে চিন্তায় তো আমারও ঘুম আসে না। কিন্তু তনি তো সেরকম মেয়ে নয়। দীপক যেন নিজেকেই আশ্বাস দিল। দুজনে পাশাপাশি শুয়ে কথা বলল না অনেকক্ষণ। দুজনের ফ্যানটাসী রেস দিতে লাগল। মেয়ের কি কি বিপদ হতে পারে!

দেশে মেয়ে মানুষ করলে, দীপক বলল, তনি বাড়ি ছেড়ে চলে যেত না।

শ্যামবাজারে থাকতে হলে আমি আগে পালাতাম ছেলে-মেয়ে নিয়ে।

শ্যামবাজার ছাড়াও তো দেশে অন্য জায়গা ছিল।

সংসার চালিয়ে ভাইদের মানুষ করতে পারতে, বোনদের বিয়ে দিতে পারতে?

পুরোনো কথা, আফসোস, ঝগড়া। এ দেশ, ও দেশ। দেশ, বিদেশ। অর্ধেক মন পড়ে থাকে দেশে, অর্ধেক এ দেশে। মনটা যেন আর পুরো মন নেই। তনির মতো সহজে যদি সে বলতে পারত—আমি দুই সংস্কৃতির সমন্বয়? না কি সে সমন্বয়ের খোঁজে অস্থির?

প্যারিসে যাবার দিন মলি তনিকে জড়িয়ে ধরেছিল র‍্যামস গেটে হোভারক্রাফ্ট-এ উঠিয়ে দেবার আগে। মার ছোঁয়া ভালবাসা পেতে তনি অভ্যস্ত নয়। সে লজ্জা পেয়ে সরে এসেছিল।

দেখতে পায় নি, মলির চোখের মণি ব্যথায় চকচক করে উঠেছে।

দীঘার মতো সমুদ্র। ঢেউ নেই, বিস্তার আছে। মেঘে ঢাকা আকাশ, ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, জল ময়লা ঘোলাটে। জেটিতে মানুষ জড় হয়েছে, রেষ্টুরেণ্টে পাব-এ ভিড়। যারা যাবে, যারা দেখা করতে এসেছে, যারা শুধু দেখতে এসেছে। হোভারক্রাফ্‌ট এখনও কৌতূহলের জিনিস! জাহাজের মতো হেলে দুলে চলে না, কচ্ছপের মতো শরীর নিয়ে হুঁশ করে পাড়ি দেয় ইংলিশ চ্যানেল।

চিঠি দিস প্রতি সপ্তাহে। মলি বলেছিল।

দীপক তনির কপালে চুমু দিয়ে শুধু বলেছিল, মা—

তনি বাবাকে জড়িয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। মলি ভাবল, মাকে সরিয়ে দিল, আর বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে।

তপু কোথা থেকে লাফাতে লাফাতে এসে বোনের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে শাসনের সুরে বলেছিল, মনে থাকে যেন। ডোণ্ট ডু এনিথিং, আই ওন্‌ট ডু।

তনি চোখে জল নিয়ে দুষ্টু হেসে বলেছিল, তুমি যে কি কর আমার জানা আছে।

হাসি কান্না। দীপক ভাবল, বয়স অল্প হলে হাসি কত সহজেই না আসে। তনি ঝলমল করে বাই বাই করে চলে গেল। নিয়ে গেল দীপকের গ্রীষ্মের উত্তাপ। রেখে গেল ঘসা আকাশ আর ঘোলাটে সাগরের জল। ঝাপসা চোখ। বুকে ব্যথা।

দীপক রোবটের মতো সেন্‌স্‌বারী সুপার মার্কেটে ঢুকল। বুক পকেটে রাখা বাজারের লিস্টির কথা সে ভুলেও গেল। এত ভিড়। মানুষের ভিড়। তাকে তাকে সাজানো জিনিসের ভিড়। ট্রলি ঠেলে ভিড়ের মধ্যে চলা মুশকিল। 'সরি' বলতে বলতে প্রাণ যায়। হাত বাড়িয়ে জিনিস নেয়া। ট্রলিতে বোঝাই করা। কর্নফ্লেক্স, রুটি, মাখন, চিনি, দুধ, তরকারি, কাপড়কাচা. সাবান, বাসন ধোয়া

সাবান, পায়খানা পরিষ্কার করার ডিটারজেন্ট, কিচেন পরিষ্কার করার ভিন্ন সাবান, টয়লেট রোল, কিচেন টাউয়েল, হুইস্কি, ওয়াইন, আর কি লাগবে ? ওঃ ডিম, সসেজ, বেকন। না বেকনের বড় বেশি দাম আজকাল। কমলালেবুর রস। না, এ সপ্তাহ আপেলের রস খাওয়া যাক। স্যুপের প্যাকেট। কত রকমের প্যাকেট, রংয়ের বাহার। স্পেশ্যাল অফার। দু পেনি কম, তিন পেনি কম। লোভ দেখিয়ে পকেট খালি করার ব্যবস্থা। আবার কিউ দাও পয়সা দেবার জন্যে। ইস্, কালোতে ভরে গেছে উডগ্রীন! নাইলনে দাঁড়ানো শাড়িপরা মহিলা কোন্ দেশি ? বাংলায় কথা শোনা গেল। দীপক চোখ সরিয়ে নিল। বাংলাদেশি মনে হচ্ছে।

অল্পবয়সী মেয়ে কাউন্টারে বসে আছে। নীল ইউনিফর্ম পরে। চোখে জ্যোতি নেই, ঠোঁটে হাসি নেই। যন্ত্রের মতো একটা জিনিসের দাম দেখে বোতাম টিপছে, টিপলে দাম উঠছে, যোগ হচ্ছে। দীপকও যন্ত্রচালিতের মতো ব্যাগে জিনিস ভরছে। তিরিশ পাউণ্ড পঁচাত্তর পেনি! থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু! এত কষ্টের রোজগারের টাকা হাতে তুলে দিয়েও ধন্যবাদ জানাতে হবে।

বোঝা বয়ে গাড়িতে তোলা, হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ি ফেরা; এত কষ্ট কার জন্যে করা। ছেলেমেয়ে নেই বাড়িতে। ওরা তো নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। বাবাকে তো আর দরকার নেই। যা কিছু সব দিয়ে ছেলেমেয়ে বড় করো, ওরা 'বাই বাই' করে বলবে, চললাম। আবার দেখা হবে। তনি কবে ফিরবে ? ও কি ফিরবে কোনদিনও বাড়িতে থাকার জন্য। না কি প্যারিস থেকে চেষ্টা করছে লণ্ডনের বাইরে কোনো কলেজে পড়ার জন্য ? যদি মেয়ে প্যারিসের মায়া কাটিয়ে ফেরে। সব মায়া। দীপক দরজায় চাবি ঢুকিয়ে খুলতে যাবে, আবার সেই বুকের ব্যথা এক হ্যাঁচকায় যেন ওকে দরজায় ছুঁড়ে ফেলল।

মলি দৌড়ে দরজা খুলে বলল, কি হল ? লাগেনি তো ?

না। বোঝা নিয়ে ব্যালেন্স রাখতে পারি নি।

সাবধানে তো চলাফেরা করবে। দাও ব্যাগটা।

দীপক ঘরে ঢুকল, বসল। বলল, আমি একটু পরে অন্য ব্যাগগুলো আনছি। একটু পরে বলল, দীপেনকে ফোন করে বলে দিই তোমার শরীর খারাপ। ভাল লাগছে না মানুষ-জন।

কোনদিন তোমার মানুষ-জন ভালো লাগে! টিভিতে নাক ডুবিয়ে বসে থাক। মলি রাগ করে বলল, আমি পাগল হয়ে যাব একা একা!

একা! দীপক ভাবল—একা। ওরা দুজনে একসঙ্গে কত একা হয়ে গেছে। মলি একা, আমি একা! দীপকের ভীষণ ইচ্ছে করল তনিকে কোলে জড়িয়ে ধরে। যেমন ছেলেবেলায় দুলে দুলে ঘুম পাড়াত ওকে। কী শান্তি, কী আনন্দের ছিল সেই দিনগুলো। দীপকের দরজার চাবি খোলার শব্দ শুনে তনি ছুটে আসত, জড়িয়ে ধরত দীপকের দুই হাঁটু। বাবা শোন! সেই ডাকে ছিল নির্ভর, নিশ্চিন্ত ভালবাসা।

গাড়ির চাবি দাও, আমি ব্যাগগুলো আনছি। রান্নার জোগাড় করতে হবে।

আমি আনছি। দীপক তাড়াতাড়ি উঠে বলল।

দীপক ব্যাগ দুটো নিয়ে এল রান্নাঘরে।

কোথায় কি রাখছ তার ঠিক নেই। কি ভাবছ তুমি এত!

ছেলেমেয়েরা কত তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যায় এদেশে।

ভেবে সময় নষ্ট কর না। মলি জিনিস গুছোতে গুছোতে বলল, প্রাণ দিয়ে বড় কর তাদের; বড়ো হয়ে পালাবার জন্যে শুধু বাড়া করা। একবার ভাবে আমাদের কথা!

দীপকের হঠাৎ মনে হল সে আর একা নয়। মলি একই কথা ভাবছে। সে মলির ঘাড়ে হাত রাখতে যাবে, টেলিফোন বেজে উঠল।

ফোনটা ধর না কেন। মলি ধৈর্য হারিয়ে ধরা গলায় বলল।

যাচ্ছি; দীপক ছোটগলায় বলল। আবার সেই একা। নিজের দুঃখে গড়া দেয়ালের ভেতরে মানুষ কত না একা।

দুই

সন্ধ্যে সাতটার আগে রান্না শেষ। বাড়ি ফিটফাট। মলি কাপড় বদলাতে গেছে। দীপক টিভি খুলে বসল। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে। দিনের আলো এখনও ঝকঝকে।

রোডেশিয়ার উপর খবর হচ্ছে। সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট বাগানে শ্বেত মহিলারা টেবিল ঘিরে বসে আছে সুইম স্যুট পরে। বিকিনি নয় কেউ বা সাঁতার কাটছে বাচ্চাদের সঙ্গে, কেউ বা টেনিস খেলছে। এক আফ্রিকান বেয়ারা চোগা-চাপকান পরে ট্রের উপর কাঁচের জাগে বরফ দেয়া কমলালেবুর রস (অ্যালকোহল নিশ্চয়ই মেশানো আছে) এনে ওয়াইনের গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছে। বাগানবাড়ির দেয়ালের ওপারে রাশিকৃত জঞ্জালের মধ্যে আফ্রিকানরা খাবার কুড়িয়ে নিচ্ছে। সাহেব কমেনটেটার সাদা আর কালোদের জীবনের ফারাক দেখিয়ে বলছে, আর ক-সপ্তাহের মধ্যেই রোডেশিয়া জিম্বাবে হয়ে যাবে। এক মানুষ এক ভোট। ক্ষুধার্ত আফ্রিকানরা চাকরি চায়, ডাস্টবিন কুড়িয়ে পেট ভরাতে আর ওরা রাজি হবে না। একদিকে প্রাচুর্য আরেক দিকে দারিদ্র্য।

দীপকের মনে পড়ে গেল সাতচল্লিশের স্বাধীনতা দিবসের কথা। লরিতে করে ঝাণ্ডা নিয়ে সে কী চীৎকার, কী ফুর্তি, হিন্দু মুসলিম ভাই-ভাই, রক্তাক্ত পার্ক সার্কাসে হাতে হাত মেলানো। স্বাধীনতা! ভারতবর্ষ স্বাধীন—যেন দুঃখ-দুর্দশা অবিচার সব রাতারাতি বৃটিশরা জাহাজে করে নিয়ে যাবে ওদের সঙ্গে বাক্সে প্যাক করে।

বিরাট বাগানের শ্বেত মহিলাদের দেখে দীপক সিনিকের হাসি হাসল। যেমন ভারতবর্ষে হয়েছে, ঐ বাগান-বাড়িতে সাদার বদলে কালো মহিলারা দু দিন পরে টেবিল ঘিরে বসবে, আর গরিব কালো আফ্রিকানরা তখনও ডাস্টবিনে খাবার খুঁজে পেট ভরাবে। শুধু রংয়ের বদল। সাধারণ মানুষের দুর্দশার নয়। দীপক যতবার কলকাতায় যায় মন কুঁকড়ে ফিরে আসে। কোথায়, কার স্বাধীনতা ?

দরজার বেল বেজে উঠল।

কি তুমি দরজাটা খুলবে না ? কখন থেকে বেল বাজছে।

দীপক তাড়াতাড়ি টিভি বন্ধ করে দরজা খুলতে গেল।

দীনেন আর ডরিস। দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে হাসছে। হাতে কাগজে মোড়া ওয়াইনের বোতল। আজকাল ইংলণ্ডে ওয়াইন চালু হয়েছে কন্টিনেন্টের নকল করে।

এস। বস। কোটটা দাও।

হঠাৎ আজকে কি গরম পড়েছে।

এদের ওয়েদারকে বিশ্বাস নেই।

ওয়ের ইজ মাই বিউটিফুল মলি ?

মলি তোমার জন্যে সাজগোজ করছে।

বস, বস, মলি এক্ষুনি এসে যাবে।

গ্র্যাণ্ড এনট্রেন্স দেবে।

দীনেনের গোঁফে আর জুলফিতে পাকা চুল দেখা দিয়েছে। বেঁটেখাটো মানুষ হুইস্কির তারল্যে কুমড়োর মতো হয়ে গেছে। এককালের তন্বি ডরিস বেলুনের মতো ফেঁপে গেছে। গোঁফ দেখা দিয়েছে। সাজ-পোশাকে কোনো রুচি নেই। স্টকিংয়ের তলায় গোদা গোদা পা চুলে ভর্তি। পায়ের চুল পরিষ্কার করার অভ্যাস কবে যেন ছেড়ে দিয়েছে। যেন দুজনেই বয়সকে জবাব দিয়ে দিয়েছে, যা ইচ্ছে কর আমাদের নিয়ে।

মলি উপর থেকে দেখল। জোর করে হাসি ঠোঁটে এনে সে শাড়ির আঁচল সামলে নিচে নেমে এল। দীনেন পুরোনো কালের ইংরেজদের মতো দাঁড়িয়ে উঠল, দুই হাত বাড়িয়ে মলির গালে চুমু খেয়ে বলল, তোমাকে দেখলে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়।

মলি একটু লজ্জায় খুশিতে বলল, তুমি আমার দিন সার্থক করলে দীনেন। ডরিস তুমি কেমন আছ?

ভীষণ ভাল। ডরিস সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে বলল। ওরা দুজনে সব সময় হাসিখুশি, ভীষণ ভাল থাকে। অথচ বয়স ওদের এত স্থূল আর কুৎসিত করে দিয়েছে কেন?

কি সবাই হুইস্কি তো?

না, আমাকে কাম্পারি আর সোডা দাও। মলি বলল।

ডরিস মলিকে জড়িয়ে বলল, কতদিন পরে দেখা হচ্ছে আমাদের। বাড়ি এত চুপচাপ, টপু আসে নি? দীপক আমাকেও কাম্পারি সোডা দাও। কী সুন্দর প্লাণ্ট হয়েছে তোমার। কার হাত সবুজ? এ শাড়িটা কি এবার দেশ থেকে নিয়ে এসেছ?

ডরিস প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করে না। এক কথা থেকে আরেক কথায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। দীপক হা করে ডরিসকে দেখছিল ঠোঁটে হাসি মেখে। ওর একটা কথাও সে শুনছিল না। মলি তাড়া দিল, কই আমাদের ড্রিংকস বানিয়ে দাও। বরফ বের করে রেখেছি।

দীনেন হা হা করে হেসে উঠল, ডরিসের রেকর্ড চলতে শুরু করলে সবাই হা হয়ে যায়।

ডরিস একটুও রাগ না করে হাসল, তোমরা চিমটি কেট তো আমি না থামলে। ডিনেনকে কত করে বলি আমার কথা থামানোর ওষুধ দাও। কিন্তু ভেবে দেখ মানুষের সঙ্গে জন্তুর তফাৎ কোথায়—

দীনেন বলে উঠল, সারা'দিন রুগীদের প্যানপ্যানানী শুনি।

ন্যাশনাল হেলথ তো ডাক্তারদের সার্ভিস ফ্রি করেনি, করেছে মানুষের—

এই দেখ, ডরিস ধপাস করে সোফায় পা ফাঁক করে বসে পড়ল, তোমার মত অ্যান্টি-পেসেণ্ট আমি দেখিনি। অসুখ সারাতে পার না, যত দোষ রুগীদের।

অসুখ সত্যিকারের থাকলে তো সারাবো। নিউরটিক হাইপোকড্রিয়াকের দেশ। সত্যিকারের অসুখ হলে হাত থেকে হাসপাতালে ফসকে চলে গেল। কোন মজা আছে আজকাল এদেশের প্র্যাকটিসের, তুমিই বল দীপক?

দীপক ড্রিঙ্কস ধরিয়ে দিল সকলের হাতে। নিজে বসল ডরিসের উল্টোদিকে, বসেই বুঝল ভুল করেছে। ডরিস পা ফাঁক করে বসে কেন? সারা সন্ধ্যা ওর থলথলে থাই, আর নিকারের রঙ দেখতে সে রাজি নয়।

কি বল দীপক? সারা দেশটা শালা ডিপ্রেশনে ভুগছে। ইনফ্লেশন, ডিপ্রেশন, রিসেসন। মধ্যপ্রাচ্যের তেল, আর নর্থ সী অয়েল। তৈল রাজনীতি! এদেশে ম্যাগী থ্যাচার, ওদেশে ইন্দিরা। বেঁচে লাভ আছে কোনো? দীনেশ হো হো করে হেসে হুইস্কির গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল।

সুমনা কেমন আছে? মলি জিজ্ঞেস করল।

ভাল। ডিসকোতে গেছে। কখন ফিরবে মেয়ে তার ঠিক আছে!

মলি মনে মনে বলল, এই ষোলতে পড়া মেয়ে ডিসকো থেকে কখন ফিরবে তার ঠিক নেই! মুখে বলল, তুমি চিন্তা কর না?

না গো, ডরিস হেসে হেসে বলল, সুমনার মাথা কাঁধের ঠিক জায়গায় বসানো আছে। এখন যদি বেরুতে না দিই, তনির মত প্যারিসে পালিয়ে যাক আর কি।

মলি গম্ভীর মুখে বলল, ও তো পালিয়ে যায় নি। ফরাসি

শিখতে গেছে এক বছরের জন্য।

আরে, ডরিস বলে উঠল হাসি মুখে, তুমি আমার কথা সত্যি ধরে নিলে না কি? নিজের মেয়েকে বিশ্বাস করব না তো কাকে করব বল। বলে দিয়েছি, ভালবাসাবাসি করিস না। "যদি শুতে-টুতেই হয় তবে ডাক্তারের কাছে গিয়ে 'পিল' চেয়ে নিস। ভয় দেখিয়ে দিয়েছি ভি. ডি-র। কাগজে পড় নি অল্পবয়সীদের মধ্যে পিলপিল করছে ভি. ডি? বুঝলে আজকাল—

দীপক উঠে দীনেনের পাশে এক চেয়ারে বসল।

তপু কোথায়? দীনেন দীপককে জিজ্ঞেস করল।

তপু ইউরোপে বেড়াতে যাচ্ছে। দীপক একটু ভেবে যোগ করল, কলেজে ফেরার আগে বাড়ি হয়ে যাবে।

ভাগ্যিস আমরা ছেলে এডপ্ট না করে সুমনাকে নিয়েছি। আমার ছেলে যদি আমাকে ফেলে বান্ধবী নিয়ে ড্যাং ড্যাং করতে করতে ইউরোপে যেত আমি হিংসেতেই মরে যেতাম। ডরিস খিল খিল করে হেসে উঠল। মলির মনে হল একটা হায়না হাসছে। সেও জোর করে হেসে উঠল, যাই ভাতটা চাপিয়ে আসি।

এখনই কি! দীনেন বাধা দিল। শনিবারের সন্ধ্যা একটু জমিয়ে তো আগে ড্রিংক করে নিই।

দীপক উঠে তাড়াতাড়ি বলল, না, ভাতটা চাপিয়ে দিক। গরম থাকবে। দাও গ্লাস দাও, ভরে আনছি!

দীনেন পাইপ ধরিয়ে বলল, ডরিস তুমি একটু হেল্প কর গিয়ে।

দীপক ডরিসকে থামিয়ে বলল, না, না তুমি বস। শুধু তো ভাত বসানো। মলি একটু পালিয়ে বাঁচুক। দীপক ভাবল।

তারপর তোমার মামা কেমন আছে?

মামা তো—

ডরিস দীনেনকে থামিয়ে বলল, ওরই জন্য তো আজকাল

বেরুতে পারি না আমরা। কি কুক্ষণে যে রাজি হয়েছিলাম। দোতলা থেকে নামতে দিই না সন্ধ্যাবেলা ছাড়া।

কেন?

কেন? তুমি কি ভুলে গেলে নাকি? একটা দিক তো ভদ্রলোকের পড়ে গেছে, লাঠিভর দিয়ে চলে। ওঠানামা করতে গেলে কখন পড়ে মরবে! দীনেন বাড়ি এলে নামতে দিই। খুব রাগ সেজন্য আমার ওপর।

আঃ, দীনেন মামার পক্ষ হয়ে বলল, জান তো মামার মনের ভীষণ জোর, কিছুতেই হার মানবে না। সেই অ্যাকসিডেণ্টের পরে যে ভদ্রলোক বাঁচবে, তা তো কেউ আশাই করে নি। তার ওপরে ব্লাডপ্রেসার, রুগ্ন হার্ট।

তবু হুইস্কি ছাড়বে না।

খাক না। যে কদিন বেঁচে আছে। সেই মামা, দীনেন পাইপ পরিষ্কার করতে করতে বলল, শচীন্দ্রনাথ বরাট, যার প্রতাপে আমরা আজকে করে খাচ্ছি, লণ্ডনের ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দশজনের মধ্যে একজন হয়েছিল, আজ তার কী অবস্থা। কী অসহায়।

দীনেন পাইপ দাঁতে নিল।

ডরিস বলল, ভদ্রলোক রোজ বেরোতে চায়। দীনেন ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে বোঝে না। ভাবে নিয়ে যেতে চায় না। তাও আমাকে না নিয়ে সপ্তাহে একদিন তো নিয়ে বেরোবেই। তবুও অসুখী। ভাবে বোধহয় আমি বারণ করেছি।

মলি কোনো এক সময়ে এসে বসেছে। আস্তে আস্তে বলল, ভদ্রলোক একা থাকলেই পারত। হাউসকিপার, নার্স নিয়ে। পয়সার তো অভাব নেই।

হ্যাঁ, আর প্রতি উইক এণ্ড নষ্ট করে আমাদের দৌড়তে হত। এত বন্ধুর তো কোনো পাত্তা ছিল না। আমরা থাকতে নার্সিং হোমে পয়সা ঢেলে লাভ কি?

দীনেন যেন শোনে নি এমনভাবে পাইপ ঠুকে ঠুকে আনমনে বলল, হয়তো একা থাকলেই ভদ্রলোক সুখী থাকত। ভেবেছিলাম ঘরোয়া আবহাওয়ায় মামার শেষ কটা দিন ভাল কাটবে। ডরিস খুব যত্ন করে, তবু—জীবন-হিসেবের উত্তর জানা থাকলেও সব সময় অঙ্ক মেলে না।

সবাই একটুক্ষণ চুপ করে হয়তো বা জীবনের অঙ্ক না মেলার কথা ভাবতে লাগল। হুইস্কির গ্লাস আর কাম্পারী হাতে করে।

তিন

শচীন্দ্রনাথ একা সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিল। পিছনের কাঁচের দরজা দিয়ে সবুজ রুমালী লন আর বাগান দেখা যাচ্ছে। বিদায়ী দিনের আলো নরম মমতায় গাছে ছায়ার সঙ্গে খেলা করছে। হলুদ ড্যাফোডিল দুলে দুলে হাসছে।

শচীনের খুব ইচ্ছা করল একটু খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নেয়। সাতদিন সে বাড়ি থেকে বেরোয় নি। হুইস্কির গ্লাসটা পাশের টেবিলে রেখে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠল। দরজা খুলতে গিয়ে দেখল ছিটকিনি ওপরে লাগানো। ওর শরীর মন থেকে লড়াই করার ইচ্ছা চলে গেছে। সে আস্তে আস্তে আবার সোফায় এসে বসল। নিজের ওপর রাগে ওর চোখ দপ দপ করে উঠল। ইচ্ছে করল হুইস্কির বোতল ছুঁড়ে দরজা ভেঙে ফেলে।

না, এটা তোমার বাড়ি নয়। শচীন্দ্রনাথ নিজেকে মনে করিয়ে দিল। সে জীবনে কোনো দিনও হার মানে নি, বৃদ্ধ বয়সে এ ভুল সে করল কী করে? কেন সে ছেড়ে দিয়ে এল তার নিজের সুন্দর কটেজ। রুথের নামে লিখে দিয়েছে কটেজ। কেন? যাতে তাদের ডেথ-ডিউটি না দিতে হয়?

কে বলেছিল তাকে প্রথমে, নাকি, তার ভীমরতি ধরেছে,

চেয়েছিল মায়া-মমতায়, যত্নে ঘিরে থাকতে। একা থাকতে তো তার কোনোদিন কষ্ট হয় নি। অসুবিধা হয়েছে। মাটি কি তাকে নরম করে দিয়ে গেছে? সুবিধার দাম যে স্বাধীনতা তা কি সে জানত না। না জানতে চায় নি। স্মৃতিশক্তির বাক্সে মাঝে মাঝেই ওলট-পালট হয়ে যায়, নাম, দিন, ঘটনা একেক সময়ে সে ভুলে যায়।

জ্যান্ত হয়ে কফিনে বাঁচার জীবন সে আর চায় না। আমাকে নাও মা। মাগো। শচীন ডেকে উঠল ছোট ছেলের মতো। বাগানে চোখ ফিরিয়ে যেন দেখতে পেল লালপেড়ে শাড়ি পরে মা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। একটু পরেই ঘরে ঢুকে বলবে, শচী আমার কাছে এসে বস। মহাভারত শোন। ভাইদের ডেকে আন।

শচীন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে শুকনো চোখের জল মুছে জোরে জোরে বলে ওঠে, আর কতদিন অপেক্ষা করব মাগো।

কত মেয়েমানুষ শচীনের জীবনে এসেছে গেছে। নাম মনে পড়ে না, মুখ হারিয়ে গেছে। দুই ভূতপূর্ব স্ত্রী আইলীন আর মার্গারিটা। সাদামাটা আইলীনের হাতে ছিল সেবা, রূপসী মার্গারিটার শরীর ভরে ছিল প্রেম। শচীনের মাটি।

শচীন ভুল করেনি ওদের ফিরিয়ে দিয়ে। অর্ধেক মানুষের ভার কেন সে চাপিয়ে দেবে করুণার ওপর। লোকে বলে অহঙ্কার, মানুষের দয়ায় না বাঁচতে চাওয়া কি অহঙ্কার? কি নিয়ে সে বেঁচে আছে এখন? ডরিসের বিরক্ত যত্ন, সুমনার বৃদ্ধদের সহ্য করা ভদ্রতা, দীনেনের অপরাধী ক্লান্ত চিকিৎসকের জিজ্ঞাসাবাদ—শচীন আর সইতে পারে না। মৃত্যু তাকে মুক্তি দিক। মায়ের হাতের সেবার মতো। মাটির হাতের প্রেমের মতো। সে বৃদ্ধ বয়সে আবার প্রেমে পড়ল কি করে? নিজের বিগত স্ত্রীর সঙ্গে?

মার্গারিটা একদিন কোনো খবর না দিয়ে কটেজে এসে হাজির।

শচীন সবে জামা কাপড় পরে উঁচু নরম চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছে, জন কখন আসবে গাড়ি নিয়ে। সে ভাবছিল আজকে ব্রাইটনে যাবে।

মার্গারিটা ঘরে ঢুকে মিংক স্টোল কাঁধ থেকে সরিয়ে একটু দুষ্টু হেসে বলল, কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে না তো ?

শচীন শুধু দেখল একটুক্ষণ, একটুও যেন অবাক না হয়ে হেসে বলল, মার্গারিটা বস। কেমন আছ ? ভালই আছ মনে হচ্ছে ? আরে বস।

মাটি আলতো করে শচীনের ঠোঁটে চুমু খেয়ে বসল। মাটি যেন বয়সের সঙ্গে আরো বেশি সুন্দর হয়েছে। বিলাসে, যত্নে জীবনের অভিজ্ঞতায় মেয়েরা যেমন মধ্যবয়সে সুন্দর হয়। ওর নীল চোখে গভীর নম্রতার বিষাদ। ওর তন্বী ভরাট দেহে সূর্যাস্তের রূপ।

মার্গারিটা হেলান দিয়ে আরাম করে বসে বললে, আমি ভাবলাম এসে দেখব বুড়ো ঝুরঝুরে হয়ে গেছ। তুমি কিন্তু একটুও বদলাও নি, শুধু চুলে পাক ধরেছে।

শচীন হেসে বলল, আমি কি বলব তোমাকে মার্গারিটা, তুমি আরো রূপসী হয়েছ।

আমার নাম কি ভুলে গিয়েছ ? কবে তুমি আমাকে মার্গারিটা ডাকতে ? ও উত্তরের অপেক্ষা না করেই সিগারেট ধরিয়ে বলল, আচ্ছা শচী তুমি এতদিন আমাকে কি করে দূরে সরিয়ে রেখেছিলে বল তো !

এখনই বা কাছে টানলাম কখন। শচীন ওর গলার সুর নকল করে বলে উঠল।

সাচী! মার্গারিটা জলতরঙ্গের মতো হেসে উঠল, কী জেদ, কী অহঙ্কার তোমার ! তোমার দেহ কি দিয়ে তৈরি ?

কফি করে দিতে বলব ?

না। আমি করে আনছি। মার্গারিটা রান্নাঘর আর বাথ-

রুমের খোঁজে চলে গেল।

শচীন অবশ্য ডান হাতটা বাঁ হাত দিয়ে সরিয়ে নড়েচড়ে একটু উঠে বসল। মাটি। মাটি কেন এসেছে এত বছর পরে তাকে দেখতে। কি চায় সে? টাকা পয়সা মাটির যা প্রাপ্য সবই তো সে দিয়ে দিয়েছে ডিভোর্সের চুক্তির সময়ে। আর তো মাটিকে শচীনের কিছু দেবার নেই।

মাটি কফি করে এনে এক কাপ কফি শচীনকে দিয়ে বলল, কেমন তোমার হাউসকিপার? বসে বসে পয়সা নেয়। ঘর বাড়ির যা অবস্থা করে রেখেছে না।

চলে তো যাচ্ছে। বুড়ো মানুষ।

জন দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, সুপ্রভাত মিঃ ব্রাট। মার্গারিটাকে দেখে থমকে জন একটু মাথা নিচু করে বলল, সুপ্রভাত মাদাম।

শচীন আলাপ করিয়ে দিল। জন, মিস মার্গারিটা।

প্লিজ টু মিট উ মিস মার্গারিটা।

প্লিজ টু মিট উ জন।

আমি কি ফিরে যাব আজকে, না অপেক্ষা করব।

তুমি অপেক্ষা কর একটু। আমি আসছি। আজকে ব্রাইটনে চল। সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করছে।

জন হাসি মুখে বেরিয়ে গেল।

আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমাকে নিয়ে যাবে তো!

নিশ্চয়। সুন্দরী যুবতীর সঙ্গ তো আমার ভাগ্যের ব্যাপার। শচীন আস্তে আস্তে ওঠার চেষ্টা করল। অবশ্য ডান পা বাঁ হাত দিয়ে সরিয়ে মেঝেতে রেখে চেয়ারের হাতলে বাঁ হাত রেখে উঠতে লাগল। মার্গারিটা হাত বাড়িয়ে শচীনকে ধরতে যেতেই শচীন ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠল, আমি নিজেই পারি চলাফেরা করতে। তোমার সাহায্যের দরকার হবে না।

মাটির কানের হীরে চকমক করে উঠল। সে জোর করে মুখ ফিরিয়ে ধরে রাখল নীল চোখের জল।

শচীন যুদ্ধ শেষ করে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, চল। তুমি এগোও আগে।

যাচ্ছি। মাটি ছোট্ট করে বলে বাইরে এসে দাঁড়াল। সে যেন আর সহ্য করতে পারছিল না শচীনের এই যুদ্ধ দেখতে। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল সবল বলিষ্ঠ শচীন দুহাত দিয়ে জড়িয়ে এক পলকে ওকে কোলে তুলে নিয়ে মুখ নামিয়ে বলছে, চল মাটি, সারাদিন অনেক সময় নষ্ট করেছি পয়সা রোজগার করে। কি রাজি?

চল। মাটি ফিস ফিস করে বলেছে, সারাদিন আমিও তো তোমার জন্য বসে আছি।

শচীন দেয়ালের কাঁধ ধরে ধরে নেমে বলল, কি মাটি মন বদলালে না কি?

স্বপ্ন ভেঙে মার্গারিটা চমকে হেসে বলল, আমি কি মন বদলাই? চল।

জন গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। আবার সেই গাড়িতে ঢুকে বসার লড়াই। মার্গারিটা অন্য দরজা খুলে এসে বসল।

কি এত চুপচাপ যে?

মনে পড়ে কোনদিনও তোমার হাতে হাত না দিয়ে বাড়ি থেকে একসঙ্গে বেরিয়েছি?

ইতিহাস মাটি। শচীন একটু ভেবে বলল, তুমি ভুলে গেছ তুমি আমার হাতে ভর দিয়ে হাঁটতে?

আমার হাতে ভর দিতে তোমার এত আপত্তি?

অভ্যাস। স্বভাব। যাকগে আমার কথা। কেমন আছ, কোথায় থাক বল?

বিয়ে করেছি কি না আবার জিজ্ঞেস করলে না তো?

আঙুলে তো দেখছি বিয়ের আংটি। স্বামী বস্তুটি কোথায়?

যদি কিছু না বলি ?

বল না। দরকার কি ? সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে ব্রাইটন বীচে যাচ্ছি, এতেই আমি খুশি।

ফ্লার্ট করছ আমার সঙ্গে ?

করলামই না হয় একটু। সুযোগ তো হয় না।

সুযোগ চাও না বল। তোমার পুরোনো কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হল লণ্ডনে। ওরা বলল, তোমার নাকি কড়া নিষেধ। কেউ আসতে পারবে না তোমাকে দেখতে।

জন। শচীন চেঁচিয়ে বলল, গাড়ি ফেরাও। ব্রাইটনে যাব না। 'পিঙ্ক কাউ'তে নিয়ে চল।

সারা রাস্তা এবার চুপচাপ। হেমন্ত। গাছে গাছে রঙের হৈ চৈ পড়ে গেছে। হলুদ, তামাটে, বেগুনী, ঘন লাল গাছের পাতা। পাতা ঝরতে শুরু করেছে। হাওয়ায় পাতার পিছনে পাতারা দৌড়চ্ছে। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, রোদের আলো পড়ে ঝকমক করছে চারদিক। রোলস রয়েস চালালে মনে হয় যেন গাড়ি কংক্রীটের রাস্তায় ভেসে চলেছে। চোখ বুজে থাকলে গতি বোঝা যায় না। কোনো কোনো রাস্তা এত সরু যে বিরাট গাড়ির জানালায় গাছের ডালপালাগুলো ঝাপটা মেরে ঢোকার চেষ্টা করছে। এক পাশে বিরাট বনের বিস্তার, অন্যদিকে চাষের জমি। এক জায়গায় জড় করা রাস্তার ধারে খুব পুরনো সুন্দর ছোট ছোট কটেজ, ছোট ছোট দোকান। ইতিহাস থেমে আছে।

গাড়ি বেনেনডেন-এর পাবে এসে থামল। লান্চব্রেক-এর ভিড় শুরু হয় নি। দু-চারটে গাড়ি পার্ক করা আছে ফুটপাথ ঘেঁষে।

শচীন্দ্রনাথ থপ থপ করে পাব-এ ঢুকতেই ম্যানেজার এগিয়ে এল।

সুপ্রভাত মিঃ ব্রাট। চমৎকার দিন।

চমৎকার দিন আমার সঙ্গী হয়ে এসেছে।

চার্মিং। ম্যানেজার মার্গারিটাকে বাউ করে আগুনের ধারে জানালার পাশে ওদের নিয়ে বসাল। পনেরোশো সালের পাব। ট্যুরিস্টরা দেখতে আসে, ড্রিংক করে। আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যাণ্ডার, ক্যানাডার ট্যুরিস্ট। যে ইতিহাস ওদের জন্ম দিয়েছে, দূর দূর দেশে পাড়ি দেবার সাহস জুগিয়েছে, শ্বেত অহঙ্কারে অন্যদেশের সভ্যতাকে বুটের তলায় রেখে এসেছে এতদিন। বিজয়ী পূর্বপুরুষের জন্মস্থান দেখতে আসে।

মাটি ওর কাঁধ থেকে স্টোল নামিয়ে রেখে বলল, তোমার অদ্ভুত গুণ আছে বিশিষ্ট পাব খুঁজে খুঁজে বের করার।

দেয়ালে দেয়ালে পুরনো কালের ঝকঝকে তামার নানা রকমের বাসন টাঙানো। সেকেলে ফায়ার প্লেসে কাঠের আগুন নেচে চলেছে।

অবশ ডান হাত আর পা কায়দা করে বসতে বসতে শচীন বলল, মহিলা খুঁজে পাবার ক্ষমতাও ছিল এককালে।

মাটি আনমনে জানালায় চোখ ফেরাল। চোখ জুড়িয়ে যায় রংয়ের বাহার দেখে।

বড় সুন্দর দেশ ইংলণ্ড। এতদিন কি করে ছেড়ে ছিলাম ভাবি।

এই পুরনো ইংলণ্ডের একটা আলদা চার্ম আছে সত্যি। শচীন জবাবে বলল। যতই রাগ করি, গালাগাল দিই না কেন।

শ্যাম্পেন নেয়া যাক। এত বছর পরে দেখা হল।

মাটি দুহাতে শচীনের বাঁ হাত তুলে নিয়ে বলল, নিশ্চয়।

শচীন আস্তে করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, তারপর কেমন লাগছে বল ?

এখন ?

হুঁ।

সবকিছু বাজীকরের খেলার মত মনে হচ্ছে। কোথায় নিউইয়র্ক আর কোথায় টানব্রীজ ওয়েলস। কালকে ছিল অন্য মানুষরা, আজকে শুধু তুমি। পঁচিশ বছর পরে তুমি। সেই তুমি আবার নও, আমিও ঠিক সেই আমি আর নেই।

আঃ হাঃ শচীন হেসে বলল, জীবনের ইতিহাস বলতে শুরু কর না যেন।

বরফে ভরা বালতিতে শ্যাম্পেন আসল ন্যাপকিনে জড়ানো। শ্যাম্পেনের কর্ক বুলেটের মত ফায়ার প্লেসে গিয়ে ঢুকল। বারটেণ্ডার শ্যাম্পেন গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিল। শচীন বলল, ধন্যবাদ। জন কি খাবে, ওকে দিও। অন্যদিন জন আর শচীন একসঙ্গে বসে ড্রিংক করে।

ইতিহাস। মাটি ওর নীল চোখ আগুনের শিখার ওপর রেখে বলল, বিয়ের আগে বা পরে তুমি কোনদিনও জানতে চাও নি আমি কোথা থেকে এসেছি, আমি কেমন করে আমি হয়েছি। ভাবতাম তুমি অতি স্বার্থপর, নিজেকে ছাড়া তোমার কোনো কৌতূহল নেই। মাটি শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললে, পরে ভেবে দেখেছি, তোমার কথাই বা তুমি কতটুকু আমাকে বলেছ। আমি তোমার স্ত্রী ছিলাম, তবু কতটুক তোমাকে জানি। মাটি ওর নীল চোখ শচীনের কালো চোখের মণিতে রেখে বললে, এতবছর পরে দেখা। তোমার কোনো ঔৎসুক্য নেই। কেমন ভাবে আমার দিন কেটেছে। ক'টা স্বামী হয়েছে। ছেলেমেয়ে আছে কিনা। তোমার কিছু জানতে ইচ্ছা করে না শচী ?

অনুযোগ করছ ?

না গো না। তোমাকে আমার বুঝতে ইচ্ছা করে, দ্যাটস অল!

কি বলব ? আজ তুমি আছ, কাল তুমি থাকবে না। আমরা তো সবাই পথিক। ইতিহাসের জঞ্জাল রাখার জায়গা কোথায় বোচকাতে।

তোমাকে আমি কোনোদিন বুঝলাম না।

দরকার কি এত পরিশ্রমের! চুপচাপ। দুজনেই শ্যাম্পেনে চুমুক দিল। আকাশ অন্ধকার করে আবার টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

মাটিই আবার কথা বলল, তোমার ভাইরা সকলে ভাল আছে?

দেবু মারা গেছে।

দেবু মারা গেছে! কবে, কেমন করে?

ক্যান্সারে। সেও ইতিহাস হয়ে গেছে।

সাবিটা?

সবিতার সঙ্গে দেখা হয় না আমার। শুনি ইণ্ডিয়া হাউসেই কাজ করছে। ওর মেয়ে মায়া ইংরেজ বিয়ে করেছে।

ডেবু তোমাকে সত্যিই ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। ওই বোধহয় একজন যে তোমাকে ভয় পেত না।

হুঁ।

জান। নীল চোখ ছল ছল করে মাটি বলল, ডেবু বোধহয় জানত ও বেশিদিন বাঁচবে না। লোভ, ভয় বলে ওর কিছু ছিল না। তোমার সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল, অথচ তোমরা দুজনে একেবারে আলাদা চরিত্রের। জান, ডেবুর কথা আমি অনেক ভেবেছি। ওর কথা ভেবে আমি মনে শক্তি পেয়েছি।

উঁহু!

আমি একাই বকে চলেছি।

ভাল লাগছে শুনতে।

পাব-এ ভিড় হতে শুরু করেছে।

চল ওঠা যাক। দুপুর গড়িয়ে এল।

মাটি টেবিল সরিয়ে উঠে দাঁড়াল, স্টোল পিঠে জড়িয়ে। ওর ব্লণ্ড চুল এখনও সিল্কের মতো মসৃণ। ইংরেজরা আড়চোখে দেখে। সবাই মাটিকে দেখল। মাটি অভ্যস্ত। বলল, চল। মাটির খুব

ইচ্ছা করল হাত বাড়িয়ে দেয়। পাব-এর দু-চারজন পুরনো খদ্দের হাসিমুখে গুড আফটারনুন বিনিময় করল শচীনের সঙ্গে।

এখনও ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ওরা গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল। গাড়ি চলল। কোনো কথা নেই। মাটি আড়চোখে দেখল শচীন ঝিমুচ্ছে। ঠোঁট বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। মাটির বুকটা মুচড়ে উঠল। সে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুছিয়ে দিতে গিয়েও থেমে গেল। শচীন শিশুর মতো ক্লান্ত হয়ে গেছে। মাটি শচীনের অবশ ডান হাত নিজের হাতে তুলে নিল। জীবনের কোনো করুণা নেই। মেঘের চোখে জল নেই, ঠাণ্ডা বৃষ্টি আছে। মাটির চোখ ভরা জল রাগে গোলাপী হয়ে উঠল।

গাড়ি থামল কটেজে। জন আগে মাটির দরজা খুলে তারপরে শচীনের দিককার দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল যতক্ষণ না শচীন নামে।

থ্যাঙ্ক উ জন। আজকে বিকেলে আর এস না। বাড়িতেই থাকব।

শচীন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, আমি এবার খেয়ে বিশ্রাম করব মাটি!

বিদায় নেই, আবার কবে দেখা হবে তা নেই, সোজা কথা, আমি একা থাকতে চাই, তোমরা যাও।

মাটি যেন জনের মতো গাড়ির ড্রাইভার।

উইকএণ্ড-এ কি করছ?

মণীন্দ্র, দীনেন আসবে।

তুমি চাও না আমি আসি?

না।

অন্যদিন আসতে পারি?

এস। ফোন করে এস।

মাটি ওর বি এম ডাবলুতে স্টার্ট দিয়ে হুম করে চলে গেল। পিছন ফিরে তাকাল না। শচীন ছাড়া অন্য কোনো পুরুষমানুষ মাটির সঙ্গে এরকম ব্যবহারের কথা ভাবতেই পারবে না। কিন্তু শচীনের ওপর রাগ অভিমানের পালা সে অনেকদিন আগেই চুকিয়ে দিয়েছে।

মাসতিনেক পরে হঠাৎ মাটি ফোন করে বলল, আমি আসছি আজকে।

অসময়ে বরফ পড়তে শুরু করেছে। গাছের ন্যাড়া ডাল সাদা হয়ে গেছে। আকাশ বরফের মত গম্ভীর। মাটি বুট থেকে বরফ ঝেড়ে ঘরে ঢুকল, শচীনের দেয়া বহুকালের ফারকোট খুলতে খুলতে খুশিমুখে বলল, এবার ওয়াইট ক্রিস্টমাস হবে মনে হচ্ছে।

শচীন মাটিকে দেখে খুশি হয়ে বলল, এই দিনে গাড়ি চালিয়ে আসলে তুমি! যাও কফি করে আন, ব্রাণ্ডি খাবে তো নিয়ে এস। মিসেস মরিস আসবে না আজকে।

জানি, জনও নিশ্চয় আসবে না। সারাদিন আমার সঙ্গে তোমার একা কাটাতে হবে! মাটি দুষ্টু হেসে বলল।

এমন দিনে এর চেয়ে আর কি ভাল হতে পারে? শচীনও হেসে বলল।

মাটি কফি করে নিয়ে এল।

তোমার টানব্রিজ ওয়েলস-এর রাস্তা খুব খারাপ। গাড়িটা যা স্কিড করল না! ভাগ্যিস রাস্তায় আর কেউ ছিল না!

আমি কোনোদিনও পছন্দ করি না তুমি স্পোর্টস কার চালাও। তোমার যা জোরে চালাবার বদ অভ্যেস।

মনে আছে তোমার! মাটি হেসে ফেলল, কিছুতেই তুমি আমাকে স্পোর্টস কার কিনে দেবে না! নিয়ে এলে হাতির মত জাগুয়ার।

মনে আছে মাটি!

সাচী তুমি আমাকে একটুও ভালবাস এখনো ?

পঁচিশ বছর পরে এ কী রকম প্রশ্ন মাটি! কত স্রোত বয়ে গেছে ব্রিজের তলায়।

আমার জানার দরকার সাচী। মাটি একটু যেন আকুল হয়ে চোখ নামিয়ে বললে, তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। আমার—

আমার কাঁধে, শচীন কঠিন গলায় বলল, কাঁদার জন্য কি তুমি ফিরে এসেছ? আমি জানতে চাই না তোমার জীবন ভাঙার গল্প।

মাটি হঠাৎ উঠে চলে গেল ঘর থেকে। শচীন বাঁ হাতে খবরের কাগজ তুলে নিল। ওর হাতটা একটু কাঁপতে লাগল। খানিক পরে মাটি ফিরে এল ট্রে করে স্যাণ্ডউইচ, শেরির বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে। ওর চোখ শুকনো। নীল চোখের তারা শুধু ঝকঝক করছে।

মাটি বসে অল্প অল্প ছিঁড়ে স্যাণ্ডউইচ খেতে লাগল। শেরি এগিয়ে দিল শচীনকে।

তোমার কেমন করে দিন কাটে সাচী ?

যেমন দেখতে পাচ্ছ। শচীন কাগজ নামিয়ে বললে, মিসেস মরিস ঘরবাড়ি দেখাশোনা করে অর্থাৎ করার কথা! সকালে ব্রেকফাস্ট করে দিয়ে যায়, দুপুরের জন্য কোল্ড লানচ। সন্ধ্যেবেলা রান্না করে দেয় এসে। জন কোনদিন দুবেলা আসে, কোনদিন একবেলা। ও শুধু আমার ড্রাইভার নয়, আমার বিশ্বস্ত বন্ধু।

জন কোন দেশের ?

ট্রিনিদাদের। চোদ্দ বছর বয়সে মার কাছে এসেছে লণ্ডনে। সৎবাবা মারধোর করত। পালিয়ে গেছে বাড়ি থেকে।

তুমি ওর এত খবর জান!

বাঃ, আমার চাকরি করছে, জানতে হবে না।

তোমার বন্ধুরা আসে না ?

পিটার আসে মাসে একবার।

পিটার কি তোমার অ্যাকাউন্‌টেন্ট?

হ্যাঁ। তোমার মনে আছে?

আর কে আসে?

মনীন্দ্র বা দীনেন—মণি রোববার রান্না করে নিয়ে আসে। দেশি খাওয়া খাই তখন।

আর কেউ আসে না?

তুমি আসছ।

তোমার একা লাগে না?

মার পেটে তো ন'মাস একা ছিলাম।

ও সাচী। তোমার বুকটাও কি পাথর হয়ে গেছে?

বুকে এসে দেখ।

মাটি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল শচীনের বুকে। টেলিফোন হাতে লেগে ছিটকে পড়ল কার্পেটের ওপর।

ঠোঁটে, দাঁতে চুমু খেল দুজনে। পিপাসায়, ক্ষুধায়, মাটির কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। সমস্ত শরীর যেন নরম অবশ হয়ে আসছে। সে শুনতে পেল, বুকে মাথা রেখে শুনতে চাইল সাচীর বুকের দুম্‌ দুম্‌ শব্দ। কিন্তু সাচা অস্থির। এ যেন লোভী দেহের কাঙাল ভালবাসা। মাটি নিঃশ্বাস নেবার জন্য একটু সরে আসতে চাইল, পারল না। সাচীর বাঁ হাতে যে এত শক্তি থাকতে পারে বিশ্বাস করা মুশকিল। মাটি হাঁসফাঁস করে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, একটু বিশ্রাম চাই।

সাচী সঙ্গে সঙ্গে শিথিল করে দিল হাত। একটু শেরি দাও।

মাটি গ্লাস এগিয়ে দিল। নেমে বসল সাচীর পায়ের কাছে।

একটু পরে সাচী বলল, আমার কাছে এস। আমি বাঁ হাত দিয়ে তোমাকে তুলতে পারব না।

মাটি ঘুরে হাঁটু গেড়ে শচীনের বুকে মাথা রাখল। শান্তি নেমে

এল ওর বোজা চোখে। কয়েক মুহূর্ত, শচীন জোর করে মাটির মুখ তুলে চুমু খেতে লাগল কামড়ে ধরে। মাটি জোর করে আবার সরে এল। জ্বালাধরা ঠোঁটে আঙুল বুলিয়ে।

তুমি তো এমন করে আগে আমাকে ভালবাসতে না।

ভুলে গেছ তুমি।

মাটি উঠে শচীনের মুখ দু'হাতে জড় করে ওর ঠোঁটে আলতো করে চুমু খেয়ে বলল, আমি একটু হেঁটে আসি। আমার মাথাটা পরিষ্কার হবে।

শচীন মাটির হাত ধরে বলল, সাবধানে যেও। বরফে রাস্তা পিছল হয়ে গেছে।

আমি সুইডেনের মানুষ ভুলে গেছ তুমি ?

মাটি তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল। মুক্ত আকাশে ছাড়া পাবার নিঃশ্বাস। কেন এমন মনে হচ্ছে ? ও তো ভালবাসতেই এসেছিল সাচীকে! মাটি জোরে জোরে হেঁটে রাস্তার কোণে দাঁড়াল মুখ তুলে। মুখে লাক্স ফ্লেক্স-এর মত বরফ পড়ছে। ও আবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে উঠল, আঃ। হঠাৎ ওর মনটা ছোট মেয়ের মতো খুশিতে ভরে গেল। পায়ে যেন ছন্দ এসেছে। বুটজুতো দিয়ে বরফ ছিটিয়ে সে হাঁটতে লাগল।

সবুজ কখন ধপধপে সাদা হয়ে গেছে। ওর খুব ইচ্ছে করতে লাগল ছোটবেলার মত বরফে গড়াগড়ি খায়। দেখল ও একা নয়। বাচ্চারা খেলা করছে, মায়েরা সঙ্গে। মটি বসে পড়ল বরফে ঢাকা টিপির ওপর। মাঝে মাঝে গাড়ির শব্দ ভেসে আসছে। বাচ্চাদের খুশির কলকাকলি। মাটির চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। বরফের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। দুঃখে, বেদনায়। সে দুহাত জড় করে মনে মনে প্রার্থনা করল, ঈশ্বর কেন তুমি সাচীকে অবশ করে দিয়েছ ? ও কি জীবনকে এত ভালবাসত বলে ? জীবনকে ভালবাসা কি পাপ ? ক্ষমা কর ওকে ঈশ্বর!

একটা চার বছরের বাচ্চা মেয়ে ওর কোটে ঝাঁকি দিয়ে বলল, তুমি কাঁদছ কেন ? বড়রা তো কাঁদে না।

বড়রাও কাঁদে, মাটি ঝুঁকে ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, কাঁদে দুঃখ পেলে। আনন্দ হলে।

কি হয়েছে তোমার ? দুঃখ না আনন্দ ?

শ্যারণ কাম হেয়ার। ডোণ্ট বদার দ্য লেডি।

শ্যারণ এক লাফে বরফে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে গেল। মাটি হাত দিয়ে চোখ মুছে মনে মনে বলল, শ্যারণ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে। বিরক্ত তো করেনি।

মাটি ফিরে দেখল সাচী চেয়ারে বসে বসেই ঘুমুচ্ছে। সে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে চলে গেল।

মাটি ফিরে এসেছে ?

হ্যাঁ, মাটি গলা ঝেড়ে বলল, খাবার তৈরি করছি।

আমি খেয়ে নিয়েছি তোমার দেরি দেখে। ফ্রিজে খাবার আছে। তুমি একটু কফি করে এনো আমার জন্য।

আনছি।

মাটি কফি নিয়ে এসে বলল, তোমার ছবি আঁকতে দেবে ?

না।

এক কথায় না। সেই 'না' আর 'হ্যাঁ' হবে না এই তো ?

আমি খুব ইণ্টারেস্টিং স্টাডি তোমার কাছে, না ? একদিকে অবশ অন্য দিকে শক্তি। একদিকে অসহায়, তবুও হার মানব না। তাই না ?

শচীন তুমি যদি আবার ভাল হয়ে যেতে! আমি প্রার্থনা করছিলাম—মাটি থেমে গেল। ওর বুক কানায় কানায় ভরে উঠল, করুণা মমতা ভালবাসায়। ইচ্ছে করল ছুটে জড়িয়ে ধরে সাচীকে। জীবন এত দুঃখ দেয় কেন ?

তুমি এবার আস্তে আস্তে রওনা দাও। চারটে বাজে। রাত

হয়ে গেছে এখনই। আলোগুলো জ্বালিয়ে দিও।

হ্যাঁ। যাই এবার বরফ পড়ে হয়তো রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। মাটি পর্দা টেনে আলো জ্বেলে দিল। বসল সাচীর পাশে। মাটি উঠতে যেতেই সাচী বলল, একবার আমার কাছে এস।

মাটি ইতস্তত করল না। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাও করল না। শচীনই ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল। শচীনের ভালবাসায় কোন করুণা নেই, ভিখিরীর কেড়ে নেওয়ার নির্মম দাবি আছে। সাধ আছে সাধ্য নেই। মাটি স্কার্ট নামিয়ে ব্রা আর ব্লাউজের বোতাম লাগিয়ে কোট পড়ে নিল।

যাই সাচী। আবার আসব।

কবে ?

টেলিফোন করে আসব। একটুখানি অবসর পেলেই আসব।

তাড়াতাড়ি এস। গাড়ি আস্তে চালিও।

টেবিল ঘুরে গেছে।

মাটি চলে গেলে শচীন উঠল হাতমুখ ধুতে। বহু বছর পর মেয়েমানুষের দেহ ওর বাঁ দিকের দেহকে প্রচণ্ড বেগে জাগিয়ে তুলেছে, মনে হচ্ছে ওর ডানদিকটাও বুঝি সজাগ হতে চাইছে। ওর যৌনপিপাসা যে এখনও এত তীব্র সে যেন নিজেও জানত না। তরুণী তো প্রায় রোজই দেখে যখন বেরোয়। দেখলে ভাল লেগেছে। কখনও মনে হয়েছে কাউকে দেখে কাছে পেলে হয়তো ভাল লাগত। একটু ইচ্ছা, একটু সাধ, একটু পরে মেঘের মত ভেসে চলে গেছে। দেহমনকে অযথা বিব্রত করে নি।

মাটি এসেছে। কেন ? দুঃখের ভাগ দিতে ? আমারকাছে কেন ? ওর জীবনে কি ভক্ত-বন্ধুর অভাব ? তবে ? সেই পুরোনো ভালবাসা ? শচীন মনে মনে মুখ ফিরিয়ে নিল। ওর উদবৃত্ত টাকার জন্য, মরার আগে যাতে ওকে উইল করে দিই ? মনে পড়ল ওর

প্রথম স্ত্রী আইলীন ওকে যাবার আগে বলেছিল, তুমি বড় বেশি বড়লোক হয়ে গেছ। তোমার কাছে যারা আসে তারা আসে টাকার লোভে। যারা আসে তোমারই জন্য তুমি ভাব তারাও এসেছে তোমার টাকার লোভে।

যখন বড়লোক ছিলে না, তখন তোমার বন্ধু ছিল। এখন তোমার কেউ নেই। থাকবেও না। আইলীন কি অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিল শচীনকে ?

শচীন ফিরে এসে আবার বসল চেয়ারে, ফুট স্টুলে পা তুলে দিয়ে। সব কিছুই অভ্যাস হয়ে যায়। সে যেন ভুলেই গেছে দুই পা দুই হাত নিয়ে বাঁচার কথা। তবু মাঝে মাঝে ভীষণ রাগ হয়। দেহটা মাথার নির্দেশ মানতে নারাজ। হাত থেকে জিনিস পড়ে যায় তাতেই পরিশ্রম। আধ ঘণ্টা লাগে শুধু জামাকাপড় খুলতে শোবার আগে। ডান পাশ পড়ে যাবার আগে সে কোন দিন ভাবেই নি দেহের কলকব্জা এত জটিল। ব্যবসায় পরিশ্রম ছিল, ভাবনা ছিল, কিন্তু ওতে মজা ছিল। মজাটা চলে গেছে জীবন থেকে। থেকে গেছে প্রতিদিন বেঁচে থাকার যুদ্ধ। ভাবে নি কি সে মৃত্যুর কথা, আত্মহত্যার কথা। মরবিড চিন্তার কালো মাথাগুলো ডুবে গেছে জীবনের স্রোতে। সব সময়েই খুঁজে পেয়েছে বেঁচে থাকার একটা না একটা অজুহাত। চারদিকে এত উত্তেজনা একসাইটমেণ্ট—কোথায় যুদ্ধ, কোথায় হুমকি, রেফিউজী, চন্দ্রে অভিযান, স্পেস ল্যাব, কত রকমের আবিষ্কার কত রঙয়ের দ্বন্দ্ব, সে দর্শক হয়ে দেখতে এত ব্যস্ত পরের অঙ্কে কি ঘটনা ঘটবে, সে ভাবতেই পারে না। নাটক শেষ হবে, একদিন পর্দা নেমে আসবে। মাটি এক যুগ পরে শচীনের নিজের জীবনে মজার চাকচমক নিয়ে এসেছে।

শচীন চোখ বুজে ঝিমোতে লাগল। চার্চে ঘণ্টা বাজছে। শচীন চোখ খুলে ট্রানজিস্টার চালিয়ে দিল। ওর বাড়িতে টিভি নেই। সন্ধ্যা বড্ড বড় শীতকালে। হুইস্কি খাবার সময় হয়েছে। উঠতে হবে।

শচীন উঠে হুইস্কি আর গ্লাস নিয়ে আবার বসল। একটু বিব্রত মুখে ওর দেহে আজকে ক্লান্তি নেমে এসেছে। মাটি যেন ওর ভুলে যাওয়া জীবনের এক টুকরো আশা, একটুখানি সুন্দর স্বপ্ন। সে আবার কবে আসবে? সে আস্তে আস্তে ডাকল, মাটি। শুনতে ভাল লাগল, সে আবার ডাকল বাংলায়, আমার সোনার মাটি। বাংলা দেশ।

মাটি এসেছে বেশ কয়েকবার। মমতায়, সমবেদনায়। জানে প্রার্থনায় শচীনের ঘুমন্ত ডান দিক জেগে উঠবে না ত তবু সে মনে মনে প্রার্থনা করেছে। ওকে ভাল রেখ, সুস্থ রেখ ভগবান।

যাবার ডাক এসেছে। মাটি বলল, বস্টনে যাচ্ছি সোমবার। অ্যালেকসী-আমার ছেলে হার্ভার্ডে আছে। ওর প্রফেসার ফোন করেছিল কাল। ও—

আমাকে তোমার কারণ বলার তো দরকার নেই। তোমার যে ছেলে আছে এত প্রথম শুনলাম।

তুমি যে আমার কথা শুনতে চাও না। যদি বলি অ্যালেকসী তোমার ছেলে?

মাটি। শচীন প্রায় ধমকের গলায় বলে উঠল।

না না। মাটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। অ্যালেকসী তোমার নয়। তোমার হলে আজ হয়তো এমন হত না। তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলাম তুমি দাও নি। এখন যে বড়ই দেরি হয়ে গেছে।

শচীন চেয়ারে হেলান দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুমি আমেরিকাতে গিয়ে মেলোড্রামা শিখে এসেছো।

আর তুমি? তুমি কি? ওর নীল চোখ ঝকঝক করে বলল, তুমি শুধু টাকার ফাঁপা অহঙ্কারের বেলুন। বেলুন চুপসে গেছে, অহঙ্কার যায় নি। চিরকাল মেয়েমানুষকে খেলনার মত ভালবেসেছ, পুরনো হলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। ডাস্টবিনে। ইউ আর নাথিং।

মাটি। শচীন একটু তীক্ষ্ণ ভাবে বলল, ঝগড়া করতে চাইলে তোমার অন্য মানুষদের কাছে যাও। আমার সময় বড় অল্প।

মাটি মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। হঠাৎ শচীনের বিশাল বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর কান্না থামলে শচীন বাঁ হাত দিয়ে মাটিকে জড়িয়ে ধরল। মাটি বলল থমথমে গলায়, আমাকে ক্ষমা কর সাচী; আমার মাথার ঠিক নেই। অ্যালেকসী—

মাটি বলতে গিয়েও থেমে গেল। শচীন তো শুনতে চায় না। ভুলে যাওয়া অভিমানে মাটি এতটুকু হয়ে গেল।

শচীন মাটির কপালে চুমু খেয়ে নিচু গলায় বলল, এত রাগ করতে নেই মাটি!

মাটি যন্ত্রের মত শচীনের যৌনাবেগে নিজেকে ছেড়ে দিল। শচীন ক্লান্ত হয়ে একটু পরে বলল, হুইস্কি নিয়ে এস। শচীন কাঁপা বাঁ হাতে ট্রাউজারের জিপ তুলে দিল।

মাটি ফিরে এসে সুস্থির হয়ে বসল। ঝড়ের পরে শান্তির মতো। শচীনের মুখ মুছিয়ে দিল ভিজে তোয়ালে দিয়ে, এই শীতেও ঘাম ফুটে উঠেছে। বাইরে বসন্তের আবেশ। জানালার ওপারে ফুটপাতে গোলাপী আপেল ব্লসম। সাদা চেরিব্লসম ঝাঁকে ঝাঁকে অল্প অল্প দুলছে। দূর দূর থেকে লোকে কোচে করে টানব্রিজ ওয়েলস্-এর আপেল আর চেরিব্লসম দেখতে আসে।

কাল এস তুমি।

বাঃ কাল শনিবার না! তোমার ভাইরা আসবে।

আসলই বা। তুমি তো ওদের দেখতে চেয়েছিলে!

হ্যাঁ আমাকে দেখুক আর ভাবুক ওদের সম্পত্তির ভাগ বসাতে এসেছি।

ওরা জানে তুমি এসেছ।

তুমি বলেছ ওদের?

আমি কোনোদিন ব্যক্তিগত কথা বলি?

মাটি একটু চুপ করে থেকে বলল, ডেবু বেঁচে থাকলে আসতাম। আমি ফিরে আসি তারপরে দেখা যাবে।

কবে ফিরবে তুমি ?

সাচীর প্রশ্ন নয়, গলার স্বরে মাটি চমকে উঠল ব্যথায়, সে আস্তে আস্তে বলল, অ্যালেকসীকে হয়তো নার্সীংহোমে দিতে হবে। যতদিন মাথা ঠিক না হয়, হয়তো থাকতে হবে। মাটি শূন্য গলায় বললে, জানি না কতদিন লাগবে!

তোমার টাকার দরকার ?

না, সাচী। মাটি বলল, জীবনে আমার ঐ একটি জিনিসের অভাব নেই। অল্প বয়সে স্বপ্ন দেখতাম জীবনে দুটো জিনিস পেলে সুখী হব—অনেক টাকা আর খ্যাতি। সে দুটোই আমার হয়েছে। অথচ—মাটি হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে বললে, আমার কোথায় দোষ সাচী ? তুমি আমাকে ভালবাসতে, তাও আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। আমি আর কাউকে ভালবাসতে পারি নি। শুধু দুঃখ দিই অপরকে, নিজেকে। কেন সাচী ?

আমেরিকা তো সাইকো এ্যানালিস্টের দেশ। ওদের কাছে যাও, ওরা হয়তো উত্তর খুঁজে পাবে। শচীন একটু পরে মাটির হাত তুলে নিয়ে আনমনা ভাবে বলল, জীবনে কি সব পাওয়া যায় ? তুমি কি নিজেই জান তুমি কি চাও ? সুখ কি চাওয়ার অপেক্ষা করে ?

শচীন নিজের মনে ভাবল, ওর গরিব মা বলত, সুখ তো মায়া। সে মায়ার পেছনে শচীন তো কোনোদিনও ছোটে নি। তার যা ভাল লেগেছে সে তা করেছে, ভাল লাগবে ভেবে লড়াই করেছে। লড়াই ভাল লেগে গেছে। গড়েছে, ভেঙেছে। ভাল লাগা আর সুখ কি এক ?

কি ভাবছ তুমি ?

এমন কিছু নয়।

আমি লক্ষ্য করি আজকাল কথা বলতে বলতে তুমি চুপ করে যাও। কি যেন ভাব। তুমি বড় কিপ্টে, বলতে চাও না।

কি বলব মাটি, অনেক কথা বলেছি, অনেক কথা শুনেছি। সত্য মিথ্যা। মিথ্যায় ঢাকা সত্য, সত্যেয় ঢাকা মিথ্যা। আর ভাল লাগে না।

কিন্তু, মাটি একটু ভেবে নিয়ে বলল, ভাবনা তো নিজের সঙ্গে কথা বলা। আর কথা মানেই তো সত্য মিথ্যা মেশানো। আমরা আবেগকে অনুভব করার আগে, শব্দ দিয়ে নষ্ট করে ফেলি।

তা হবে। নিজের সঙ্গে কথার খেলা। পরের সঙ্গে খেলার পালা তো আমার চুকে গেছে।

মাটি হঠাৎ দুস্টু হেসে বলল, আমার হাতে হাত নিয়ে বলছ খেলার পালা চুকে গেছে।

শচীন হাসল। আদর করে মাটিকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, তুমি এককালে আমার স্ত্রী ছিলে। তোমাকে এত ভালবাসতাম যে কোথায় রাখব ভেবে পেতাম না। ওরই কিছু উপছে থেকে গেছে বোধহয় আমার বুকে।

তুমি তো আমিও। তুমি কি পর ?

শচীন বলল, না, তোমার সঙ্গ, তোমার স্পর্শ আমার একটা দিককে আলোয় আলো করে দিয়েছে। তুমি চলে গেলে সে আলো কি আমার নিবে যাবে ?

মাটি শচীনের দুই হাতে মুখ রেখে অল্প অল্প চুমু খেল। দয়া করে নয়, বিদায় নেবার আগে ভালবাসায়। শচীন অন্যদিনের মতো খামচে কাছে টেনে নিল না, হাল্‌কা গলায় বলল, চল প্যানটাইলস্‌-এ ঘুরে আসি।

চল। মাটি হাল্‌কাভাবে উঠে বলল, বুড়ো বয়সে অনেক প্রেম হয়েছে।

জান, সাচী ওঠার চেষ্টা করতে করতে বলল, অল্পবয়সীরা ভাবে

প্রেম ওদের একচেটে। প্রেম-ভালবাসা যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যায় না কে বোঝাবে ওদের!

আমরা বোঝাব। মাটি উচ্ছ্বল হয়ে বলল, ওদের দেখিয়ে দেব আজও আমরা প্রেম করতে জানি।

তুমি তো তরুণ।

মধ্যবয়সী তরুণ। আর তুমি আজীবন তরুণী। লেটস গো!

মাটি এলে আজকাল জনের ছুটি। ওরা ট্যাক্সি নিয়ে বেরোয়। মাটির স্পোর্টস্ কার-এ শচীন উঠে বসতে পারবে না। ট্যাক্সী দাঁড়াল ১৭শ শতাব্দীর 'কিং চার্লস্ দ্য মার্টার' চার্চের কাছে। শচীনের বগলে হাত দিয়ে ওরা রাস্তা পার হল। পাথর-পাতা ছোট্ট গলি দিয়ে ঢুকলে সিঁড়ি বাইতে হয় না বেশি। অ্যান্টি-কস-এর দোকান। পুরানো বইয়ের দোকান—অন্যপাশে বুটস আর ওয়াইন বার। প্যান্টাইলয়ের ফ্যাশনেবল দোকানে জিনিসের আগুনের মতো দাম।

হবেই বা না কেন? ইতিহাসে বলে ৬০৬ সালে এক ব্যারণ গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে পথ খুঁজতে খুঁজতে এই ঝরণা খুঁজে পেয়েছিল। এই ঝরণার জলে নাকি অশেষ গুণ। রাজারানীর দরবারে ঝরণার গুণগান ছড়িয়ে পড়ল। অতিরিক্ত বিলাসের অত্যাচারে বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে ওরা তাঁবু ফেলতে লাগল টানব্রিজ ওয়েলস্-এর ঝরণার আশে-পাশে। রাস্তা তৈরি হতে লাগল, ঘোড়ার ক্ষুরে রাস্তা ডগমগ করে উঠল। নাম হয়ে গেল রয়েল টানব্রিজ ওয়েলস্। রাজারানীরা তো কখনো একা আসে না, সঙ্গে থাকে সাঙ্গ-পাঙ্গ। সেই সাঙ্গ-পাঙ্গর সঙ্গ লোভে আরো কিছু লোকজন আসে। শহর গড়ে উঠতে লাগল, প্যানটাইলসকে ঘিরে জঙ্গল পরিষ্কার করে। অন্য দেশ লুটেপুটে খাওয়া সাহেবরা উনবিংশ শতাব্দীতে কলোনীয়াল স্টাইলে প্যানটাইলস কমপ্লেক্স গড়ে তুলল।

সেই ঝরণা এখন সিমেণ্টে বাঁধা, কাঁচ দিয়ে ঢাকা। কষ্ট করে ঝুঁকে দেখলে জলের ইশারা দেখা যায়। কাগজের কাপে জল বিক্রি হয়। বোকা টুরিস্টরা কিনে খায়। ট্রানব্রিজ ওয়েলসবাসীরা ফিরেও তাকায় না। মাটি ঝরণার জল দেখতে না পেয়ে বলল, চল ডিউক অফ ইয়র্কে যাওয়া যাক।

না, ও পাবটায় ড্রাগ-অ্যডিক্টদের আড্ডা। প্রায়ই পুলিশের হামলা হয়। এককালে ভাল পাব ছিল, এখন নোংরা বিচ্ছিরি হয়ে গেছে।

তবে কোথায় যাবে ?

ঐ যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেণ্ট দেখছ ওর নিচে একটা ভাল পাব আছে।

ওরা পাবে ঢুকতেই এক থুত্থুরো বুড়ো ইংরেজ বলে উঠল, গুড ইভিনিং মিঃ ব্রাট, কলকাতা কেমন চলছে ?

ইভিনিং কর্নেল। আমি তো বছর খানেক আগে গিয়েছিলাম। ময়দান, রাস্তাঘাট খুঁড়ে খুঁড়ে একসা, টিউব রেলওয়ে তৈরি হচ্ছে।

পার্ক স্ট্রিটে ? ফারপো ?

শচীনের সঙ্গে যখনই যতবার দেখা হোক কর্নেল প্রায় একই প্রশ্ন করে। বৃদ্ধের সঙ্গে তরুণী বলে উঠল, ডারলিং তুমি কলকাতার গল্প পেলে আর কিছু চাও না। ওদের একটু বিশ্রাম করতে দাও তো !

অত্যন্ত দুঃখিত। বৃদ্ধ কাঁচুমাচু হয়ে বলে উঠল।

ইউ আর ওয়েলকাম। শচীন হেসে বলল।

মার্গারিটাকে এক ঝলক দেখে নিয়ে তরুণী অন্য দিকে সরিয়ে নিল বৃদ্ধকে। মেয়েরা যেমন মেয়েদের এক ঝলকে আত্মপান্ত দেখে বুঝে নেয়।

মাটির ভুরু কুঁচকে উঠল। সে অন্য কোণায় শচীনকে নিয়ে বসল। মাটি বার কাউণ্টারে গিয়ে দুটো মল্ট হুইস্কি নিয়ে এল।

শচীন বলল, চিয়ার্স। কর্নেল কলকাতা ভুলতে পারে না। ওর নূতন স্ত্রী ওসব পছন্দ করে না।

স্ত্রী? আমি তো ভেবেছিলাম ওর নাতনী বুঝি!

টানব্রিজ ওয়েলস-এ থাক, এ হল ইংরেজ জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়। অ্যারিটোক্র্যাট আর হিপি, প্রাসাদ আর বস্তি সব পাবে এখানে।

তুমি অনেক লোককে চেন বুঝি?

'হ্যালো' বলার মত চিনি। নূতন করে বন্ধু খোঁজবার কোনো আর সখ নেই।

তুমি ইংরেজদের মতো 'কিপ মাইসেলফ টু মাইসেলফ' হয়ে গেছ।

তা হবে। এক যুগ আছি এদেশে, ওদের বদগুণগুলো সব নিয়ে নিয়েছি। ভালগুণ না-নিলেও।

চুপচাপ।

কথা বল মাটি। এত ভেব না।

জান, আমি 'ভাবনার' কথাই ভাবছিলাম। মাটি হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে খেলতে খেলতে বলল, মাঝে কয়েকবছর আমি ননস্টপ কথা বলে যেতাম। কথা শোনাবার শিকার খুঁজে বেড়াতাম। পালাতে দিতাম না। খাওয়া-দাওয়া, ড্রিঙ্ক করার ঘুষ দিয়ে শিকারদের ধরে রাখতাম। কখনও যদি একা হয়ে যেতাম ঘরে ট্রানজিস্টার টিভি, রেকর্ডপ্লেয়ার চালিয়ে দিতাম। যেন নিজের কথা নিজে শুনতে না পাই। যখন আঁকতাম তখনও ট্রানজিস্টার চলত স্টুডিওতে। বুঝতেই পারছ কিরকম পেন্টিং হত।

থামলে কি করে?

একদিন ঝড়ে ইলেকট্রিসিটি কেটে গেল ঘণ্টা চারেকের জন্য। ঐ বিরাট বাড়িতে আমি একা। রিচার্ড ফেরে নি। আমি দৌড়ে বাগানে গেলাম। সে কি ঝড়, বুকেও সেই ঝড়ের রেশ অনুভব করলাম। মনে হচ্ছিল গাছগুলো যেন আমার মাথার উপর ভেঙে

পড়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে। ভয়ে ফিরে এলাম অন্ধকারে, বাড়িতে। বন্ধ করে দিলাম ট্রানজিস্টার। বাইরে ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ। বাজ পড়ার শব্দ। ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হল। কখন থেমেছে জানি না। আলো জ্বলে উঠল, টি ভি চলতে লাগল, গান শুরু হল রেকর্ডপ্লেয়ারে। ছুটে সব বন্ধ করে দিলাম, নিবিয়ে দিলাম আলো। চুপ করে কালো আয়নায় নিজের ভূতাকে দেখতে পেলাম, গানে সঙ্গীত ছিল না, কথায় অর্থ ছিল না এতদিন, আমি কেবল শব্দ দিয়ে নিজের বুকের ঝড়কে আড়াল করে রেখেছিলাম।

ঝড় ভাঙে, তোলপাড় করে, আবার নতুন করে গড়তে হয়, এক এক করে, কিন্তু অন্যরকম করে। আমি জানি মাটি, সেই গাড়ির অ্যাকসিডেণ্ট ঝড়ের মতো আমার জীবনে এসেছে। অ্যাকসিডেণ্ট না হলে, অন্য কিছু দুর্ঘটনা ঘটত। বড় তরতর করে বড় হয়ে গিয়েছিলাম, দরকার ছিল পড়ে যাওয়ার।

তুমি ভগবানকে ক্ষমা করতে পেরেছ ?

শচীন হুইস্কির গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললে, প্রশ্নটা ঠিক হত যদি বলতে, আমি কি নিজেকে ক্ষমা করতে পেরেছি ? যাও, আর একটা হুইস্কি নিয়ে এস। অর্থাৎ 'আমার' আলোচনা থাক।

মাটি ফিরে এসে টেবিলে গ্লাস রেখে বলল, চল, এটা খেয়ে ওঠা যাক। লণ্ডনে ফিরতে হবে।

এখানে কোনো হোটেলে থেকে গেলে পারতে। রাত হয়ে যাবে ফিরতে।

না। ফিরতেই হবে। খুব সকালে একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

পাবে ভিড় জমে উঠেছে। সাহেবদের পেটে অ্যালকোহল পড়লেই কথা আর হাসি বেরোয়। কে বলবে এরা মুখ গোমরা করে বসে থাকে। শুধু দু'একজন একা একা পান করেই চলেছে মাথা নিচু করে। একজন ঘন ঘন মাটিকে চোখের কোনা দিয়ে

দেখছে। মাটি মনে মনে হাসল। বেচারা একা!

মাটি শচীনের হাত হাতে নিয়ে বললে, জান একটা মাস আমার খুব ভাল কাটল। পুরানো জীবনের ভস্ম থেকে তোমাকে ফিরে পাওয়া আমার খুব দরকার ছিল।

শচীন হাত সরিয়ে নিল না। মাটি শচীনের হাত নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, আমার পুরুষ মানুষদের সঙ্গ-সম্পর্ক অনেকটা দুধের মতো। দুদিন পরেই নষ্ট হয়ে যায়। সিংকে ঢেলে ফেলে দিতে হয়। বোতল সাবান দিয়ে ধুলে পরিষ্কার হয়। মনে নষ্ট গন্ধ থেকে যায়। একমাত্র তুমিই আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে।

সিংকে ঢালি নি। ছুঁড়ে ফেলার ব্যথা এখন গেছে তো?

হ্যাঁ, সাচী। মাটি নির্লজ্জের মতো শচীনের হাতে চুমু খেয়ে বলল, তুমি আমার সান্ত্বনা। আমার আদি প্রেম।

এত ভিড় হাসি গল্পের মধ্যে ওরা দুজনে এক হয়ে ডুবে গেল নিজেদের মধ্যে। দুজনের ঠোঁটে দুই রকমের ব্যথার অল্প হাসি। ওরা দুজনে দুজনের হাসি দেখতে পেল না। কালো আয়নায় ঠোঁট কেঁপে উঠল।

মাটি চিঠি লিখেছে ওর ফিরতে দেরি হবে। অ্যালেকসীকে দেখাশোনা করতে হচ্ছে, নিয়মিত অ্যানালিস্টের কাছে যাচ্ছে। আশা করি সাচী ভাল আছে। চিরকালের ভালবাসা জানিয়েছে মাটি। পুঃ শরীরের যত্ন নিও। শচীন চিঠিটা ভাঁজ করে বুক-পকেটে রেখে বলল, মাটি, আর যত্নের আমার দরকার নেই। শেষ হয়ে এসেছে চাওয়া আর পাওয়া। মাটি! মাটি!

দীনেন আর ডরিস দীপক মলির বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে ঘরে ঢুকে দেখল ঘর অন্ধকার, দীনেনের বুক ধক্ করে উঠল। সে

আলো জ্বালাতেই কাঁচের দরজার ওপারে হুমড়ি খাওয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে একটু নিচে নেমে গেল। দীনেন দেখল শচীনের মাথা টেবিলে গড়িয়ে পড়ে আছে।

কোথায় গেল হুইস্কির নেশা। অ্যাম্বুলেন্স ডাক। হাসপাতাল, ইনটেনসিভ ক্যার ইউনিট। ম্যাসিভ হ্যেমরেজ।

মাটি লণ্ডনে ফিরে ফোন করে করে ক্লান্ত হয়ে মণীন্দ্রকে ডেকে বসল। শুনতে পেল সাচী হাসপাতালে আছে। মাটি ছুটল হাসপাতালে।

জেরিয়াট্রিক ওয়ার্ড। বৃদ্ধ রুগী। শূন্য চোখে মৃত্যুর অপেক্ষা করে বৃদ্ধরা হতভম্ব হয়ে বসে আছে। কেউ বা বিড় বিড় করে বকে চলেছে। টম, ডিক, হ্যারির পাশাপাশি শচীন বসে আছে, শুকনো মুখে, শূন্য চোখে, দুহাত চেয়ারে লাগানো টেবিলের ওপর রেখে। ক্যাথেটর বেয়ে পেচ্ছাবের প্লাস্টিক ব্যাগ চেয়ারের পাশে অল্প অল্প দুলছে। এক ফুচকে চটপটে নার্স মাটিকে নিয়ে এসে বলল, শাচীন, দেয়ার ইজ এ লাভলি লেডি টু সি ইউ—চিয়ার আপ!

মাটির মুখ লাল হয়ে গেল রাগে, ব্যথায়। সে সাচীর গালে চুমু খেয়ে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, তুমি এখানে কেন? তোমাকে নার্সিংহোমে রাখে নি কেন? সাচী, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

শচীন অল্প একটু মাথা নাড়ল। ওর শূন্য চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। মাটি ওর দুহাত দিয়ে শচীনের হাত ধরতে গিয়ে বলল, শোন আমার কথা সাচী। আমি—

শচীন হাত টেনে নিল।

মাটি আহত হতবাক হয়ে টেবিলে হাত ফেলে রেখে বললে, কেন? সাচী কেন তুমি হাত সরিয়ে নিলে? মাটি আবার বলল, আমি বলছিলাম, আমি নার্সিংহোমের ব্যবস্থা করব। তুমি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বল।

শচীন একদৃষ্টিতে মাটিকে দেখতে লাগল। মাথা নাড়ল না। মাটি মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ বসে রইল। মাথা তুলে দেখতে পেল শচীনের বৃদ্ধ ক্লান্ত বোবা চোখে জল ভাসছে, মাটি উঠে শচীনকে জড়িয়ে ধরতে যাবে, মণীন্দ্র পিছন থেকে হাসিমুখে বলল, কি, ভাল আছ তো মার্গারিটা!

হুঁ।

বস তুমি।

না, আমার যাবার সময় হয়েছে। তুমি বস। মাটি ভারি গলায় বলল, তারপর শচীনের ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলল, আমি আসব সাচী।

মাটি মেঝেয় চোখ রেখে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। গাড়িতে বসে দুহাতে স্টিয়ারিং ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। সাচী কেন হাত সরিয়ে নিল? কেন? সাচীর চোখে কি সে কান্নার জল দেখেছে না সেনিলিটির জল? পরের দিন সকালে মাটি হাসপাতালে ফোন করে জানতে পারল সাচী গত রাত্রে মারা গেছে। 'পিসফুলি' নার্স ওকে জানাল।

মাটি ফুলের তোড়া নিয়ে গিয়েছিল ক্রিমেটরিয়ম-এ। প্রচুর লোক, প্রচুর ফুল। মাটি এক কোণায় দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ দেখল। ফিরে এল নিজের ফ্ল্যাটে ফুলের তোড়া নিয়ে। সাচীকে দেয়া ফুল মাটির ঘরেই সাজানো থাক। যতদিন থাকে। ঝরা পাতায় মাটির বুক ভরে যাবে। কেন সাচী হাত সরিয়ে নিয়েছিল, মাটি এ প্রশ্নের উত্তর আর কোনদিনও পাবে না।

চার

চল, তিন সপ্তাহের জন্য দেশে ঘুরে আসি। রায় যাচ্ছে ওর বোনের বিয়েতে।

না।

কেন? মনটা ভাল লাগবে। সারা সামার তপুর জন্য মন খারাপ করে থাকবে?

মলি মুখ ফিরিয়ে বলল, কে মন খারাপ করছে! ছেলে মেয়ে বড় হয়েছে, উড়তে শিখেছে, এতো সুখের কথা। মলি ভারি গলায় বলল। মলি বড় আশা করেছিল, তপু এলে ওরা গ্রীক আইল্যাণ্ড বেড়াতে যাবে। লুকিয়ে বুক করে বসেছিল। ভেবেছিল তপু এলে অবাক করে দেবে, তপুকে আর দীপককে, আর সেই তপু ওকে ছেড়ে নিজের মনে বান্ধবী নিয়ে চলে গেল।

সবাই ছেড়ে চলে যায়—সেই বাতিল-হওয়া ব্যথায় মলি চিরকাল ভুগে এসেছে। মা মরে গেল বর্মা থেকে হাঁটার পথে, তখন মলির বয়সই বা কত।

মার মরে যাওয়া বোঝে নি। কেবল মনে হয়েছে মা ছেড়ে চলে গেছে। মা মলিকে আর ভালবাসে না। মলি কি দোষ করেছিল যে মা মরে যাবে? আমাদের মা-রা তো মরে যায় না। কোথায় থাকবে এর পরে? মামার বাড়িতে বসবাস। বাবা চলে গেল শ্রীরামপুরে ডাক্তারির চাকরি নিয়ে। বিয়ে করে বসল হুম করে। বাবাও ছেড়ে চলে গেল মলিকে। তনি চলে গেল, তপু চলে গেল। কোনদিন হয়তো দীপকও চলে যাবে।

কি এত ভাবছ? দীপক বলল, তোমার একা যেতে ইচ্ছে করছে, যাও না কেন?

একা যাবার কথা উঠল কখন। বলছি তো একসঙ্গে চল।

এই গরমে! লোড-শেডিং—মানুষের মাথায় মাথা রাখা ভিড়, নোংরা আর চারদিকে খালি গরিব লোক। ছিনতাই, রাস্তায় একা হাঁটাচলা করার উপায় নেই। গেলে আরো মন খারাপ লাগে। তুমি যাও।

তোমার বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করে না? মামাদের?

বাবা কাজে ব্যস্ত, নতুন সংসার নিয়ে ব্যস্ত। আর মামা

বাড়ি তো ভূতের বাড়ি হয়েছে।

আমার মা তো তোমাকে দেখতে চায়।

তোমার মা আমাকে মেমসাহেব বলে নাক সিঁটকোয়। তোমাকে, নাতি, নাতনীকে দেখতে চায়।

মেমসাহেব বলে। নাক সিঁটকোয় না। তোমাকে একটু ভয় পায়, এই যা। দীপক হালকাভাবে বলল।

না, আমি যাব না। দেশ দেশ করে পাগল হয়ে যাও, কি আছে তোমার দেশে ?

বাড়ি আছে। মা, ভাই বোন আছে।

টাকা পাঠাও, ওতেই ওরা খুশি। মনে আছে একবার তুমি দেশে ফিরে যাবে তোড়জোর করছিলে, তোমার মা লিখল বিদেশেই তুমি ভাল আছ।

সে মা ভাবে, দেশে ফিরে আমাদের কষ্ট হবে তাই।

কষ্ট হবে কিনা জানি না, দেশে চাকরি বা প্র্যাকটিস কম করলে বাড়িতে টাকা দিতে পারবে না, সেই ওদের ভাবনা।

টাকা না থাকলে ভাবনারই তো কথা। টাকা রোজগারের জন্যই তো আমরা এদেশে পড়ে আছি। ভাইবোনদের যে মানুষ করতে পারছি এটা কি কম সৌভাগ্য আমার।

তুমি তোমার সৌভাগ্য নিয়ে থাক।

তুমি কোনদিনও দেশে ফিরবে না ? এ দেশে বুড়োবুড়িদের যে কি অবস্থা হয় দেখেছ তো !

দেশে থাকলেই বা আজকাল কে কার জন্য করে ? যেই টাকা দেওয়া বন্ধ করবে, ভাইবোনদের ঘন ঘন চিঠি দেয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। দেশের লোকদের আমার জানা আছে।

মানুষের ওপর তোমার এতটুকু বিশ্বাস নেই মলি !

মলির চোখ জলে ভরে উঠল। টি-ভির ছবি ঝাপসা হয়ে গেল। দীপক দেখতে পেল না।

মলি ঢোক গিলে একটু পরে বলল, ছেলেমেয়েকে ছেড়ে দেশে যাবার কথা ভাব কি করে?

ছেলেমেয়েকে ছেড়ে যাবার কথা তো ভাবছি না। ওরাই আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে কোথায় ওরা চলে যাবে তার ঠিক-ঠিকানা আছে।

হুঁ।

দেশে থাকলে হয়তো অন্যরকম হত, অথবা হত না। মেয়ের বিয়ে হত হয়তো আমেরিকায়, ছেলে হয়তো চলে যেত অস্ট্রেলিয়ায় অথবা মধ্য এশিয়ায়। এ তো দেশে গিয়েও আকছার দেখছি।

হুঁ।

কোথায় তবে যাবে বল।

আজকে টি-ভি না দেখে এত গল্প করছ আমার সঙ্গে। অন্য দিন তো হুঁ-হাঁ ছাড়া কোন উত্তর পাই না।

তাই তুমি পাল্টা হুঁ হুঁ করে চলেছ।

মলি হেসে ফেলল।

যাক এতদিন পরে একটু হাসি দেখলাম।

কাল তোমার হাসপাতালে কাজ না?

হ্যাঁ। কই, এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?

আমার কোথাও এবছর যেতে ইচ্ছে করছে না। ছুটি জমিয়ে ডিসেম্বরে দেশে চল। দক্ষিণ ভারতে কোনদিন যাই নি আমি।

তনি যে তখন বাড়ি ফিরে আসবে।

তনি চলে যাবার সময়ে কি তোমার কথা ভেবেছিল? মেয়েকে একমাস ছেড়ে যেতে পারবে না?

বেশ। দীপক একটু পরে বলল, তাই হবে। তনি দানেন না হয় রায়দের কাছে থাকবে।

না, ডরিসের ওখানে থাকতে হবে না। মামাকে এনে রাখার দরকার কি ছিল, যদি ভদ্রলোক নিজের মতো না থাকতে পারে!

অন্য বাড়িতে কি কখনো নিজের মতো করে থাকা যায়!

দিয়েছে হাসপাতালে! কেন নার্সিংহোমে রাখতে পারে না! ভাগের টাকায় কম পড়ে যাবে!

নার্সিংহোমে তো ইনটেনসিভ ক্যারের ইউনিট নেই।

এখন তো আর ইনটেনসিভ ক্যারের দরকার নেই ভদ্রলোকের। এত কষ্ট করে এত টাকা রোজগার করেছে ভদ্রলোক কি জেনারেল হাসপাতালের ওয়ার্ডে মারা যাবার জন্য।

যাক গে, অন্যদের সমালোচনা না করাই ভাল। কি অবস্থায় কি করেছে আমরা তো সব জানি না। আমাদের দরকারই বা কি। তুমি আসলে রাগ করেছ ডরিস কাটা-কাটা কথা বলে বলে।

ওরা দুজনেই ফ্রাসটেটেড। সারাক্ষণ মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে। কি চেয়েছিল জীবনে ওরা কে জানে!

দীনেন কিন্তু এককালে কেমব্রিজের স্কলার ছিল। ডরিস ছিল ছোট মামার অ্যাপ্যা, মামা ডরিসের প্রেমে পড়ে গেল, মামিমা দীনেনকে ভিড়িয়ে দিল ডরিসের সঙ্গে।

কোন্ মামা? তুমি এত জানলে কি করে?

ডাক্তার মামা। শচীন বরাট তো দীনেনকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল ডরিসকে বিয়ে করার জন্য।

কেন?

দীনেন দেশে ফিরবে না। বিদেশী বিয়ে করে বসল। অথচ নিজেই এদেশে থেকে গেছেন। বিদেশীও বিয়ে করেছিলেন।

নিজে করা এক কথা, আর অন্যকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা আরেক কথা।

তপু যদি ঐ মেয়েটাকে বিয়ে করে বসে?

সবে তপু বান্ধবীতে মন দিয়েছে। হোঁচট খাক কিছুক্ষণ, তারপরে তো বিয়ের কথা।

ফোন বেজে উঠল। স্পিকিং।···আরে কি খবর? হ্যাঁ—না,

মলি রাজি হচ্ছে না দেশের গরমে যেতে। হুঁ…আসব একদিন। তোমরা আস না কেন? দেশে যাবার আগে? আচ্ছা। ছেড়ে দিচ্ছি। গুড নাইট।

তোমাকে ছাড়া রায়-এর চলে না। মলি মন্তব্য করল ফোনে কথা শেষ হলে।

বিদেশে বন্ধু পাওয়া বড় মুশকিল।

কিছু কাজের কথা—অর্থাৎ হাসপাতালের গল্প, কিছু রাজনীতি।

ব্যক্তিগত কথা বল না?

না।

তবে আবার কিরকম বন্ধু!

দীপক হাসল। উত্তর দিল না। ও অনেকদিন ভেবেছে রায়কে বলবে ওর বুকের ব্যথার কথা। রায়ের অফিস আর হাসপাতাল নিউরটিক রুগীতে ভরা। সে যদি দীপককে ভেবে বসে আরেক 'নিউরটিক'! আর যদি বলেও রায়কে! সে কি করবে? ওষুধ দেবে, যাতে ভাব আর ভাবনার ধার কমে গিয়ে ভোঁতা হয়ে যায়, কিন্তু ওষুধ তো মনের জট খুলতে পারে না। সাইকিয়াট্রিস্টরা নিজেরাই তো বলে।

কি এত ছাইভস্ম ভাবছ? মলি বলল।

না, দীপক তাড়াতাড়ি বলল, মার্লিন ব্রেণ্ডোকে দেখছিলাম। ওদের মতো মিথ্যা দিয়ে কি সকলের জীবনই ভরা? দীপক মনে মনে জিজ্ঞেস করল।

আমার ওয়েস্টার্ন দেখতে ভাল লাগে না। আমি শুতে যাচ্ছি। তুমি আলো-টালো নিবিয়ে এস।

ইচ্ছে করল মলিকে বলে এক কাপ চা এনে দিতে। কিন্তু ভাবল থাক।

সে মনে মনে ভাবতে লাগল, দেশ যদি ওরা না ছাড়ত তবে জীবন হয়তো এত জটিল হত না। সে গরিব ঘরের ছেলে, অনেক

কষ্ট করে ডাক্তারী পাস করেছে, বিয়ে করল বড়লোক মামারবাড়ির মলিকে। সে বেচারা কেন শ্যামবাজারে থাকতে পারবে। যেখানে জানলা খুললেই অন্য বাড়ির জানলার সঙ্গে গুঁতোগুঁতি লাগে। মা-বাবা ভাইবোন বিধবা পিসি আরো কত সবাই ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত খেটে বাজার-খরচা ওঠে, কিন্তু ভাইবোনদের মানুষ করবে কোথা থেকে! পুজো-পার্বণ, শ্রাদ্ধ, বিয়ে, মুখে-ভাত তো লেগেই আছে। 'লোকে বলবে কি' সমাজের আচার মেনে না চললে।

কলকাতার আড্ডা ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় ছুটল সে মলিকে নিয়ে। রোজগার অনেক, কিন্তু মন টিঁকল না। তপু আর তনি জন্মাবার পর ফিরে এল দেশে। ছেড়ে-যাওয়া চেম্বারে বসল আবার, মূলধনে কতদিন চলবে! মোটা টাকা পেতে পেতে বাড়ির লোকরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ভাই খড়গপুরে পড়ছে, এক বোনের ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছে, আরেক ভাই বরানগরে পড়বে মন ঠিক করেছে, ছোট বোন ব্রেবোর্নে যায়। অসম্ভব। মলি মিথ্যা কথা বলে নি। দু দিন পরেই দাদাকে পাওয়ার খুশি উবে গিয়ে মুখ চুন করে গাঁইগুঁই করে সবাই ঘুরে বেড়াতে লাগল। তপু, তনি, মলি তিনজনেই অসুখে ভুগছে। চল ইংলণ্ডে। বড্ড দেরি করে এসেছে ওরা ইংলণ্ডে। এরা আর কালো ডাক্তার চায় না। দীপকের আত্মবিশ্বাস যেন শেষ হয়ে গেছে। দেশের হেরে-যাওয়া মানুষ এসেছে কেবল টাকা রোজগারের জন্য। যে কোনো চাকরি। এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে। ক্যাসুয়েলটিতে ইংরেজরা কাজ করতে চায় না। তাই কর। হাউস সার্জেন। হাউস অফিসার। মুখ ছোট করে কাজ করে যাও। নিজের ওপর অনাস্থা নিয়ে মুখ চুন করে থাকলে অন্য মানুষের ইচ্ছে করে পদদলন করতে। তার ওপরে ভারতীয় গরিব কালো, বাংলা উচ্চারণে ইংরেজি বলে, ককনী ইংরেজি বুঝতে পারে না, না পারে সবসময় বোঝাতে। ইংরেজদের

ওপর রাগে, (শালা ভুইফোঁড় ইম্পেরিয়ালিস্ট !) নিজের জন্য দুঃখে সে প্রথম দিকে প্রায় দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। সব ভারতীয় ডাক্তাররা একজোট হয়ে ইংরেজদের শ্রাদ্ধ করে জোট পাকানোর শান্তি পেত কিছুক্ষণ। বাড়িতে ওর একমাত্র শান্তি ছিল ফুটফুটে তনি। একদিন মলি ওকে টেনে তুলেছিল নিজেকে ধিক্কার দেওয়া বিষাদ থেকে।

কি হয়েছে বলবে আমাকে ?

কি আবার হবে ? কিছু না।

মিছে কথা বল না। ইংরেজদের তুমি দু'চক্ষে দেখতে পার না। আমি জানি। তোমাদের কথা শুনে বুঝি।

ওরা নিচু চোখে দেখে আমাদের।

ওরা কারা ? ওয়ার্ড সিস্টার ? কনসালটান্টরা ? ইংরেজ কলিগরা ?

মলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছে। দীপককে পালাতে দেয় নি কোনো অজুহাতে। মলি বেডসাইড ল্যাম্প জ্বালিয়ে উঠে বসে বলেছে, আমি চা করে আনছি।

দুজনে উঠে বসে চুপচাপ কিছুক্ষণ চা খেয়েছে। মলি বলতে শুরু করেছে, দীপক। ও সহজে স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। সে আবার বলল, দীপক আমি তোমাকে বলছি তুমি কোনো অংশে কারুর চেয়ে ছোট নও। বিয়ের আগে মাসির সঙ্গে লণ্ডনে থেকে আমার চোখ খুলেছে। যখন ছিলাম ওর সঙ্গে, তখন খোলে নি। পরে খুলেছে।

আমি তোমাকে কোনোদিনও বলিনি মাসি আমার আর মেসোর সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করত। আমরা চোরের মতো মুখ করে দুজনে দুকোণা খুঁজতাম। যত লুকোবার চেষ্টা করতাম মুখেবুজে, তত বেশি আমাদের ওপর অত্যাচার চলত। আমি তো দূরের কথা, মেসো কোনোদিন মুখ ফুটে বলতে পারেন নি, থামো ! যথেষ্ট হয়েছে।

আমি এটাই শিখেছি, যত মার খাবে, লোকের ইচ্ছে করবে তত বেশি মার দিতে তোমাকে। দুর্বল লোকেরা, মুখ গোমড়া করে মনে মনে গজ গজ করে, নয়তো অকারণে রেগেমেগে চেঁচামেচি করে তার চেয়েও যারা দুর্বল তাদের ওপরে। তুমি দুটোই কর, মুখ গোমড়া করে থাক, আর জুনিয়র নার্স, জুনিয়র ডাক্তারদের ওপরে ঝাল ঝাড়। মলি আরো বলেছে, আমি তো দেখি তোমাদের হাসপাতালে। তুমি এমন গম্ভীর মুখ করে থাক মনে হয় হাসলে বুঝি তোমার চোয়াল ভেঙে যাবে। শাদা কুর্তা আর ব্যাজ পরে চলাফেরা কর এত হন্তদন্ত হয়ে যেন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, তোমাকে দৌড়ে লাফিয়ে ধরতে হবে ট্রেন।

দীপক নিজের বর্ণনা শুনে হেসে ফেলল একটু। বলল, বোধহয় ভয়ে, কেউ যদি আমাকে ডাক্তার হিসেবে সম্মান না দেয়।

তুমি তো মানুষ আগে, তারপরে ডাক্তার। আর তুমি তো জান তুমি ভাল ডাক্তার।

মলি আর এক কাপ চা নিয়ে, চায়ে চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, কেন তুমি দুর্বল হবে দীপক। তুমি নিজের চেষ্টায় ডাক্তারি পাস করেছ। অস্ট্রেলিয়ায় চাকরি করে এসেছ। কেন তুমি নিজেকে ছোট ভাববে ?

দীপক খাপছাড়াভাবে বলে উঠল, বাবার মুখে চিরকাল মাকে বলতে শুনেছি, ঐ ছেলেকে দুধ খাইয়ে কি হবে। ওর মাথা গোবরে ভরা। ওর ভরসায় থাকলে গোটা সংসার ডুববে। দীপক চায়ের কাপে চোখ রেখে বলল, আমি যেদিন বাড়িতে এসে বললাম বাবাকে প্রণাম করে, বাবা আমি ডাক্তার হয়েছি। বাবা গম্ভীর মুখে উত্তর দিয়েছিল, যা টাকা রোজগার হবে তাতে তোমার নিজের চলবে তো ?

আর তোমার মা ? মলি খানিকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করল।

মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু বলেছিল, এবার

ভাইবোনেদের দায়িত্ব কিন্তু তোমার। মাসের টাকা রোজগার করে সব বাবার হাতে তুলে দিও।

দিতে তুমি ?

প্রথম বছর দিয়েছিলাম। দীপক কি যেন মনে করে হেসে ফেলল, পকেট খরচা চাইতে সে মহা ঝামেলা বাধত। ভদ্রলোক মহা কঞ্জুস। সরকারী অফিসের কেরানী আর কাকে বলে!

মলি জীবনে এই প্রথম শুনল দীপকের বাবা-মার বিরুদ্ধে কথা। সেই প্রথম, সেই শেষ!

মলি পরে পরে অনুযোগ করেছে, মা বাবাকে বেদির ওপর রেখে পুজো কর কেন ?

দীপক বলেছে, ওরা আমাকে জন্ম দিয়েছে।

তুমি কি তাদের হাতে-পায়ে ধরেছিলে তোমাকে জন্ম দেবার জন্যে ?

কিন্তু সে তো পরের কথা।

মলি সেদিন সেখানেই থামতে দেয় নি দীপককে। তোমার মাথায় যে গোবর ভরা নেই সে তো তুমি প্রমাণ করেইছ।

প্রমাণ করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি ময়লা।

নিজের কাছে, কি নিজেকে প্রমাণ করেছ ? যেদিন করবে সেদিন বলবে, আমার ছুটি।

ইংরেজিটা যদি ভাল করে বুঝতে, বলতে পারতাম।

চেষ্টা করলেই পারবে।

তোমার পক্ষে বলা সহজ, তুমি ইংরেজি স্কুলে পড়ে এসেছ চিরকাল।

আমি যে ভাল বাংলা জানি না। সেটা কি ? তুমি আমাকে বাংলা শেখাও আমি তোমাকে ইংরেজি শেখাব। আর কাল থেকে তুমি হাসপাতালে যাবে মাথা উঁচু করে, চোখে চোখ রেখে হেসে, গুড মর্নিং বলবে স্পষ্ট গলায়। কি ঠিক তো!

এই আমার প্রথম লেসন বুঝি! দীপক হেসে বলেছিল।

এ পোড়া দেশে শীতকালে ভোর হয় না, তাই বোধহয় রাত বারোটার পর থেকে ওরা গলার জোরে সকাল ঘোষণা করে। ওরা অনেকক্ষণ ধরে ভালবাসল। সুখের ক্লান্তিতে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে ছুটতে হল হাসপাতালে। মলি ছেলে মেয়েকে তৈরি করে ছুটল স্কুলে পৌঁছে দিতে। তারপর, আবার ছোটা অকিউপেসনল খেরাপির ক্লাসে যাবার জন্য। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পা যেন মাটিতে পড়ে না। খালি ছোটা।

আবার কবে যেন মলি দীপক আস্তে আস্তে নিজেদের অজান্তেই দূরে সরে গেছে। মলি আর আজকাল ভুলেও বলে না, মিছে কথা বলো না। কি হয়েছে বলো! বলে না কখনও, তুমি কারুর চেয়ে কোনো অংশে ছোট নও। ও নিজেই কি কখনও মলিকে বলে, কি সুন্দর তুমি দেখতে! বা চমৎকার হয়েছে রান্নাটা। কখনও কি বলে, তোমার সাহায্য ছাড়া আমি বিষাদের আত্মদুঃখ থেকে কোনোদিন মাথা তুলে ইংরেজদের মুখোমুখি হতে পারতাম না!

ওরা কথা বলার ভান করে, কথা আর বলে না।

পাঁচ

রাণা রায় বেঁটেখাটো ছিপছিপে মানুষ। পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি। চাপা আবেগে, বুদ্ধিতে ওর সন্দিগ্ধ কালো চোখ ঝকঝক করে। ওর মা মাদ্রাজের মহিলা, বাবা বাঙালী। ও তামিল বলতে পারে না, কিন্তু ওর বাংলা আর ইংরেজি অ্যাকসেণ্টে, বিশেষ করে ইংরেজিতে তামিলনাড়ুর স্পষ্ট ছাপ। ওর মার মতো করে কথা বলে। মা বাঙালী মেয়ের মতো সিঁদুর পরে, শাড়ি পরে, রান্না করে, দোসা করে। যখন বাবা বাড়িতে থাকে না, ছেলে মেয়েদের পিটোয় প্রাণ ভরে, বিশেষ করে রাণাকে, আর শাসায় বাবা আসুক বাড়িতে

তখন দেখবে মজা। এখন কি হয়েছে। পিঠের ছাল উঠবে। পড়তে বস গিয়ে। শান্তি হারমোনিয়াম নিয়ে বস, যা কালো ভূতের মতো চেহারা, জন্মে কেউ সাধ করে ঘরে তুলবে না। টাকার শ্রাদ্ধ করতে হবে।

তিন বোনে বসে সা রে গা মা পা ধা নি চর্চা করে। রাণা আর শানাই দুলে দুলে পড়ে। শানাই এক থাপ্পড় দেয় রাণাকে, আস্তে করে পড়। গাধা।

বাটা কোম্পানির কলোনিতে ছেলেমেয়েরা সন্ধেবেলা দুলে দুলে পড়ে। আগডোম বাগডোম ঘোড়ার ডিম। হারমনিয়ম বাজে। কোথাও বা ঘ্যানঘ্যানে গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে। কোথাও তাসের আড্ডা বসেছে। চিৎকার ভেসে আসছে হাওয়ায়। এর মধ্যেই শানাই আর রাণা পড়ে; দুলে দুলে পড়ে। ক্লাসে সেকেণ্ড হলে রক্ষা নেই, পিঠে চামড়া শুধু উঠবে না, থামে হাত বেঁধে লাথি চলবে। অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিল বার দুয়েক রাণা। ফার্স্ট তো ওরা দুজনে হবেই। সে জন্য নয়, পাড়ার লোকে রাণার নামে নালিশ করেছে বলে।

রাণা স্টাডিতে বসে বসে ডিপ্রেশন-এর ওপর পড়ছিল। কোন্ ওষুধে কাজ হবে। আজকাল লিথিয়ম দিতে বলছে। বইটা সরিয়ে রাণা হাত দিয়ে ল্যাম্প-শেডটা সরিয়ে মনে মনে হাসল। অদ্ভুত অসাধারণ মার চরিত্র। সে মনে মনে বলল।

মার বাবা ছিল বাটা কোম্পানির অফিসার। সে পালিয়ে এসে রাণার বাবাকে বিয়ে করেছিল। স্টোর ক্লার্ক ভদ্রলোক। মার বাবা চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিল দিল্লিতে। মা সে অভিমান কোনোদিনও ভুলতে পারে নি। রাণা শুনেছে দাদু দিদিমা রেলের ভাড়া পাঠিয়ে ওদের দিল্লিতে নিমন্ত্রণ করেছে দু-চারবার, মা টাকা নেয় নি। যায়ও নি কোনোদিনও। কি মনের জোর! রাণা ভাবল। স্টোরক্লার্ক বাবার ফরশা সুন্দর চেয়ারা দেখে মা নিশ্চয় প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

দুষ্টলোকে পরশ্রী-কাতর আত্মীয়-স্বজন গোপনে বা প্রকাশ্যে প্রশ্ন করে স্টোর ক্লার্ক হয়ে বড় ছেলে একাউন্টেন্ট, মেজ ছেলে ডাক্তার, খরচা করে গহনা দিয়ে তিন মেয়ের বিয়ে দেয় কি করে?

রাণার দশ বছরের বড় হেলথ ভিজিটর ইংরেজ স্ত্রী লুইসা একই প্রশ্ন করেছিল বিয়ের পরে। রাণার মনে আছে, ও ভীষণ রেগে গিয়েছিল। মাথা ঠাণ্ডা হলে বলেছিল, বাবা কী ভীষণ খাটত আমাদের জন্যে। বিকেলে আরেকটা চাকরি করত।

তুমি সবসময় বল গরিব ঘরে জন্ম তাই বলছি। তোমাদের পেছনে এত খরচা করে আবার বাড়িও করতে পারল টালিগঞ্জে, আমার বাবা তো আমাকে ডাক্তারি পড়াতে পারে নি।

বুড়ো বয়সে, রাণা গম্ভীর হয়ে বলেছিল, থাকবে কোথায় রিটায়ার করে? বোনরা বাপের বাড়ি আসবে না? তাছাড়া আমরা দুভাই তো ট্যুশনী করতাম।

লজিক্যাল চিন্তা বটে। কিন্তু লজিক দিয়ে কি টাকা বানানো যায়? কে জানে!

বাঁচার সংগ্রাম। রাণা ভাবল, সমাজটাই তো জোচ্চোর! ঘুষ দেয়া আর ঘুষ নেয়ায় দেশটা দাঁড়িয়ে আছে। বাবা নিশ্চয় ভাবত শ্বশুর বাড়িকে দেখিয়ে দেবে ছেলেদের মানুষ করে। 'দেখাতে হবে'—এটা ওরা জন্ম থেকেই বুঝে নিয়েছিল। এক স্কুলে যাচ্ছ ঠিক আছে, 'ছোটলোকদের' সঙ্গে মিশ না। পড়াশুনায় মন দাও। ছেলে-দুলে সন্ধ্যাবেলায় পড়া মুখস্থ কর, অঙ্ক কষ, বিদেশী ভাষা ইংরেজি শেখ। অ—অজগর, এ—এ্যানিমাল। মা বসে বসে শানাই আর রাণাকে ইংরেজি শিখিয়েছে। ইংরেজি হচ্ছে রাজভাষা, ও না শিখলে, না বলতে পারলে মাথা তুলে দাঁড়াবি কি করে?

রাজভাষা এখন আর নেই। জামাই হয়তো মাকে বোঝাতে চাইল।

বড় বড় কথা রাখ্। মা চোখ গরম করে বলত, ইংরেজি না

শিখলে বিলেতে যাবি কি করে? রাজভাষা নয়! মা শানাইকে ভেঙিয়ে বলে, আন্তর্জাতিক ভাষা।

আমি তো বিলেত যেতে চাই না। শানাই শক্ত হয়ে বলত।

তা যাবি কেন? লাঙল কাঁধে দিয়ে চাষা হবি।

শানাই যখন কলকাতায় কলেজে পড়ত, মা লাঙলের কথা বললে সে বলত, লাঙল আর নয় মা, ট্রাক্টর। পঞ্জাবের চেহারা দেখছ না!

ফাজলামি করতে হবে না হারামজাদা।

মা, তুমি এত সুন্দর বাংলা শিখলে কি করে?

মা একগাল হেসে ফেলে বলত, কেন ও-বাড়ির ঝি-চাকরদের কাছ থেকে। 'ও-বাড়ি' মানে বাপের বাড়ি।

ঝি-চাকর নিয়ে বাস করতে পার না বলে তোমার কষ্ট হয় না?

কেন, তোরা বড় হয়ে আমার জন্যে ঝি-চাকর রেখে দিবি।

দেব মা! শানাই আবেগভরে আশ্বাস দিত।

রাণা গম্ভীর হয়ে বলত, ঝি-চাকর রাখা মানে ক্যাপিটালিস্ট হয়ে যাওয়া।

রাখ্ তো তোর কম্যুনিষ্ট বুলি। শানাই ঝপাং করে বলত, টাকা করে নিই, তখন দেখাব ব্যাটা ম্যানেজার আর অফিসারদের। জোচ্চোর সব।

ওরা দু'ভাই দেখতে দেখতে বড় হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে, মেডিক্যাল কলেজে।

রাণা দু'চোখে হাত রেখে একটুক্ষণ বসে থাকল। অন্ধকার। নিস্তব্ধ চোখ বোজা অন্ধকারে কালো তারার বিন্দু ঝলকে ঝলকে সরে গেল। কোথায় দেশের নীল আকাশ, ঝকঝকে তারা, পূর্ণিমার চাঁদ। পর্দায় ঢাকা থাকে ঘর। আকাশ কি এ-দেশে আছে?

লুইসা পিছন থেকে বলল, কি, আজকেও ড্রিঙ্ক করেছ?

রাণা উত্তর দিল না। চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিল।

কি, উত্তর দিচ্ছ না যে! লুইসা কড়া গলায় বলল।

টেবিলে গ্লাস দেখছ?

তবে এ-রকম গুম মেরে বসে আছ কেন?

পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

ঘড়িতে ক'টা বাজে দেখেছ?

রাত বারোটা বেজে গেছে! তুমি ঘুমোও নি কেন?

তোমার নাম জপ করছিলাম!

তুমি অত তেড়েমেড়ে কথা বল কেন? আমাকে একটু শান্তি দাও লুইসা।

তুমি আমাকে শান্তি দাও? লুইসা একটু অনুযোগ ভরা গলায় রাণার মাথায় গাল রেখে বলল।

রাণা দু'হাতে লুইসাকে টেনে ওর কোলে বসাল। লুইসার বুকে মাথা রেখে সে ঘন নিশ্বাস নিয়ে ভাবল, প্রেম শান দেওয়া ছুরির মতো হয়ে গেছে ওদের জীবনে। কেন? কে কার বেশি রক্ত ঝরাতে পারে তার যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু এখন সে কথা থাক। লুইসা জামা-কাপড় পরে শোয় না। রাণা ড্রেসিং গাউনের ভেতরে হাত ঢুকিয়েই বুঝল ওর স্ত্রী টান-টান হয়ে গেছে, এক্ষুনি স্বামীকে ঠেলে উঠে যাবে যেন। এক মুহূর্ত। তারপরেই লুইসা মোলায়েম হয়ে গেল। রাণাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লুইসাকে নগ্ন করে ফেলল। লুইসাকে ভালবাসায় বড় সুখ, বড় কষ্টভোগের শান্তি।

চোখে সবে একটু ঘুম এসেছে, ফোন বেজে উঠল। লুইসা পাশ ফিরে সরে যেতে চাইলে, রাণা এক হাতে ওকে শক্ত করে ধরে অন্য হাতে ফোনের রিসিভর তুলে মোটা গলায় বলল, রায় বলছি।

স্যার। ভীষণ দুঃখিত বিরক্ত করার জন্য এই রাত্রে—

কি বলার বল। রাণা অধৈর্য হয়ে বলল।

জি, পি ডাঃ কোলবী ফোন করেছে। বলছে সোশ্যাল ওয়ার্কার মিসেস জোনসকে সেকশন করে হাসপাতালে পাঠাবে না। এদিকে

নাকি ভীষণ ব্যাপার। তাই—

কি ভীষণ ব্যাপার জিজ্ঞেস করেছ ?

না। ডাঃ কোলবী বলছে —

ডাঃ কোলবীকে ফোন করে জিজ্ঞাসা কর আগে ব্যাপারটা কি। না জেনে আমাকে ফোন করছ কেন ? রাণা রাগকে চাপা দিয়ে মেপে মেপে বলল, খুঁচিয়ে খবর নাও। বোঝ ব্যাপারটা ভীষণ, না ভাঁওতা। ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ানো যাবে না কি মিসেস যেন—কি নাম—তাকে। সকালে যেন ক্লিনিকে পাঠিয়ে দেয়। দরকার হলে ফোন কর আবার।

আচ্ছা স্যার। ডাঃ পরিহার বলল।

রাণা ফোন রেখে মনে মনে গালাগাল দিল। লুইসা ইতিমধ্যে সরে গিয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন।

অলস কোথাকার! ওর মোটা শরীর নিয়ে নড়তে চড়তে শুধু সময় লাগে না, মোটা মাথা নিয়ে ভেবে কাজ করতেও যেন চার গুণ সময় লাগায়। যার কোথাও কিচ্ছু হবার আশা নেই, সেই ভারতীয়রা সব সাইকিয়াত্রিতে আসছে। না বোঝে এদেশের ব্যবস্থা, না বোঝে এদেশের কালচার। বুঝতেও চায় না। কোনোরকমে দিন কাটায়।

রাণার ঘুম চলে গেছে চোখ থেকে। সে নিজে কি! সেও তো সার্জন হবে বলে এদেশে এসেছিল, কোন্ ফাঁকে কি ভাবে সাই-কিয়াত্রিতে চলে এসেছে।

কিন্তু না এলে সে আজকে কনসালট্যাণ্ট হতে পারত না। দেখিয়ে দিতে পারত না বাঙালীর ছেলে বিলেতে কনসালট্যাণ্ট হয়েছে। 'দেখিয়ে দেওয়া', রাণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লুইসাকে কাছে টেনে নিতে গেল, সে বিড় বিড় করে খাটের এক কোণায় সরে গেল। রাণাকে লুইসার আর দরকার নেই। ভালবাসার সুখ হঠাৎ যেন উবে গেল। লুইসা ওকে একটু ভালবাসে না কেন ? আগে তো

বাসতো। কোথায় চলে যায় ভালবাসা ? কেন যাবে ?

সেও দীপকের মতো এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে চাকরি করেছে। একই হাসপাতালে চাকরি করতে গিয়ে দীপকের সঙ্গে আলাপ। ও অল্প দিনেই বুঝে নিয়েছিল এদেশে মাথা নিচু করে থাকলে মাথা থেঁতো হয়ে যাবে। সে এক হাসপাতালে চাকরি করতে গিয়ে দুনিয়ার সবার সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়ালো, এমন কি এক কনসালট্যাণ্ট-এর সঙ্গেও। ওর কাজে নাম ভাল ছিল বলে সে কোনরকমে উদ্ধার পেয়ে অন্য হাসপাতালে চাকরি নিতে পেরেছিল। এসে দেখে সে যে হাসপাতাল ছেড়েছে, দুদিন পরেই সে হাসপাতালের লুইসা সারজিকাল ওয়ার্ডে স্টাফ নার্স হয়ে এসেছে। যে লুইসার সঙ্গে ও কোনোদিনও ভাল করে, কথা বলে নি, তাকে দেখে ও ভীষণ খুশি হল। বলে বসল, চল কফি খাওয়া যাক।

পুরনো হাসপাতালে, গল্প শেষ হলে, লুইসা প্রশ্ন করে বসল, তুমিও সাধারণ মানুষেব মতো হাসি গল্প করতে পার দেখছি !

বা ! বলেই রাণা গম্ভীর হয়ে গেল, ওর কালো কপালে নীল রগ দপ-দপ করে উঠল।

নাও। আবার আরম্ভ কর না যেন ডাঃ রায় !

ওর কথার ভাবে রাণা হাঁফ ছেড়ে হেসে ফেলল।

আমাকে তুমি খারাপ মানুষ ভেবে রেখেছ দেখছি।

খারাপ তো নয়। ঝগড়াটে। লুইসা গোলাপী ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে সিগারেট ধরাল।

সিস্টার পামার কি পাজি ছিল, তুমিই তো বললে।

সিস্টার পামার একটা বীচ্। যত তুমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করবে ও তত তোমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করত, তুমি এটা বুঝতে না কেন ?

ওর বদমায়সী আমি মেনে নেব ?

তোমরা ছ' মাসের জন্য আস, ছ' মাস পরে চলে যাও। ওর

মতো ওয়ার্ড সিস্টার রোজ সকালবেলা জুনিয়র ডাক্তারদের ব্রেকফাস্ট করে খাচ্ছে, কনসালট্যাণ্ট ওর হাতের মানুষ। অল্প বয়সে শুনেছি ওর সঙ্গে প্রেমটেমও ছিল। কনসালট্যাণ্ট তোমার কথা শুনবে, না সিস্টার পামার-এর কথা শুনবে ?

হুঁ, রাণা ধিক্কারের গলায় বলল, তোমরাই আবার বল, তোমরা কত ফ্যার্ !

সব সময় তোমরা-আমরা বলার অভ্যাসটা ছাড় তো। আমি আমি।

কিন্তু তুমি তো শুধু তুমি নও। রাণা তীক্ষ্ণ চোখে টেবিলে এগিয়ে এসে চড়া গলায় বলল, তুমি এই বুর্জোয়া সমাজের আয়না।

রাবিশ ! লুইসা গলা ঠাণ্ডা রেখে বলল, সমাজ আমাকে মানুষ করে থাকতে পারে, আমি নিশ্চয় সমাজের ঝাণ্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়াই না।

বোঝার চেষ্টা কর। রাণা বক্তৃতার সুরে বলল, সচেতন না হলে তুমি আয়না হয়েই থাকবে।

আমার আয়নাতে কি দেখতে পাচ্ছ ? লুইসা ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলল।

রাণা ঘড়ি দেখে উঠে পড়ে বলল, কাজ আছে, যাচ্ছি।

লুইসা ছোট্ট চলমান মানুষের হনহনিয়ে হাঁটা দেখল। কে এই ভদ্রলোকের পেছনে চাবুকের শব্দ করছে ?

প্রথম দিনেই লুইসার সঙ্গে ঝগড়া-ঝগড়া ভাব হয়েছিল। এক সপ্তাহ রাণা ওর সঙ্গে কথা বলে নি। নার্সদের লাই দিতে নেই, ওরা মাথায় চড়ে বসে। লুইসা মিটি-মিটি হেসেছে।

চেক মিঃ টমাসেস ব্লাড-প্রেশার। ড্রেস হিজ উণ্ডস টোয়াইস এ ডে।

ইয়েস স্যার। আর কিছু—চকিতে রাণা মাথা উঠিয়ে লম্বা লুইসার দিকে তাকিয়ে দেখল, ও মিটি-মিটি হাসছে।

রাণা চারিদিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, সিস্টার কোথায়?

সিস্টার ফোন ধরতে গেছে। আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

রাণা হন-হন করে হেঁটে চলে গেল। লুইসা একটু কৃপার হাসি হাসল। দুনিয়ার লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, নিশ্চয় লোকটা খুব দুঃখী। তাই এত ঝগড়া করে বেড়ায় হয়তো। নাকি নার্সদের মানুষ মনে করে না, হাঃ? লুইসার ঠোঁট একটু বেঁকে গেল।

রাণা যখন প্রেমে পড়ল, ভয়ঙ্করভাবে পড়ল। ওর চোখ ঝক্‌ ঝক্‌ করতে লাগল, ও হাসল সহজে, গল্প করার বন্ধু হল সহজে। ওর ভালবাসা যেন অজগরের মতো গিলে পেটের ভেতরে রেখে দিতে চাইল। লুইসা কোনো পুরুষমানুষের সঙ্গে ভুলেও হেসে কথা বললে রাণার কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠত। কেন বিদেশী চরিত্রহীনাকে সে ভালবাসতে গেল। কিন্তু রাণা যখন নার্সদের সঙ্গে গল্প করে হেসে হেসে তখন কি হয়? লুইসা রাগ করে মনে করিয়ে দিয়েছে। লুইসা কি কখনও খোঁজ করতে যায় রাণা কোথায় কি করছে, কার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তবে তাকে কেন প্রত্যেকটা ঘণ্টার মাপজোক দিতে হবে?

ঝগড়া হয়েছে প্রচণ্ড। ছাড়াছাড়ি হয়েছে। রাণা ফিরে এসেছে বার বার। দুদিন ভীষণ ভালবাসা, আবার সেই যুদ্ধ। আবার আরম্ভ হবে লুইসা কবে কার সঙ্গে প্রেম করেছে, তাদের সঙ্গে এখনো দেখা হয় কিনা, যদি হয় তবে কি রকমের সে সম্পর্ক? হাত ধরে, চুমু খায়? বন্ধুত্ব শুধু বাজে কথা, একবার বিছানায় শুলে কি পরে কখনো বন্ধুত্ব হয়? লুইসা ওকে গালাগাল দিয়েছে, সঙ্কীর্ণ, রুগ্ন, সন্দেহবাতিক, নীচমনা, বুদ্ধিহীন বলেছে। চলে যাও আমার সামনে থেকে।

'চলে যাও।' এ কথাটা শুনলে রাণা চোখে লাল দেখে। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

শত্রুকে ভালবাসার বিয়ে ওদের। কে কাকে কি ভাবে কত শাস্তি দিতে পারবে তার মহড়া যেন। ওরা প্রায় প্রথম থেকেই

হুজন হুজনকে বলে বসেছে, তুমি আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে।

বোধকরি সেজন্যই রাণা সাইকিয়াত্রিতে চলে এসেছে। ও এক সময়ে ছ'মাস সাইকিয়াত্রিক হাসপাতালে কাজ করেছিল। কনসাল্টট্যাণ্ট বোঝাল, এ ফিল্ডে থেকে যাও। ভাল কাজ করছ। তোমার উ তি হবে।

কলকাতার রাস্তায় এফ. আর. সি. এস. ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও এক চান্সে পাস করে যেতে লাগল। রেজিস্ট্রার, সিনিয়র রেজিস্ট্রার, তারপর ব্যাসিলডন হাসপাতালে কনসাল্টট্যাণ্ট। লুইসা পছন্দ করে নি ব্যাসিলডন। ওখানে ভদ্রলোক থাকে! যত বাজে লোকের আড্ডা। থিয়েটর নেই, কনসার্ট নেই, কার সঙ্গে মিশবে?

কেন, তোমার বয়ফ্রেণ্ডদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

তোমার মনটা রুগ্ন, তাই তুমি মানসিক রোগের ডাক্তার হয়েছ।

আর তুমি কি? ভীষণ সুস্থ? এত সুস্থ যে বয়ফ্রেণ্ডের ভিড় ছাড়া তোমার চলে না।

দেখ, রাণা, লুইসা স্থির গলায় বলেছে, তোমাকে হাজারবার বলেছি, তোমার সঙ্গে ভাব হবার পর আমি কারুর কাছে যাই নি। তোমার যদি বিশ্বাস না হয় আমাকে ডিভোর্স কর না কেন?

তবে তুমি খুব স্বাধীন, আর সুখী হবে, না?

একেক সময় মনে হয় তোমার কাছ থেকে মুক্তি পেলেই হয়তো আমি বেঁচে যাই।

অত সহজে মুক্তি পাচ্ছ না। লুইসা আজকাল সচরাচর সিগারেট খায় না। টেবিল থেকে একটা ধরিয়ে আস্তে আস্তে বলল, তুমি তো সাইকিয়াত্রিস্ট হয়েছ, তুমি নিশ্চয় আত্মবিশ্লেষণ করেছ কোনো-না-কোনো সময়ে, জেনেছ তুমি কেন এত নাবালক, রুগ্নমনা, আমিই বা কেন তোমার অত্যাচার সহ্য করি, তোমাকে অত্যাচার করি।

রাণা হাউ-হাউ করে বলে উঠল, তুমি খুব সাবালিকা, বয়স আমার চেয়ে দশ বছর বেশি বলে।

তুমি ভাল করেই জান, লুইসা চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, বয়সের সঙ্গে বয়স্ক হবার কোনো সম্পর্ক নেই।

লুইসা, আমি নিজেকে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করি, তুমি নিজেকে চেন না, চিনতেও চাও না।

একই কথার পিঠে একই কথা। পুরোনো কাসুন্দির মতো পুরোনো ঝগড়া। শুধু কাসুন্দি জিভে দিলে, জিভ ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে।

তুমি রেগে গেলে এত চেঁচিয়ে কথা বল কেন?

বাঙালিরা চেঁচিয়েই কথা বলে।

এদেশে তো অনেক বছর আছ, তোমার গলাটাকে একটু শিক্ষিত করতে পার না। তোমরা বন্ধুরা যখন ডিসকাসন শুরু কর, মনে হয় যুদ্ধ বেঁধে গেছে, ছাদ ভেঙে পড়বে।

তোমাদের শিক্ষার কথা আমার যথেষ্ট জানা আছে।

আবার শুরু হল। রাণা ক্লান্ত হয়ে হুইস্কি ঢেলে নিল।

আমার কাছে বস।

লুইসা নড়ল না, উত্তরও দিল না।

কি, ঝগড়া চালিয়ে যাবে বুঝি?

শোবার সময় হয়েছে, তাই যুদ্ধ-বিরতি দরকার বুঝি?

রাণা হন-হনিয়ে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে ওপরে চলে গেল। সে যাবেই না শুতে আজকে। লুইসা মুখ বিকৃত করে টেলিভিশন চালিয়ে দিল। ওর বাদামী চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল নিঃশব্দে। ও কখনও কাঁদে না রাণার সামনে। প্রথম দিকে হয়তো কাঁদত।

হতভাগা পরিহার সুখের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে অকারণে।

সাধারণত আবার ঘুমিয়ে পড়তে ওর কোনো অসুবিধা হয় না। স্টুডেন্ট আমল থেকেই ফোন আসছে, ব্লিপ বাজছে—শ্যামের বাঁশি। কিন্তু আজকে কিছুতেই ঘুম এল না। সে আস্তে আস্তে উঠে নেমে এল নিচে। ব্যাসিলডনের কাছে স্টল-এ বাড়িটা সুন্দর পেয়েছে, এত বছর ঘরে ঘরে, তারপরে বিয়ের পরে ডাক্তারদের ফ্ল্যাটে থেকেছে। কালো বিদেশী ডাক্তারদের বেছে বেছে যেন খারাপ ঘর, খারাপ ফ্ল্যাট দেয়। রাণার অন্তরে তাই ধারণা।

গাঁই-গুঁই করে- লুইসা ব্যাসিলডনে এসেছে। নিউ টাউন ব্যাসিলডন, অর্থাৎ একুশ বছরের পুরোনো, কিন্তু এখনও এস্টেট তৈরি হচ্ছে চাষের জমি কেড়ে নিয়ে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত লণ্ডনের পূর্বপল্লী অথবা ইস্টএণ্ড বস্তি থেকে লোক সরাতে হবে। যুদ্ধের পরে ইংলণ্ড নতুন করে নিজেকে দেখছে। ক্রাউন জুয়েল ভারতবর্ষ হাত থেকে খসে গেল, বৃটিশরা এখনও বলে ভারতবর্ষ ছেড়ে ওরা স্বইচ্ছায় চলে এসেছে, স্বাধীনতা উপহার দিয়েছে। ইকনমিক বুম শুরু হল, উই আর অলরাইট জ্যাক, পতন হল ওয়েলফেয়র স্টেট, জন্মাবার আগে থেকে শ্মশান পর্যন্ত রাষ্ট্র সবাইকে সযত্নে দেখা-শোনা করবে। বিশেষ করে দুর্বল, গরিব, রুগ্নদের কিছু কিছু বস্তি গুঁড়িয়ে ফেলে উঠল আকাশচুম্বী প্রাসাদ, পায়রার খোপের মতো ফ্ল্যাট তৈরি হল ঐ ম্যাচ-বাক্সের দালানে। আরো বাড়ি চাই, লণ্ডনে বড় ভিড়, নতুন শহর দরকার।

ব্যাসিলডন সেই এক নতুন শহর। এখানে আকাশচুম্বী বাড়ি উঠল না, মানুষরা খোপে খোপে থাকতে চায় না। ইস্টএণ্ডের যুবক শ্রমিক-শ্রেণী নতুন জীবনের আশায় ব্যাসিলডনে আসতে থাকল দলে দলে। নতুন বাড়ি যখন নতুন ফারনিচার, নতুন কিচেন—সব-কিছু নতুন চাই। ব্যাসিলডনে সব-কিছু নতুন, এক পরিবার আর এক পরিবারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন জিনিস কেনে। তবু মেয়েরা অসুখী। মা কোথায় বাচ্চা রাখবে? বন্ধু কোথায়

দুদণ্ড প্রাণের কথা বলবে? ব্যাসিলডন সিনড্রমের জন্ম হল। সব কিছু নতুন পেয়েও, সুখ নেই, শান্তিও নেই। নিয়ে এস মাকে, বাবাকে, অথবা বিধবা মাকে। বৃদ্ধ মা-রা ছটফট করে ইস্টএণ্ড-এর পড়তি ছোট বাড়ির জন্য, এক চিলতে বাগানে দাঁড়িয়ে কত গল্প করা যেত। এক পরিবার হয়তো অস্থির হয়ে পালিয়ে গেল ইংলণ্ডের আরেক প্রান্তে। থেকে গেল নিয়ে-আসা বৃদ্ধা মা। আবার আরেক দল আসে নতুন জীবনের খোঁজে উত্তর বৃটেন থেকে, ইস্টএণ্ড থেকে। ব্যাসিলডন সিনড্রম বদলায় না।

ওয়েলফেয়ার স্টেটই বটে। লিবারেল বুর্জোয়ার দেশ, রাণা হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে সোফায় বসে ভাবে, চকচকে টিন ফয়েল দিয়ে ওরা ঢেকে রাখে ওদের দারিদ্র্য, ওদের রুগ্ন মন, ওদের সমস্যা। সব কিছু আছে, অথচ কিছুই ঠিক নেই। ভাঁওতাবাজি দেখ।

দিন থেকে রাত পর্যন্ত ঘটনায় ভরা, কে হঠাৎ ক্ষেপে গেছে, কে ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, কেউ বাড়ি থেকে রাস্তায় পা ফেলতে পারে না, পেট ঝটপট, বুক ধড়ফড় করে, মনে হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে, কেউ বা লোকজনের সঙ্গে এক ঘরে থাকলে মনে হবে ঘরের সিঁড়ি নেমে আসছে ওর শ্বাসরোধ করতে। স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা নেই, ছেলে ধরে পিটোও, নয় বউকে ধরে পিটোও, মদ খাও আর মদ খেতে খেতে লিভার পচুক, ব্রেন সেল-গুলো আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাক। চিৎকার, মারামারি। সব খানে প্যানিক। টি-ভি. খোলো, কাগজ পড়। 'হারি' 'হারি' এক্ষুনি পড়ে মরে না দৌড়লে অন্য লোকে 'সেল'-এর 'বারগেন' নিয়ে ভাববে।

'দু সপ্তাহ', খালি 'দু সপ্তাহ' এ জিনিসটা কম দামে বিক্রি হচ্ছে, দরকার নেই বাড়ি ভাড়া দেবার, জিনিসটা তো আগে চাই। এই কাল্লা ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি, রাণা অশ্রাব্য কথা উচ্চারণ করে বলল, শ্রমিক শ্রেণীকে জিনিসের ঘুষ দিয়ে ওদের চিন্তার

ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। এর ওপর আবার মাইক্রো চিপস' আসছে, ওরা কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোবটের মতো বোতাম টিপবে।

'সান' ওদের সবচেয়ে প্রিয় কাগজ, প্রিয়তর পাতা 'পেজ থ্রি', উলঙ্গ মেয়ের নানান অঙ্গভঙ্গি। এত ন্যাংটো মেয়ে খুঁজে পায় কোথায়? করাপ্ট সোসাইটি!

লুইসাকে ও বোঝাতে চেষ্টা করে। কে বুঝছে কার কথা। একটু গলা নামিয়ে লেকচার দিতে পার না? ডিসকাশন মানেই লেকচার ওদের কাছে। আর নিজের ঘরে নিজের বাড়িতে গলা নামিয়ে কথাই বা বলব কেন? পাশের বাড়ি ভাববে ঝগড়া করছ। নিকুচি করেছে পাশের বাড়ির!

জন্ম থেকে শুনে আসছে 'লোকে কি বলবে, লোকে কি ভাববে', এ কথাটা শুনলেই ওর মাথা গরম হয়ে যায়।

জোর করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হয়। সবাই তো কালো কনসালট্যাণ্টকে ল্যাং মারার ধান্ধায় আছে। লুইসা ওকে বলে প্যারাণয়া। বাস্তব বিচার করে চললেই প্যারাণয়াক হয়ে গেল। সে যেন প্যারাণয়াকদের আর চিকিৎসা করে না। নার্স হয়ে দু-চারটে শব্দ শুনে ছুঁড়ে দিলেই হল।

আট বছর পরে দেশে ফিরবে এই প্রথম। বাবা লিখেছে, ছোট বোনের বিয়েতে যদি আসতে পার খুবই সুখী হইব। লুইসাকে আনিতে পার, কিন্তু তোমার দাদার বাড়িতে তুলিবে। তোমার মাকে তো জানই, কিছুতেই লুইসাকে স্বীকার করিয়া নিতে রাজি নয়। যা ভাল বোঝ করিবে। আর কতদিন ইহলোকের যন্ত্রণা ভাগ্যে আছে জানি না।

অর্থাৎ ভদ্রলোক, রাণা মনে মনে বলল, ব্ল্যাকমেল করছে। একা চলে এস, না হলে হয়তো আর দেখা নাও হতে পারে। লোকদের দেখাতে হবে বিলেতের বিরাট ডাক্তার হয়ে ছেলে ফিরে এসেছে। 'দেখ', 'দেখুন' ছেলে একটুও বদলায় নি। কোনো অহঙ্কার

নাই, কোন চালবাজি নাই আমার ছেলের। মারতে মারতে প্রায় মেরে-ফেলা ছেলে এত জ্ঞানী, গুণী হয়েছে, না মারলে, কান ধরে রোজ বিকেলবেলা পড়তে না বসলে কি তা সম্ভব হত! লুইসা রাগ করে বলে, বাবা-মা তোমাকে মেরে পিটিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছে, মানুষ করে নি। দেখ না, এদেশে 'ব্যাস্টারড' বাচ্চারা কিরকম অমানুষ হয়! রাণা উত্তর দিয়েছে, ঐ নিয়ে ভাবতে বসলেই মাথা খারাপ, আমরা তো কখনও এসব ভাবি না। মা, বাবা যা ভাল মনে করেছে, করেছে। দারিদ্র্যের জ্বালায় মানুষের মাথার ঠিক থাকে এতগুলো ছেলে-পিলে নিয়ে! রাণা থামতে পারে না শেষে ধাক্কা না দিয়ে, যুদ্ধক্ষেত্র তো বটেই, তোমার মা বাবা তো এক মেয়েকে আদরে-আদরে সর্বনাশ করেছে।

লুইসা দুমদাম করে ঘর ছেড়ে চলে গেছে রান্নাঘরে।

লুইসাকে বলেছে বাবার চিঠির কথা রেখে-ঢেকে। লুইসা সোৎসাহে লাফিয়ে উঠেছে, বাঃ, আমি এবার ইণ্ডিয়া দেখব। তোমার মা তাহলে রাজি হয়েছে এতদিন পর!

রাণা একটু আমতা-আমতা করে বলেছে, মা একবার মন ঠিক করলে বদলায় না। তবে—

আই সী! লুইসা বলে উঠল চোখের ভুরু আকাশে তুলে।

তোমার কলকাতা ভাল লাগবে না এমনিতেই। এক কাজ করতে পার, রাণা বইয়ের মলাটে হাত বুলিয়ে বলল, তুমি দিল্লি, আগ্রা, কাশ্মীর ঘুরে এস, আমি না হয় তোমার সঙ্গে বম্বেতে গিয়ে দেখা করব। কি বল?

না, তুমি একাই যাও।

লুইসা আস্তে আস্তে বলল, পরের বার না হয় একসঙ্গে ঘোরা যাবে।

তুমি একা-একা কি করবে?

কেন, আমার চাকরি তো আছেই। না হয় ছুটি নিয়ে মা

বাবাকে দেখে আসব ইয়র্কে।

রাণা একটু হেসে বলল, পুরোনো বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে ডেট করতে যাবে ?

তোমার শরীরে সেল-এর বদলে হিংসার পোকা শুধু কিলবিল করছে।

আমি ঠাট্টা করে বলছি, তুমি রাগ করছ কেন ?

তোমার ঠাট্টা আমার জানা আছে।

কেন, তুমি বব্-এর সঙ্গে দেখা করবে না একবারও ?

তোমাকে কতবার বলেছি বব্ এখন সুখে ঘর-সংসার করছে।

তবু সেই তোমার জীবনের প্রথম প্রেমিক। ওর জন্যই তোমাকে টারমিনেশান করতে হয়েছিল।

তোমার কখনো মনে হয় তুমি যখন পুরোনো কথা দিয়ে থু থু ছিটোও তোমার নিজের গায়ে পড়ে কিনা! তুমি না সাইকিয়াট্রিস্ট, পরের মনের দুঃখ বোঝ ? বাচ্চা খসিয়ে কি আনন্দে নেচেছিলাম তোমার মনে হয় ?

লুইসা, রাণা ওর হাত হাতে নিয়ে বলল, আমাকে ক্ষমা কর। ওসব আমার কিছু মনে হয় না তুমি তো জান। কিন্তু তোমাকে অন্য কেউ ভোগ করেছে, বা আবার কেউ করতে পারে এ চিন্তা আমি সহ্য করতে পারি না। তোমাকে আমি অতিরিক্ত ভালবেসে ফেলেছি। জীবনে এভাবে কাউকে ভালবাসি নি। আমার কাছে এস।

লুইসা রাণার কোলে মাথা রেখে চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে বলল, এ তোমার ভালবাসা নয়। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তোমার ভালবাসায়। আমাদের ভালবাসা অভিশাপ।

রাণা লুইসার চুলে আঙুল বুলিয়ে চুমু খেতে-খেতে বলল, কখনও-সখনও আশীর্বাদও বটে!

আশীর্বাদ, না অভিশাপ ? রাণা হুইস্কির গ্লাসকে উদ্দেশ করে

জিজ্ঞাসা করল। তিন সপ্তাহ মনে হচ্ছে তিন যুগ, ও কি করে লুইসাকে ছেড়ে থাকবে, ওর সঙ্গে কথা না বলে, ওর শরীরে হাত না বুলিয়ে? এমন করে কাউকে ভালবাসতে হয়? এ কী ভালবাসা!

রাণা ওপরে উঠে পড়ার টেবিলে বসে, রাইটিং প্যাড নিয়ে লিখতে বসল।

প্রেম কি আশীর্বাদ, না অভিশাপ? রাণা কলম হাতে নিয়ে উত্তর খুঁজতে চাইল।

ছয়

সাড়ে নটায় সে হাসপাতালে আসে। তিন তলায় রানার অফিস। পাশেই ওর সেক্রেটারি জিল-এর অফিস।

গুডমর্নিং জিল। নাইস মর্নিং টু।

গুডমর্নিং ডাঃ রে। আর্জেন্ট মেসেজ আছে ক'টা। সব টেবিলে রেখে এসেছি।

থ্যাঙ্কস।

চেয়ারে না বসে ও জানলার সামনে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। নিচেই হাসপাতালের বাগান। চারা গাছগুলো আস্তে-আস্তে বড় হচ্ছে রোদে ঝলমল করছে দিনটা। নীল আকাশে একটুও মেঘ নেই। চড়া হাওয়া দিয়েছে। সবুজ জমির আন্দোলিত ক্ষেত ঢিপির মতো ওপরে উঠে গেছে। দূরে চোখ ফেললে রাইডিং স্কুল দেখা যায়। ঘোড়াগুলোর গা চকচক করছে, তারপরেই ঘন বন। ওয়ান ট্রি হিল। বেশ নামটা! এত ঘন বনকে ওরা একটা গাছের ঢিপি বলে কেন? এদেশে ঢিপি মানেই হিল। ওয়ান ট্রি হিল।

ফোন বেজে উঠল। শুরু হল দিন। রাণা বুক পকেটে হাত দিয়ে খামে মোড়া চিঠিটা একটু ছুঁয়ে রিসিভার তুলে নিল, ইয়েস, রে স্পিকিং!

গুডমর্নিং ডাঃ রে, সকালেই বিরক্ত করছি, রেজিস্ট্রার ডাঃ আলি বলল, একটা সেকশনের এ্যাডমিশন এসেছে, ওয়ার্ডে একটাও ফিমেল বেড নেই।

ওয়ার্ড টেনকে জিগ্যেস কর।

ওদেরও এক অবস্থা।

এ্যাডমিট তো কর। একটু পরেই তো ওয়ার্ড মিটিং আছে, তখন ডিসচার্জ করা যাবে।

থ্যাঙ্ক্ উ ডাঃ রে। তাই করছি।

ফোন রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফোন বেজে উঠল। টেবিলে রাখা মেসেজে চোখ বুলোতে বুলোতে সে রিসিভার তুলে বলল, এবার কে ?

সোশ্যাল ওয়ার্কার।

দাও। ইয়েস, রাণা হিয়ার।

গুড মর্নিং রাণা। ডিস ইজ ভ্যালারি।

কি করতে পারি ?

একটা খারাপ খবর আছে। টোনীকে মনে আছে ? ঐ যে অল্প বয়সী স্কিৎজোফ্রেনিক, মাস তিনেক আগে কোলচেস্টারের হস্টেলে পাঠিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, মনে পড়ছে।

এক্ষুনি খবর পেলাম ও পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ও বেশ ভাল করছিল, অথচ—

ওর মা-বাবা জানে ?

না, এখনও জানে না। আমি ফোন করছি। কি যে বলব ওদের !

ভ্যালারির দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল। কেন যে ভালর দিকে যাচ্ছিল—ভ্যালারি সান্ত্বনা চাইছে।

রাণা বলল, জানই তো, ওরা যখন ভালর দিকে যেতে থাকে

তখনই রিস্ক বেশি। কিছু করার নেই। যতদূর সাধ্য তো আমরা করেছি।

হ্যাঁ, জানি।

কিছু দরকার হলে জানিও।

থ্যাঙ্ক্ উ রাণা।

যাক, ডিসচার্জ-করা পেশেণ্ট হস্টেলে আত্মহত্যা করেছে, রাণার জবাবদিহি করতে হবে না। সেকশানে-থাকা পেশেণ্ট বাইরে পাঠিয়ে আত্মহত্যা হলেই রাণা জড়িয়ে পড়ত। হস্টেলের মাথাব্যথা, রাণার নয়। রাণার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটু খারাপ লাগল।

প্রথম জোর করে আনা পেশেণ্ট, ওয়ার্ডে বেড নেই, দ্বিতীয় আত্মহত্যা। সলিসিটর আবার চিঠি দিয়েছে, জন-এর কেস উঠবে কোর্টে পরের সপ্তাহে। রিপোর্ট জরুরি দরকার। সময় কোথায় লম্বা রিপোর্ট ডিক্টেট করার, তবুও আজ করতেই হবে। রাণা নিজেকে সান্ত্বনা দিল, পঞ্চাশ পাউণ্ড ফি পাওয়া যাবে অন্ততঃ কোর্ট রিপোর্ট লিখে। দেশে যাবার আগে টাকাটা কাজে দেবে। ডাইরি খুলেই ও তাড়াতাড়ি বন্ধ করল। পাঁচ মিনিট সময়ও নেই। আজকেও রাত পর্যন্ত কাজ করতে হবে। অবশ্য কাজে ওর ক্লান্তি নেই, ও যদি সার্জারিতে শুধু যেতে পারত। ছুরি চালিয়ে, স্টিচ দিয়ে আরাম আছে, মনে হয় একটা কিছু করলাম। সার্থক হল খাটুনি। দু-চারটে ভুল হবে, দু-চারটে মরবে সে আলাদা কথা। কিন্তু বেশির ভাগই হাসিমুখে হাসপাতাল ছেড়ে যাবে। ধন্যবাদ দিতে ফিরে আসবে ক্লিনিকে। আর এই সাইকিয়াট্রি? হাসি মুখে যদি বা কখনও যায়, কাঁদো-কাঁদো মুখে দুদিন পরে ফিরে আসবে। কিসে যে ভাল হয়, কেমন করে যে ভাল হয়, ওষুধে, না, বিনা ওষুধে! কে জানে।

আবার ফোন বেজে উঠল। সে রিসিভার না তুলে জিল-এর

ঘরে গিয়ে বলল, কি ব্যাপার আজকে ?

ইট ইজ গোয়িং টু বি ওয়ান অফ দোজ ডেস। জিল রিসিভারে হাত রেখে বলল, ডাঃ সরকার জরুরি ডমিসিলরী চাইছে।

দেখি। ডাঃ রায় বলছি।

ডাঃ রায়। আমায় উদ্ধার কর। এই মেয়েছেলেটি কাল দু বার রাত্রে আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। আজ সকালে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের সমস্ত জানলা ভাঙা। নিজের বুকে ছুরি বসাবে বলে শাসাচ্ছে। স্বামী কাজে যেতে পারে নি, পাহারা দিচ্ছে।

স্বামীকে সারাদিন পাহারা দিতে বল। বিকেলের আগে যেতে পারব না। ইনজেকসন দিয়েছ ?

না, নেবে না। লাগারকটিল দিয়েছি।

ঠিক আছে। ওতেই ঠাণ্ডা হবে। ইতিহাস কি ?

কোন ঝামেলা ছিল না। হঠাৎ ক্ষেপে গেছে। শালার দেশ ! ডাঃ সরকার বাংলাতেই বলল।

ঠিক আছে, বিকেলে যাব।

থ্যাঙ্ক্ উ রাণা।

কোর্টের রিপোর্ট কখন লিখবে ? রিপোর্ট লিখলে টাকা পাওয়া যায়, সময় কি কেনা যায় টাকা দিয়ে ?

রাণা নিচে নেমে এল। ওয়ার্ডে ঢুকে অফিসে গেল প্রথমে। সিস্টার বেথ বসে বসে বলল, গুড মর্নিং ডাঃ রে।

মর্নিং সিস্টার বেথ। রেডি ?

হ্যাঁ, চল।

আলাদা একটা বাগানঘেরা ঘরে ওয়ার্ড মিটিং বসে। দেয়ালের একটা দিক কালো হয়ে আছে, এক পেশেণ্ট আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, প্রায় এক বছর হয়ে গেল, সেরকমই পড়ে আছে, ন্যাশনাল হেলথের নাকি পয়সা নেই রং করার। রাণার এসব বড় একটা চোখে পড়ে না, সে শুনেছে রাণার ওয়ার্ড বলেই কেউ কেয়ার করে

না, হত ডাঃ রবিনস-এর ওয়ার্ড, পরের সপ্তাহেই রঙ উঠে যেত। রাণা এসব কথায় কান দেয় না। ঘরে ঢুকে দেখল ডাঃ ফার্নানদেজ ট্রলির পেছনে বসে আছে।

গুড মর্নিং ডাঃ ফার্নানদেজ।

গুড মর্নিং ডাঃ রে, লুলু একটু ওঠার ভান করে আবার বসল।

রাণা মনে মনে ভাবল মেয়েটা এত চোরের মতো লুকিয়ে-লুকিয়ে থাকে কেন? ভ্যালারি আসে নি এখনও। ওকিউনেশনাল থেরাপিস্ট জ্যানেট এসে গেছে। স্টুডেণ্ট নার্স এসে বসল। চৈনিক কমিউনিটি নার্স ডানি কো নক করে ঘরে ঢুকল।

রাণা গম্ভীর হয়ে বসল কনসালট্যাণ্টের মুখোশ পরে। দরজার মুখোমুখি হয়ে এক কোণায় ওকে কেন্দ্র করে আলোচনা চলবে। কি আছে আজকে? রাণা আরম্ভ করল। ডিসচার্জ-এর পেশেণ্টটি দেখি আগে। সিস্টার বেথ কার্ডেকস নিয়ে বসেছে! রোগা-রোগা পা। স্কার্ট হাঁটুর ওপরে। কে দেখতে চায় রোগা হাঁটু আর রোগা থাই! ভাগ্যিস ও পাশাপাশি বসে না, মুখ না ফেরালে হাঁটু দেখতে হয় না। প্যাঁচা-মুখী স্টুডেণ্ট নার্সকে দেখলে মনে হয় ঝিমুচ্ছে, নিশ্চয় সারারাত ফুর্তি করেছে। ড্যানি কো স্যুট পরে ফিটফাট, সেলসম্যানের মতো চোখে-মুখে হাসি ঠিকরে পড়ছে, চীনে রেস্টুরেণ্টের চৈনিক বেয়ারাগুলো যদি একটুও হাসত।

কাকে কাকে ডিসচার্জ করা যায় আগে দেখ।

রাণা লুইসার দেয়া পার্কার বলপয়েণ্ট পেন হাতে ঘুরিয়ে বলল। ওয়েল, টু স্টার্ট উইথ নিক ফেনিক।

ভ্যালারি আসুক। আর কে?

মিসেস ম্যাকগ্রাথ। স্বামী ছেলে মেয়ে সব দেখা করতে এসেছে তোমার কথা মতো।

পরে হবে। আর কে?

পাঁজজন বুড়োবুড়ি বেড ব্লক করে আছে। ওদের—ওদের তো

সহজে ডিসচার্জ করা যাবে না। আত্মীয়-স্বজন দেখতে পারবে না। হোমে জায়গা নেই। এর ওপর কুড়িজন বৃদ্ধ আমার ওয়েটিং লিস্ট-এ আছে। সোশ্যাল সার্ভিস-এর টাকা নেই। যাক গে—জন টমাস। এ্যালকহলিক। দু সপ্তাহ আছে। ড্রাই আউট হয়েছে। ভালই করছে।

ডাঃ ফার্নানদেজ কি বলে? রাণা সোফাতে পিঠ রেখেই বলল। লুলুর মুখ ট্রলির পিছনে ঢাকা।

মনে তো হয় ঠিক আছে।

সকলের সঙ্গে মেশে। খুব হেলপফুল। জ্যানেট বলল।

স্টুডেন্ট নার্স উঠে জনকে নিয়ে এল।

মুখ চোখ বসা হাড়গিলে জন ঘরের মধ্যিখানের চেয়ারে বসল। তিরিশ বছর বয়স। দেখলে মনে হয় পঞ্চাশ। মাঝখানে কফি টেবিল।

তারপর কি রকম?

ভাল বোধ করছি ডাঃ। ওষুধে কাজ দিচ্ছে।

বোতলের ওষুধ না খেয়ে কাজ দিচ্ছে বল।

ঘরের সকলে হাসি আড়াল করল।

আর জীবনে বোতল ছোঁব না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

এরকম প্রতিজ্ঞা কতবার করেছ?

নাঃ, জন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আর নয়! পুলিশ আমাকে টেনে না তুলে হাসপাতালে আনলে আমি মরেই যেতাম।

তোমার প্ল্যান কি?

জানি না ডাঃ। চাকরি গেছে, ঘরভাড়া দিই নি বলে ঘর গেছে।

আজকে তুমি যেতে পার। ঘর খুঁজে নাও বা হোটেল ওঠ।

জন-এর চোখ ভয়ে গোল হয়ে গেল। আমি এখনও সুস্থ হই নি।

আমার মতে হয়েছ। সোশ্যাল সার্ভিস অফিসে যাও, ওরা ব্যবস্থা করে দেবে।

জন নড়ে না।

আচ্ছা। বাই-বাই ফর নাও।

জনের ভয় রাগে আর দুঃখে মিশে গেল। কি করে ডাক্তার ওকে ডিসচার্জ করতে পারে? ওর হাত কাঁপে এখনও, একটু বেশি খেলেই বমি আসে। সব সমান! বাবা ছোটবেলায় ছেড়ে চলে গেছে, মা জনকে 'চিলড্রেনস' হোমে ঢুকিয়ে দিয়েছে, বৌ বাড়ি থেকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। দুনিয়ায় ওকে কেউ চায় না। ফাকিং কালো ডাক্তার! কি জানে অসুখের!

জন-এর সঙ্গে ভ্যালারির করিডরে দেখা।

কি, তুমি ঠিক আছ?

মাইণ্ড ইয়র ফাকিং বিজনেস। জন থুথুর মত শব্দগুলো ছুঁড়ে দিল।

ভ্যালারি নক করে ঘরে ঢুকে হেসে রাণাকে বলল, তোমার এক অখুশি কাস্টমারের সঙ্গে দেখা হল।

ও! জন! সবাই হাসল।

নিক ফেনিককে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। রাণা বলল, ভ্যালারির দিকে তাকিয়ে, নিক-এর সামাজিক অবস্থা কি? তুমি তো ওদের দেখেছ শুনলাম।

বাবা কাস্টমস অফিসর। মা পারসনেল ম্যানেজার। তিন ছেলে, নিক সবার ছোট।

বয়স কত নিক-এর? ড্যানি জিজ্ঞাসা করে।

একুশ। বড় ভাই কম্পিউটর ইঞ্জিনিয়র, মেজ ন্যাভেল অফিসর। দুজনেই দাঁড়িয়ে গেছে, নিক-এর কিছু হল না। যতদিন বাড়িতে ছিল নিক-এর মতো নাকি বাধ্য শান্ত ছেলে হয় না। ড্রামা নিয়ে পাগল।

নিক-এর কি অসুখ ? স্টুডেণ্ট নার্স ঘুম ভেঙ্গে সিস্টার বেথকে জিজ্ঞেস করে।

রাগী তরুণ! রাণা গম্ভীরভাবে বলল। আর সকলে হেসে উঠল। তারপর ?

শান্ত ছেলে মার স্কার্ট ছেড়ে পোর্টস্‌মুথে ইকনমিক্স পড়তে গেল। বছর ঘুরে পরীক্ষার একসপ্তাহ আগে ব্রেকডাউন! ঘুমুতে পারে না, খেতে পারে না, পড়তে বসতে পারে না। বাড়ি ফিরে ঘরে একবছর হল বসে আছে।

বসে বসে মা বাবার ঝগড়া শোনে রোজ সন্ধ্যেবেলা—নিজের ঘরে বসে রাণা গল্প শেষ করল; মা বাবা যখন ঝগড়া করে, রেডিও-গ্রাম চালিয়ে দেয় জোরে যেন ছেলে শুনতে না পায়। নিক একদিন নিচে নেমে এসে কোনো কথা না বলে রেডিওগ্রাম থেকে রেকর্ড ছিনিয়ে দরাম করে রেকর্ডটা টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলল। মা বাবা ভীষণ হতভম্ব, তাদের শান্ত ছেলে একী করল! মা দৌড়ে শোবার ঘরে চলে গেল। নিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে শুরু করল।

আমি নিক-কে বললাম ওদের সামনে, ভ্যালারি শুরু করল, নিক এবার তোমার ডিসচার্জের সময় হয়েছে। বাড়ি যাচ্ছ তো ?

বাড়ি যেতে বলছ সারা জীবনের মতো ? নিক বলে উঠল।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ক'সপ্তাহের জন্য। তারপরে ভেবে দেখ তুমি কি করতে চাও।

মা-ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি মধুর হেসে বলল, যদি চাও তুমি সারা জীবন আমাদের কাছে থাকতে পার নিক!

তুমি কি বললে ভ্যালারি ? রাণা জানতে চাইল।

আমি বললাম, নিক, তুমি এমনভাবে বলছ বাড়ি যাওয়া যেন লাইফ সেনটেন্স! তোমার বাবার সঙ্গে আমি একমত। বাড়ি ফিরে ঠিক কর তুমি তোমার জীবন নিয়ে কি করবে। তুমি বড়

হয়েছ, মা বাবার কাছে থাকবেই বা কেন ?

কেন ? কেন হঠাৎ চিৎকার করতে শুরু করল, কিছু বলছে ?

বাবাই বলল, ঝগড়া তো আমরা চিরকাল করি। কোন্ স্বামী-স্ত্রী করে না ? সে জন্য কি তুমি এমন ব্যবহার করেছ ?

শুধু তাই নয়। নিক মাথা না তুলে বলল।

তবে ?

আমি জানি না আমি কি চাই। ইকনমিক্সে নিয়েছিলাম, ভাবলাম, আজকাল ওতে চাকরি পাওয়া সুবিধে। কিন্তু—

ও ড্রামাই ভালবাসে। মা বলল।

তবে তাই কর না। আমি বললাম।

গ্রাণ্ট পাব না।

থিয়েটর কোম্পানিতে ঝাড়ুদারের কাজ নাও। বাবা বলল।

আমি ভাবলাম, হাসপাতাল আমাকে ভাল করে দেবে, সাহায্য করবে, তা নয় আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। নিক অভিযোগের সুরে বলল ভ্যালারিকে। ভ্যালারি শেষ করল ওর উপাখ্যান।

ওর ইচ্ছে ওর মার মতো ওকে দুনিয়ার লোক সব ঠিক ঠাক করে দিক। সিস্টার বেথ বলল। সব সময় রাগে গজ গজ করছে, ভাবে ভীষণ বুদ্ধিমান, কারো সঙ্গে মেশে না।

দেখি নিককে। রাণা বলল।

নিক এসে বসল। হঠাৎ দেখলে পনেরো-ষোল বছর বয়স মনে হয়। ছোটখাটো রোগা-সোগা। মুখ অভিমানে রাগে থমথম করছে। মিসেস সাগভেন বলছিল, রাণা বলল, পেন নিয়ে খেলা করতে করতে, তোমার মা বাবার সঙ্গে কথা বলেছে। তুমি বাড়ি যেতে পার!

নিক রাগে দপদপ করে উঠল, আমাকে ভাল না করে ডিসচার্জ করে দিচ্ছ কেন ?

তোমার তো কোন অসুখ হয় নি। হাসপাতাল হল অসুস্থ

রুগীর জন্য। রাণা বলল।

তবে আমি হঠাৎ চিৎকার করতে শুরু করব কেন?

তুমি চিৎকার করেছ, কেন করেছ সে উত্তর কি আমার দেবার দায়িত্ব? না তোমার নিজের? রাণা বলল।

শিট্। নিক বিড়-বিড় করে বলল।

কি বললে? রাণা না শোনার ভান করে বলল।

কিছু নয়।

ঠিক আছে তাহলে।

আমি এই হাসপাতালের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব, তোমরা আমার কিছু করবে না?

তোমার জন্য গ্রুপথেরাপীর ব্যবস্থা করে দেবতো বলেছি। ডাঃ রে রাজি আছে। ভ্যালারি বলল।

নিক ঝাঁ করে উঠে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। আরেকজন অসন্তুস্ট খদ্দের গেল।

সবাই হেসে ফেলল। না হাসতে পারলে সাইকিয়াত্রিক হাসপাতালে কাজ করা যায় না।

ড্যানিকো ছটফট করছিল—ও বলল, মিসেস পামারকে আনতে হবে ডাঃ রে মনে হচ্ছে।

মিসেস পামার?

যে বৃদ্ধ মহিলার স্বামী মারা গেছে দশ বছর আগে। কিন্তু এখনও রাত দুটো তিনটের সময় প্রতিবেশীদের বাড়ি-বাড়ি ঘোরে স্বামীর খোঁজে। কাউকে ঘুমুতে দেয় না। স্বামীকে না পেয়ে চিৎকার করে সারারাত। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। প্রতিবেশীরা কমপ্লেন করছে।

সিস্টার বেথ? রাণা বলল। না এনে তো উপায় নেই মনে হচ্ছে।

কিন্তু আরেকটা বেড ব্লক হয়ে থাকবে। এটা একিউট ইউনিট।

যদি ওদের কোনো হোমে পাঠানো যেত। সিস্টার বেথ অনুযোগের চোখে ভ্যালারির দিকে তাকাল।

আমার দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। ম্যাগী থ্যাচারকে একদিন ওয়ার্ড মিটিঙে ডাকা যাক্। মহিলা তো সব বাজেট কাট্ করছে। হোমে জায়গা নেই। হোম বন্ধ করে দিচ্ছি।

আমি নিয়ে আসব তাহলে মিসেস পামারকে? ড্যানি কো রাণাকে জিজ্ঞাসা করে।

নিয়ে এস।

ড্যানি কো পালিয়ে বাঁচল। ও বসে বসে গল্প শুনতে আর গল্প করতে ভালবাসে না। ও কাজ করতে ভালবাসে। ইস সে যদি ডাক্তার হবার সুযোগ পেত। ওর মা বাবা পিকিং থেকে পালিয়ে হংকং-এ রিফিউজী হয়ে এসেছিল। সুতরাং সে ডাক্তার হবার সুযোগ আর পায় নি। নার্সিংয়ে ঢুকতে হয়েছে। বাবা তাওয়ানে থাকে, মা হংকংয়ে ওর খুব ইচ্ছে পিকিঙে ঘুরে আসে। মা বাবার কাছে এত গল্প শুনেছে। কিন্তু ওর ভয় চীন সরকার যদি আটকে রেখে দেয় ওকে? তখন? ড্যানি ম্যাগি থ্যাচারের ভক্ত।

স্টুডেণ্ট নার্স বলল, ম্যাকগ্রাথ ফ্যামিলি সেই দশটা থেকে বসে আছে।

রাণা ঘড়ি দেখল, সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে।

লুলু ট্রলির ফাঁক থেকে বলল, আমি মিসেস ম্যাকগ্রাথকে ভর্তি করি নি। ওর সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।

ডাঃ ফার্নানদেজ, তুমি দয়া করে ট্রলির পেছন থেকে বেরিয়ে আসবে? তুমি যে ঘরে আছ আমি ভুলেই যাচ্ছি। রাণা বলল।

লুলু বেগুনী হয়ে চেয়ার এগিয়ে বসল।

মিসেস এম তিন সপ্তাহ হল ভর্তি হয়েছে এ্যালকোহলিক পয়জনীং নিয়ে। আয়র্ল্যাণ্ডের ক্যাথলিক। মেয়ে বিয়ে হওয়ার পর থেকেই বোতল ধরেছে। স্বামী সপ্তাহ কয়েক হল গৃহত্যাগ

করেছে। তিন ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে ডিভোর্সের পরে মা বাবার কাছে ফিরে এসেছে ছেলে নিয়ে। মেয়েকে নিয়েই নাকি ঝগড়া। দেখা যাক ওরা কি বলে।

স্টুডেণ্ট নার্স উঠে গেল, ফিরে এল সাড়ে চারজনকে নিয়ে। মিঃ আর মিসেস ম্যাকগ্রাথ, ষোল বছরের ছোট ছেলে ড্যামিয়েন, মেয়ে রিটা, পাঁচ পছরের বাচ্চা ছেলে টোনী। সকলের মুখ থমথমে। মিস্টার এম-ই প্রথমে মুখ খুলল। মিসেসের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, প্যাট্ বলছে বাড়ি ফিরবে না মেয়ে বাড়ি থেকে না বেরুলে।

প্যাট বলে উঠল, ওর নিজের বাড়ি আছে, ওখানে গিয়ে থাকে না কেন ? আমার দুই ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে মেয়েটা !

আমি তাড়িয়েছি ? রিটা হাউ হাউ করে বলে উঠল, আমাকে যে ওরা ঘুষি মেরে ফেলে দিল।

তুমি তো ওদের হাতে কাঁটা চালিয়েছ আগে !

চালাবো না কেন ? আমার একটা কথা শোনে ?

তোমার কথা শুনে ওরা চলবে কেন ? তুমি কি বাড়ির কর্তা ? ওরা এখন বড় হয়েছে, তুমি তোমার নিজের বাড়িতে গিয়ে যা ইচ্ছে কর।

রিটা মার থেকে টোনীকে ছিনিয়ে নিয়ে বলল, বেশ, টোনীও তাহলে আমার সঙ্গে যাবে।

টোনী তোমার সঙ্গে যাবে ? আমি আর তোমার বাবা কোলে পিঠে করে টোনীকে মানুষ করলাম আর তুমি টোনীকে নিয়ে যাবে ? ওকে দেখবে কে, তুমি যখন কাজে যাবে ? ঢ্যাং ঢ্যাং করতে বেরবে সন্ধ্যেবেলা, তখন দেখবে কে ওকে ?

আমি ওকে এ্যাডপশনে দেব। তোমাকে দেব না।

কি ? প্যাট অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, আমি যাচ্ছি। আর সহ্য করতে পারছি না।

রাণা ঠাণ্ডা গলায় বলল, বস, পালিয়ে যেও না। বস। প্যাট কাঁপতে-কাঁপতে বসল। মি এম বলল, দেখলে তো ডাঃ, এই সারাক্ষণ ঝগড়া বাড়িতে। প্যাট বোতল ধরে, তারপরে অশ্রাব্য গালাগাল করবে।

টোনী দিদিমার কাছে চলে গিয়েছে এক ফাঁকে। প্যাট টোনীকে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

রিটা বলল, দেখতেই পাচ্ছ এটা পারিবারিক সমস্যা। কি করব আমরা ? বাবা আর সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ছেড়েছে।

রাণা ভ্যালারির দিকে তাকাল।

ভ্যালারি বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাদের গোটা পরিবারকে এক সঙ্গে দেখব। দেখা যাক কোথায় সমাধান লুকিয়ে আছে।

মিসেস ম্যাকগ্রাথ! রাণা বলল, আমি চাই তুমি সাতদিনের জন্য বাড়ি যাও আজকে। দেখ কেমন থাকো।

আমি টোনীকে ছাড়া থাকতে পারব না। প্যাট বলল।

রিটাও শক্ত গলায় বলল, আমিও টোনীকে ছেড়ে যাব না।

রাণা ভ্যালারীর দিকে ইঙ্গিৎ করে বলল, মিসেস সাগডেন পরে তোমাদের সঙ্গে এসব আলোচনা করবে।

তোমরা বাইরে অপেক্ষা কর, ভ্যালারি বলল।

ওরা সবাই উঠল, প্যাট, রিটা, টোনী কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গুড গড। ওয়াট এ ফ্যামেলি! সিস্টার বেথ বলে উঠল।

কি করে ওদের ম্যানেজ করবে তুমি! জ্যানেট বলল।

দেখা যাক্।

কি মনে হচ্ছে ? রাণা জিজ্ঞাসা করল ভ্যালারিকে।

যেটুকু শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে মেয়ে বাড়ির কতৃত্বও চায়, মা বাবা চায় টোনীকে। বাবা সব দোষ মা-মেয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে সরে পড়েছে। টোনী পড়েছে টাগ অফ ওয়ারে। এ একটা

হুলস্থুল। যুদ্ধক্ষেত্র মনে হচ্ছে।

তুমি দেখ কি করতে পার।

স্বামী নাকি খুব অত্যাচারী। সিস্টার বেথ বলল।

আমার মাথা ঝিমঝিম করছে ওদের ঝগড়া শুনে। জ্যানেট বলল।

আর কে? রাণা ঘড়ি দেখে বলল।

মিস স্মিথ। পঞ্চাশ বছর বয়স। পুলিশ তুলে এনেছিল রাত দুটোর সময় আর্মেরিয়াল রোড থেকে। মহিলা ওভারকোটে মাথা ঢেকে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল। পুলিশ ধরেছে। কে তুমি?

আমি রানী। মিস স্মিথ বলল।

কোথায় যাচ্ছ?

ডিউক অফ এডিনবরার সঙ্গে দেখা করতে।

তা মাথা ঢেকে কেন?

সবাই যে আমাকে চিনে ফেলবে। মিস স্মিথ বলল।

চল আমরা নিয়ে যাচ্ছি। পুলিশ উত্তরে বলল, হেঁটে যেতে অনেক সময় নেবে। পুলিশ নিয়ে এল ক্যাজুলটিতে।

এখন কি বলে মিস স্মিথ?

বাড়ি যেতে চায়।

রাজা-রানীর ভুত মাথা থেকে নেমেছে? নাকি বাকিংহাম প্যালেস যেতে চাইছে এখনও? রাণা জানতে চাইল।

হ্যাঁ, এখনকার মতো গেছে। বাড়ি যেতে চায়।

কি দেখতে বলছ মিস স্মিথকে ডিসচার্জের আগে?

হ্যাঁ, ডাঃ রে! সিস্টার বেথ বলল।

কি ওষুধ দিয়েছ?

ক্লোরোপমাজিন।

লুলু বলল! আর ডেপিক্সল।

ভ্যালারি বসে বসে রাণাকে দেখল। একা যখন রাণার সঙ্গে

কথা বা আলোচনা হয় রাণা একেবারে অন্যরকম। লোকজনের সামনে থাকলে রাণা কেমন যেন একটু রূঢ় রুক্ষ ব্যবহার করে, বিশেষ করে পেশেণ্টদের সঙ্গে। কেন? একদিন, ভ্যালারি ভাবল, বলব আমি রাণাকে। যদি কিছু মনে করে? করুক।

উঁহু! দেখি।

এভাবে চলল একজনের পর আরেকজন। ঘড়িতে হঠাৎ দেখল একটা বেজেছে। রাণা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আমার এবার যেতে হবে।

লানচ মিটিং। চারজন জাপানী সাইকিয়াত্রীস্ট এ ইউনিটকে দেখতে এসেছে। লানচের টেবিলে বসে আলোচনা চলবে।

আড়াইটার সময় আউট পেসেণ্ট ক্লিনিক। আবার শুরু হবে, একজনের পর একজন বিধ্বস্ত মন, বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে আসবে। ভাল করে দাও। কেউ পাবে ভ্যালিয়ম কেউ এ্যাটিভান, কেউ বা স্টেলাজিল চলবে প্রেসক্রিপশনে লেখা। ভ্যালারির সঙ্গে একদিন আলোচনা হচ্ছিল, সোস্যাল ওয়ার্কারদের ধারণা সাইকিয়াত্রিস্টরা সাইকোথেরাপী বোঝে না।

প্রত্যেক সপ্তাহে দুটো করে ক্লিনিক। কুড়িজনের মধ্যে পনেরো জনকে জানি ওষুধ দিয়ে কিছু হবে না। ওষুধ নেবে, বিরক্ত হয়ে ভাল হয়ে যাবে কিছু পেশেণ্ট, আর বাদ বাকি বারে বারে ওষুধের জন্য ফিরে আসবে। এই ওষুধে কাজ হচ্ছে না, অন্য ওষুধ দাও। দোজ বাড়াও।

ওষুধে তো ভাল করতে পারে না।

তুমি পারবে সাইকোথেরাপীতে সকলকে ভাল করতে?

গ্যারান্টি কোথায়? সময় কোথায়?

ওরা কনভেয়ার বেল্টে আসে।

রোগ যেখানে সামাজিক সেখানে তো আসবেই কেনভেয়ার বেল্টে।

তবে, ব্যাক্তির অসুখ কি করে সারাবে ?

রাণা, ভ্যালারি উঁচু হয়ে বসে বলল, হাত গুটিয়ে সমাজ বদলাবার জন্য অপেক্ষা করে বসে তো লাভ নেই। যে কজনকে সাহায্য করতে পারি করব না কেন ? এই যে যারা ওষুধ ভিক্ষা করতে আসে বারবার মনে হয় না তোমরা ওদের ডিগনিটি কেড়ে নিচ্ছ !

সমাজ মানুষের ডিগনিটি কেড়ে নিয়েছে, রাণা গম্ভীর হয়ে বলল, আমরা তো চাকুরে ডাক্তার, ওদের মাথা ঠাণ্ডা করে রাখি। যাতে চেঁচামেচি না করে, প্রতিবাদ না করে। জোড়া-তাপ্পী দিয়ে সমাজ চলে।

একেকজন রুগীকে হাসপাতালে রাখতে সপ্তাহে তিনশ পঞ্চাশ পাউণ্ড খরচা। রাণা হাসপাতালের রেস্টুরেন্টের দিকে হাঁটতে হাঁটতে যেতে যেতে ভাবল, নিক, ফেনিক, মিসেস ম্যাকগ্রাথ এদের তো হাসপাতালে পুষে রাখার কারণ নেই সপ্তাহে সাড়ে তিনশ পাউণ্ড খরচা করে !

সাড়ে পাঁচটার সময় ক্লিনিক শেষ হল। রাণা অফিসে ফিরে ফোন করল বাড়িতে, লুইসা, আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। কি করছ ?

কত দেরি হবে ?

এই আটটা সাড়ে আটটা !

তাহলে আমি একটু ঘুরে আসব।

কেন কোথায় যাবে ? এত রাত্রে ?

রাত ? নটা পর্যন্ত রোদ যায় না, রাত হল কখন ?

আমি যত তাড়াতাড়ি হয় ফিরে আসব।

তুমি বাড়ি ফেরার আগেই আমি ফিরে আসব।

কোথায় যাবে ? রাণা রিসিভার হাতে ধরে রেখে বুঝল, লুইসা ফোন রেখে দিয়েছে। কেন জানতে ইচ্ছা করে না বৌ

কোথায় যাবে ? জানতে চাওয়া কি অন্যায় ? জানতে চাইলে সন্দেহবাতিক হয়ে গেল ?

রাণা রিসিভার রেখে আবার বুক পকেটে রাখা খামে হাত দিল। রোদ ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘরে। গরম লাগছে। এদের জানালা এমনভাবে তৈরি পুরো খোলাও যায় না। সব কিছু শীতের জন্য তৈরি। গরম লাগছে। রাণা টাইটা আলগা করে দিল।

রিচার্ড, রাণার সহকর্মী দরজায় নক করে মুখ বাড়িয়ে বলল, ওয়ার্কিং লেট ?

আঃ হাঃ, তুমি ?

উপায় কি ?

দিনদিন যেন আরো খারাপ হচ্ছে। হ্যা, রিচার্ড সায় দিল, একদিকে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কমিটি মিটিং, ইউনিয়ন মিটিং, লানচ মিটিং—অন্যদিকে রুগী; একটু এধার-ওধার হলে সকলের মুখ ভার—আইনের খপ্পরে ফেলার জন্য সবাই বসে আছে! ডমিসিলরী আছে না কি ?

ছটা আছে।

আমার চারটা। কখন বাড়ি ফিরব জানি না। স্ত্রী ক্লারা অনেক সময় ভাবে আমি বেশ ক'টা মিসট্রেস রেখে দিয়ে মজা করছি।

হাঃ হাঃ। রাণা হাসল। ইচ্ছে করে নাকি ?

সময় কোথায় ? ইচ্ছে থাকলেও। গুড নাইট। লুইসাকে নিয়ে একদিন এস। ওঃ, তুমি তো কলকাতায় যাচ্ছ !

এই রোববার। তাই সব গুছিয়ে যেতে হবে। রাণা বুক পকেটে হাত দিয়ে বলল।

যাবার আগে ড্রপইন। গুড নাইট !

নিশ্চয়। গুড নাইট। রাণা বলল।

কোর্ট রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। জন কি উন্মাদ না অপরাধী? সাইকিয়াট্রীক রিপোর্টের ওপর মোটামুটি নির্ভর করবে জন এ্যাটেম্‌টেড মার্ডার চার্জে জেলে পচবে, না ছাড়া পাবে হাসপাতালে, তারপরে ভাল হলে খোলা জীবনে। বৃক্সটন প্রিজনে গিয়ে ওকে দুদিন পরীক্ষা করে এসেছে রাণা। ঢ্যাংঢ্যাংয়ে সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। প্রথম দিন যখন দেখেছিল, জন তখন বদ্ধ উন্মাদ। স্পেল থেকে ম্যাসেজ আসছে ওর কাছে যে প্রিজন-এর স্টাফ ওকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। খাবে না কিছু, খাবারে বিষ মেশানো, কেউ কাছে আসলেই চিৎকার আর ঘুষোঘুষি।

বল, মটর ওয়েতে আমার কি হয়েছিল?

তোমার শালীর স্বামী ড্রাইভ করছিল গাড়ি। শালীর পরিবার গাড়ির পিছনে বসা।

'দে হ্যাভ স্টোলেন মাই ড্রিম' ওরা আমার স্বপ্ন চুরি করেছে কেন? বলছি রেডিও আমাকে ম্যাসেজ পাঠাচ্ছে—বিশ্বাস করবে না, ঠাট্টা করছে।

তারপর!

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিলাম! ওরা আমার স্বপ্ন চুরি করেছে।

ওরা কারা?

সবাই। সবাই।

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে তারপর?

তারপর মনে নেই। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি।

রাণা ওকে মনে করিয়ে দিল না সত্তর মাইল স্পিডে গাড়ি চলেছে—স্টিয়ারিং ঘোড়ানোতে গাড়ি ক্রমশ ব্যারিয়ার ভেঙে উল্টো পথে আসা গাড়িতে ধাক্কা দিয়েছে। চোদ্দ বছরের ছেলের এক চোখ, এক হাত গেছে, অন্যদের কাটাকুটি, হাত পা ভাঙা তো কিছু নয়। মাল্টিপল ক্র্যাশ। রাণা জন-এর দিকে তাকিয়ে ওর উন্মাদ চোখ কিছুক্ষণ ধরে দেখল। রাণা দাঁড়াল, জন বসেও রাণার চেয়ে লম্বা।

প্লিজ ডোণ্ট লেট দেম স্টিল মাই ড্রিম। জন রাণার ব্রিফকেস শুদ্ধ হাত ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

এক মুহূর্ত রাণার বুক ধরাস করে উঠল। পুলিশ অফিসর সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে বলল, আর ইউ অলরাইট স্যার।

অলরাইট। থ্যাঙ্কু।

জন লাফিয়ে উঠে বলল, ওরা আমাকে মারতে এসেছে। আমাকে একেবারে মেরে ফেলবে।

রাণা ইসারায় পুলিশকে সরে যেতে বলল। জনের হাত ছুঁয়ে রাণা বলল, আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি। ডাক্তার এসে তোমাকে ইনজেকসন দেবে।

ওষুধে যদি বিষ মিশিয়ে দেয় ওরা ?

আমি নিজে দেখব যাতে না দেয়। তুমি ভাল হয়ে যাবে।

রাণা বেরোতেই সেল-এর দরজা বন্ধ হল।

দুমাস পরে আবার জনকে দেখতে গিয়েছিল রাণা। জন-এর অন্য চেহারা, অত্যন্ত ভদ্র, সৌম্য, নিজের অপরাধে লজ্জার সীমা নেই। জন খাচ্ছে, অন্য প্রিজনারদের মতই কাজকর্ম করছে। স্পেস থেকে ম্যাসেজ আসা বন্ধ হয়েছে। মডিকেট-এর এমনই গুণ।

রাণা সোস্যাল ওয়ার্কারের রিপোর্ট পড়ল। স্ত্রী কি বলছে ? জন-এর পুরোনো হাসপাতালের ফাইল ঘেঁটে দেখল। জন ডিক্টাফোন তুলে কথা বলতে যাবে, ঘুরে-ফিরে ওর কানে আসতে লাগল, ডাঃ রে, দে হ্যাভ স্টোলেন মাই ড্রিম ? ওরা আমার স্বপ্ন চুরি করেছে। (লুইসা কোথায় গেল। না বাজে কথা ভাববে না।) ও বলতে শুরু করল—

কুড়ি বছর ধরে মিঃ লর্ড সাইকিয়াত্রীক চিকিৎসায় আছে। বছর দুতিন বাদে বাদেই এ পেসেণ্টকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

মিঃ লর্ড পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। মা মৃত, বাবা—

ঘণ্টখানেক লাগল রিপোর্ট শেষ করতে। পঞ্চাশ পাউণ্ড ফি।

ঘড়িতে দেখল সাতটা বেজে গেছে। দুটো পেশেণ্টকে দেখতে যেতে হবে। এক কাপ কফি পেলে ভাল হত। ব্যাসিলডনে বাড়ি খুঁজে পাওয়া ভীষণ ঝামেলা। নম্বরের গোলকধাঁধাঁ। নাঃ বেরোন যাক।

ও দরজা বন্ধ করে বেরোতেই ওর আরেক কলিগ এড্রিয়াস-এর সঙ্গে দেখা। ও নতুন ব্যাসিলডনে ঢুকেছে।

কি বাড়ি যাচ্ছ ?

না। তুমি ?

না। গ্রুপ নিতে হবে।

গ্রুপ কিরকম চলছে ?

ভাল। তুমিও একটা গ্রুপ নাও না ?

আমরা বুড়ো হয়ে গিয়েছি। রাণা হেসে বলল, একসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে।

এটা কিন্তু একটু প্যাট্রোনাইজিং হয়ে গেল।

রাণা সঙ্গে সঙ্গে বলল, দুঃখিত। আমি সে ভাবে বলিনি। সাইকোথেরাপী আমার লাইন নয়, এটাই বলতে চাইছিলাম।

গুড নাইট রাণা !

গুডনাইট এড্রিয়াস।

রাণা গাড়ির দিকে যেতে যেতে বলল, গ্রুপ নিলেই গ্রুপ থেরাপিস্ট হয়ে গেল যেন ! মায়ের পেটে বাচ্চা না হয় রিজেণ্টেড হয়েছিল, খবরটা খুঁচিয়ে বার করলে। খবরটা জেনে করবেটা কি ? হাঃ, ইডিপাস কমপ্লেক্স ! ইলেকট্রা কমপ্লেক্স। যত সব !

বাড়ি খুঁজে খুঁজে একটা নম্বর পেল। পেশেণ্ট আর ওর স্বামীর সঙ্গে কথা বলে রাণার ইচ্ছে করল পেশেণ্টকে থাপ্পর মারে, স্বামীকে গালাগাল দিয়ে ভূত বার করে। মেয়ে বিয়ে করে অন্য শহরে এসেছে, দশমাইল দূরে মাকে বাবাকে না দেখে থাকতে পারে

না, স্বামীকে গায়ে হাত দিতে দেবে না, আবার কাজেও যেতে দেবে না। হাউ হাউ করে কান্না। লক্ষী ছাড়া দেশ। বাবাকে বিয়ে করে থাকলেই পারতিস! ডাক্তারদের সময় নষ্ট, ন্যাশনাল হেলথ-এর টাকার শ্রাদ্ধ! জি, পি, (জেনারেল প্রাক্‌টিসনারও) তেমন, ঘ্যানঘ্যানানী না শুনতে পারলেই সাইকিয়াত্রিস্টদের কাছে পাঠিয়ে দাও! রাণা শুকনো গম্ভীর মুখে বলল, ওষুধ লিখে দিচ্ছি। কাঁপুনী কমবে। হাসপাতালের সাইকোলজিস্ট সেক্স-থেরাপী করে যদি রাজি থাক, তোমাদের দেখবে।

বদমায়েস মেয়ের আবার কান্না কাঁপুনি দিয়ে, সে সেক্স-থেরাপী চায় না। মা-বাবার কাছে ফিরে যেতে চায়।

রাণা ঠাণ্ডা ভাবে গুডনাইট করে বেরিয়ে এল। ন্যাকা, প্রেম করে বিয়ে করার সময় মনে ছিল না!

ঘড়িতে দেখল আটটা বাজে। আরেক জনকে দেখতে হবে। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। চাকরি গেছে ছ'মাস হল। এখন হঠাৎ কি হয়েছে। খাওয়া বন্ধ, ঘুম নেই, দিন-রাত হাত কচলে সারা বাড়ি পায়চারী করছে। স্ত্রী আর সহ্য করতে পারছে না। রাণা যেতে ভদ্রলোক বসল, সমানে হাত কচলে যেতে লাগল।

ঘুমের কি অসুবিধা হচ্ছে?

ও শুতে যাবে, শুতে পারে না।—স্ত্রী বলতে গেল।

না, আমি মিঃ জাড-এর থেকে শুনতে চাই। রাণা স্ত্রীকে থামিয়ে বলল।

ঘুম আসে। ঘণ্টা দু তিন বাদেই ঘুম ভেঙ্গে যায়, আর ঘুম আসে না। ডাঃ, আমি সবাইকে ভীষণ বিরক্ত করছি। আমার জন্য শুধু-শুধু আমার স্ত্রী কষ্ট পাচ্ছে।

ওজন কমেছে?

ভীষণ। তিন স্টোন। স্ত্রী-ই আবার বলল।

আর কি অসুবিধা হচ্ছে?

আমার সঙ্গে আর শুতে চায় না। স্ত্রী বলল।

আচ্ছা মেয়েছেলে তো! স্বামীর হয়ে উত্তর সে দেবেই দেবে।

দিনের কোন্ সময় বেশি খারাপ লাগে?

রাণা চেয়ার ঘুরিয়ে মিঃ জাড-এর মুখোমুখি বসে শুরু করল প্রশ্ন।

আমি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। কালকে হাসপাতালে নিয়ে এস। কয়েক সপ্তাহ থাকতে হবে।

আমার জন্য হাসপাতালের বেড ব্লক করবে? আরো কত রুগ্ন লোক আছে যাদের দরকার।

মিসেস জাড কাঁদতে শুরু করল। ও জীবনে কোনোদিনও হাসপাতালে যায় নি। আমাকে ছাড়া এক রাত্রিও থাকে নি।

ভাল হয়ে যাবে। রাণা আশ্বাস দিয়ে বেরিয়ে এল। যাদের হাসপাতালে আসা দরকার তারা আসতে চায় না। এজিটেটেড ডিপ্রেশন—রাণা মনে মনে লেবেল লাগাল।

আঃ, এবার বাড়ি ফিরতে পারবে। লুইসার কোলে শুয়ে ঘুমুবে সে আজকে। একটাও প্রশ্ন করবে না কোথায় গিয়েছিল। কোনো-মতেই ঝগড়া নয়। আর কদিন। খুব ভালবাসবে লুইসাকে।

রাণার ক্লান্তি চলে গেল। সে একসিলেটরে পা চেপে দিল।

বিলারিকি ছাড়িয়ে স্টক-এর রাস্তা জনবিরল, পাব-এর বাগানে মানুষের ভিড়। সন্ধ্যা নেমে আসছে। গাছের রং ঘন সবুজ হয়ে গেছে।

ও ঘরে ঢুকে দেখল লুইসা এক ভারতীয় মহিলার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছে। দেখেই ওর মুখ কালো হয়ে গেল। কত আশা করেছিল লুইসাকে একা পাবে। সে জোর করে ঠোঁটে হাসি এনে বলল, কি সঙ্গী পেয়েছ তাহলে? লুইসা কোত্থেকে এত লোকের সঙ্গে আলাপ করে? শপিংয়ে গেলে দুনিয়ার লোকের সঙ্গে ওর হ্যালো আর মর্ণিং।

লুইসা রাণাকে দেখেই বুঝল ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট। কেন? একজন মেয়েছেলের সঙ্গেও সে কথা বলতে পারবে না? সে না বোঝার ভান করে বলল, এ মালা—প্রাইমারি স্কুলের টিচার, আর আমার স্বামী—রাণা।

মালা হাত তুলে নমস্কার করল।

আপনি বাঙালী?

বাঃ, দেখে বুঝতে পারছেন না?

রাণা বলল, না।

দেখে কি করে বুঝবে, কাফতান পরে এসেছে। এ তো কালো-সাদা সবাই পরে আজকাল।

লুইসা বলল, তোমরা গল্প কর। আমি খাবার দিচ্ছি টেবিলে। একটা হুইস্কি দেব?

দাও। রাণা সোফাতে বসে বলল।

মালা সিগারেট ধরিয়ে বলল, খুব খাটুনি দেখছি আপনাদের!

রাণা কারুরই, বিশেষ করে বাঙালী মেয়েদের সিগারেট খাওয়া পছন্দ করে না।

রাণা লুইসার হাত থেকে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে 'থ্যাঙ্ক' বলে উত্তর দিল, তা একটু আছে। আপনি কতদিন আছেন স্টকে?

বছর তিনেক হল।

কখনো দেখি নি তো!

আমরা ও পাড়ার মানুষ। মালা হেসে বলে। আমার স্বামীও টিচার।

কি নাম ভদ্রলোকের?

টিমোথী। টিম বলে ডাকি আমরা। উনি একটা কোর্সে গেছেন লণ্ডনে। এক সপ্তাহের জন্যে। মালা বাংলায় বলল।

বিয়ে করেছে ইংরেজ, ভাষাটা মা-দিদিমার মতো দেখছি। রাণা মনে মনে বলল।

এক্সকিউজ মি। আমি একটু জামা কাপড় ছেড়ে আসছি।

রাণা রান্নাঘরে গিয়ে গোড়ালিতে ভর করে দাঁড়িয়ে অনুযোগের স্বরে লুইসাকে চুমু খেয়ে বলল, তোমাকে ভেবেছিলাম একলা পাব!

লুইসা নিজেকে সংযত করে ছেলেমানুষকে বোঝাবার মতো করে বলল, আমি তো সব সময় তোমার জন্যে একা একা থাকি। শুধু আজকে মালা এসেছে।

আমি তো ক-দিন পরেই চলে যাব। আমি স্নান করে আসছি।

খাবার যে দিয়ে দিলাম!

নাঃ ভীষণ গরম লাগছে। তোমরা খেতে বস।

ঠিক আছে। লুইসা বিরক্তি সামলে বলল। কবে রাণা বাড়ি ফিরে স্নান করে? শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এনেছ বন্ধু, আমাকে ছাড়াই খাও।

বেশ।

মালা এস।

রাণা আসুক।

ও গরমে অস্থির, স্নান করে নিচ্ছে।

আমরাও অপেক্ষা করি একটু তা হলে।

আচ্ছা, ঠাণ্ডা খেতে যদি আপত্তি না থাকে।

একটুও না। তুমি দেখি খুব কারি তৈরি করতে শিখেছ।

বাঃ, ভারতীয় বিয়ে করেছি, শিখতে হবে না? আর তুমি?

আমিও তোমাদের রান্না একটু একটু শিখেছি। টিমার মা শিখিয়েছে, ছেলের কষ্ট হবে ভেবে। মালা হেসে বলল।

খাওয়ার শেষে লুইসা বলল, রাণা তোমার আপত্তি আছে, মালা যদি আজ রাতে আমাদের বাড়িতে থাকে?

না। রাণা সংক্ষেপে বলল, ফ্রুট স্যালাড খেতে খেতে। আমি আর আর কফি খাব না। শুতে যাচ্ছি। কিছু মনে কর না মালা।

না না, শুতে যাও। আমরা বেশ গল্প করব।

রাণা চলে গেল।

তোমার স্বামী বেশ গম্ভীর। ডাক্তাররা বড় গম্ভীর হয়, না ?

লুইসা নিজের মনে মনে বিরক্ত হয়। মুখে বলল, আজ খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওকে। বড় খাটুনি ওদের। চল, বাসন মেজে ফেলি। কফি খাবে তো ?

খাব। আমি তৈরি করছি। আমি কিন্তু ফিরে যাব কফি খেয়ে।

কেন ? রাণা গম্ভীর বলে ?

না না সেজন্যে নয়। ও চলে গেলে একদিন আসব।

ঠিক আছে। লুইসা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। শান্তি ফিরে আসুক বাড়িতে।

রাণা শোবার ঘরে না ঢুকে স্টাডিতে ঢুকল। বুক পকেট থেকে চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে আবার লিখতে বসল, ডিয়ার মিঃ—

লুইসা ওকে এড়িয়ে চলে কেন ? আর তো মাত্র চারটা দিন। ওর ইচ্ছা করে না স্বামীর কাছে কাছে থাকতে ? কেন, করে না ? বন্ধু আনার কি দরকার ? ও কলকাতায় চলে গেলে তো যত খুশি বন্ধু আনতে পারত। রাণার জন্যে ওর এতটুকু ভালবাসা নেই। কেন ? কেন থাকবে না ? ওর ইচ্ছা করতে লাগল, মালাকে ঘাড় ধরে বার করে, লুইসাকে চুলের ঝুঁটি ধরে উপরে তুলে এনে কাপড় খুলে বিছানায় শুইয়ে দেয়! এত উপেক্ষার স্পর্ধা কেন হবে ?

কিন্তু রাণা ভদ্র, রাণা উন্মাদ নয়, রাণা ডাক্তার! রাণা দেশে যাচ্ছে। নোংরা কলকাতার রাস্তা আর ধুঁয়ো-মাখা নীল আকাশ জড়িয়ে ধরবে ওর বুকে। রাণার চোখ জ্বালা করতে লাগল।

সাত

রাত নটাতেও দিনের আলো ঝলমল করছে। আজকে সত্যি গরম পড়েছে। এদেশে বাড়ি-ঘর শীতের জন্যে তৈরি, হাওয়া ঢোকে

না, হাঁস-ফাস করতে হয়।

মলি ঘরে ফিরেই। পাটিও ডোর খুলে দিল। দীপক কি করছে, সাড়া শব্দ নেই যে! আঃ, কি আরাম! যোগাসনের ক্লাস করে শরীরটা হালকা লাগছে, কিন্তু ক্লান্তও লাগছে।

ও রান্না ঘরে গিয়ে দেখল কিচেন-টেবিলে দীপক নোট লিখে গেছে—লুইসা খুব আপসেট। আমি ওকে দেখতে যাচ্ছি। তুমি খেয়ে নিও। দেরি হলে ফোন করব।

লুইসার আবার কি হল? লুইসা যে কোনোদিন কোনো কিছুতে ভেঙ্গে পড়তে পারে সে তো ভাবতেই পারে না। নার্সদের মতো ওর চটপটে ভাবভঙ্গি প্র্যাকটিক্যাল। রাণার কিছু হল না কি দেশে? যা গরম এখন দেশে। যাক গে, ভেবে কি হবে। খেয়ে তো নেওয়া যাক্।

ও স্যালাড আর চিজ নিয়ে খেতে বসল। একা একা খেতে ভাল লাগে না। দীপক নিশ্চয় রান্না করার সময় পায় নি। আশা করি বুদ্ধি করে কিছু খেয়ে গেছে।

ফোন বেজে উঠল। ফাইভ থ্রি এট নাইন!

ময়লা, আমি স্টক থেকে বলছি, দীপক বলল ইংরেজিতে, আমি লুইসাকে নিয়ে আসলে তোমার আপত্তি আছে? আমাদের কাছে যদি দু-চার দিন থাকে?

একটুও আপত্তি নেই। কি হয়েছে?

পরে বলব। দীপক বাংলায় বলল। ইংরেজিতে, ঘণ্টা খানেক পরে দেখা হবে। খেয়ে নিয়েছ তো?

তোমরা খাবে তো?

দীপক লুইসার সঙ্গে কথা বলে বলল, আমি খাব। লুইসা খাবে না বলছে।

স্যালাড খেতে হবে কিন্তু।

ঠিক আছে। পরে দেখা হবে।

লুইসা আর দীপক ফিরে এল প্রায় রাত এগারোটায়। লুইসাকে দেখলে মনে হয় না বিশেষ কিছু হয়েছে, চোখটা একটু বসা। এই যা।

কফি খাবে? না হুইস্কি দেব?

ব্রাণ্ডি আর কফি দুটো হলেই ভাল।

কিছু খাবে তো আগে।

একটা টোস্ট দিতে পার। তোমার ওপর খুব উৎপাত করছি।

বাঃ, উৎপাত আবার কি? বন্ধু থাকে কেন? মলি দীপকের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার খাবারও নিয়ে আসছি।

চল, আমিও হাত দিচ্ছি।

না, না, তোমরা বস। আমার সব তৈরি আছে।

দীপক প্রাণ থেকে বলল, থ্যাঙ্কস। বলে সোফায় গা এলিয়ে দিল।

ট্রে-তে করে খাবার, টোস্ট ড্রিংকস্, কফি তৈরি করে মলি টেবিলে রেখে বসল।

ও নিজের জন্যেও কফি এনেছে।

তুমি ব্রাণ্ডি নিলে না? লুইসা সহজ গলায় বলল।

না, ব্রাণ্ডি খেলে রাত্তিরে আমার ঘুম আসে না।

আমি দু-একদিন থাকলে তোমার অসুবিধা হবে না তো?

দু-একদিন কেন, যতদিন ইচ্ছা থাক না। ঘর তো আমাদের পড়েই আছে।

ইউ সি, লুইসা হাতে ধরা ব্রাণ্ডির গ্লাসে চোখ রেখে বলল, মা-বাবার কাছে এখনই যেতে পারছি না। এখন শুনলে সহ্য হবে না। আই টোল্ড ইউ সো, তোমাকে বলেছিলাম না?

রাণার কিছু হয়েছে কি? মলি সাবধানে কথা খুঁজে খুঁজে জিজ্ঞেস করল।

কিছু হয় নি। আমাকে ছেড়ে ও দেশে পালিয়েছে।

মলি কিছু বুঝতে পারল না। ও দীপকের দিকে তাকাল। দীপক ভীষণ মনোযোগ দিয়ে লেটিস পাতা খাচ্ছে। লুইসার মাথা ঠিক আছে তো? সাইকিয়াট্রিস্টের স্ত্রী শত হলেও পাগলদের ডাক্তার হয় নিজেরা পাগল হয়, না হয় তো বৌদের পাগল করে।

কি বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ আমি পাগল হয়ে গিয়েছি? লুইসা একটু হেসে বলল।

না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মলি স্বীকার করল।

বুঝতে কি আমিই পারছি? বুঝলে তো—লুইসা থেমে গেল। ওর চোখে জল আসতে চাইছে। ও ব্রাণ্ডি খাচ্ছে। কফি খাচ্ছে।

তোমরা শুতে যাও। আমাকে ঘরটা দেখিয়ে দিও।

একদিন না হয় দেরি করেই শোব। মলিই বলল।

তোমাদের কাল কাজ আছে না?

কাজ তো রোজই আছে। কি লিখেছে রাণা?

রাণা তো আমাকে লেখে নি। হাসপাতাল থেকে মাইনের টাকা আর চিঠি এসেছে—ইওর রেজিগন্যাশন ইজ রিগ্রেটফুলি একসেপ্‌টেড আণ্ডার দি সারকামস্ট্যানসেস…

জান, যাবার চার দিন আগে ও রিসাইন করেছে। লুইসা চুপ করে গেল। সেই সুন্দর আবেগ ভরা ভালবাসার রাতে, ফোন বেজে উঠেছিল, লুইসা টের পেয়েছিল, রাণা বিছানা ছেড়ে উঠে যাচ্ছে। ভেবেছিল, হয়তো হাসপাতালে যাওয়াই স্থির করেছে। কিন্তু ও বাড়িতেই ছিল। কি করে সেই রাতে সে রিজাইন করতে পারল? পরের তিনদিন তো স্বপ্নের মতো চলে গেছে। সে কী ভালবাসা! যেন তিন সপ্তাহের উপবাসী পুরুষের প্রেম। সে কি তখন জানত, এ কেবল তিন সপ্তাহ নয়। ঠাট্টাও করেছে সে—মনে হচ্ছে, যেন আর ফিরে আসবে না!

বলা তো যায় না যদি প্লেনে অ্যাকসিডাণ্ট হয় ?

ভালই তো হবে, মোটা ইনসেওরেন্স পাব।

হুঁ, সুখী বিধবা হবে।

এই বুড়ো বয়সে বিধবা হয়ে লাভটা কি···

তোমার দেহে এখনো যথেষ্ট যৌবন আছে।

তুমিই কেবল দেখ আমার যৌবন ! ভাগ্যিস দেখ !

রাণা লোভীর মতো লুইসার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তোমার শরীর আমাকে পাগল করে দেয়।

লুইসা আবেগে নরম হয়ে নিজেকে সঁপে দিল।

মলি চোখ নামিয়ে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগল।

রাণা চোরের মতো পালিয়ে গেছে। আমাকে বলে যাবার সাহস হয় নি !

তোমাকে গিয়ে চিঠি দেয় নি ?

দিয়েছে একটা। এখানে ভীষণ ব্যস্ত। তোমাকে মিস করছি।

হয়তো তোমাকে লিখবে দেশে চলে যেতে।

আজকে রাণা ফোন করেছিল কলকাতা থেকে। লুইসা আবার স্বাভাবিক গলায় বলতে লাগল। ফোন করেই বলল, কেমন আছ ?

আমি বললাম, ভাল। তুমি কেমন আছ ? তুমি রিজাইন করে গেছ ?

হ্যাঁ।

চুপচাপ।

অন্য কোথাও চাকরির খবর পেয়েছ বুঝি ?

না।

চুপচাপ।

তবে কি ? কবে আসবে ?

আমি আর ফিরব না।

তার মানে ?

আমি কলকাতায় থেকে যাব।

আমি কি করব ?

চুপচাপ।

রাণা ?

হ্যাঁ শুনছি। আমাদের একসঙ্গে থাকার আর কোনো মানে হয় না। আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। এখানে থেকে কাটিয়ে উঠতে হবে!

কি বলছ তুমি ?

তুমি আমাকে এয়ারপোর্টে দিতে আসলে না! রাণা যেন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল।

বলছ কি তুমি ? তুমিই তো ভীষণ আপত্তি করলে! আমি এয়ারপোর্টে গেলে নাকি তোমার পা চলবে না। তুমি যেতে পারবে না। তোমার সব মিথ্যা কথা। সব মিথ্যা!

তুমি মিথ্যা লুইসা। আমি মিথ্যার সঙ্গে বাস করছিলাম এতদিন। আমার এখানে অনেক কাজ। এখন ছেড়ে দিচ্ছি!

লুইসা মলির দিকে তাকিয়ে বলল, লক্ষ্য কর, এখন ছেড়ে দিচ্ছি। বলল না কেন, সব শেষ। তোমার যা ইচ্ছা কর? 'এখন' এখন মানে কি? এর পরে সে কি বলবে ?

তুমি ওকে ফোন কর না। মলি হতভম্ব হয়ে বলল।

ডিরেক্টটিতে ফোন করেছিলাম। ওদের বাড়িতে ফোন নেই।

দাদার বাড়িতে ?

কেউ উত্তর দেয় না।

মলি একটু পরে বলল, নিজেকে বোঝানোর মতো করে, আমাদের দেশের লোকদের জান তো! কে কি বলেছে। হয়তো মন বিগড়ে গেছে। দু দিন পরে ঠিক হয়ে যাবে। মলি আশা ভরে দীপকের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি বল, সত্যি না!

দীপক কোন উত্তর দিল না।

লুইসা দীপকের হয়ে বলল যেন, তোমাদের দেশের লোকদের ভারতবর্ষে তো আমি দেখি নি। এখানেই যা পরিচয়। যতটুকু রাণাকে বুঝেছি, কে কি বলল ওতে ওর মন চট করে বদলায় না। তা ছাড়া রিসাইন তো কলকাতায় যাবার আগেই করে গেছে। ও মন ঠিক করেই গেছে।

তাও একটা কথা। মলি মনে মনে ভাবল। কিন্তু তাও দিশা করতে পারল না। রাণা তো পালিয়ে যাবার পাত্র নয়।

এখন আরেকবার চেষ্টা কর না ট্রাঙ্ককল বুক করে!

দীপক উঠে এতক্ষণ পরে গলার স্বর ফিরে পেয়ে যেন বলল, করব? রাত্তিরে লাইন তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়।

কিন্তু তোমাদের টেলিফোন—

সেজন্যে তুমি চিন্তা কর না তো! মলিই বলল।

দীপক ফোন বুক করতে গেল। মলি এক ঝলক লুইসাকে দেখে নিয়ে ভাবল, মহিলা কি কাঁদতেও জানে না! আমি হলে তো এতক্ষণ দাপাদাপি শুরু করে দিতাম।

মলি আবার কফি করতে গেল। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে মলি বলল, দীপক, তুমি শুতে যাও না। না হলে কাল খুব কষ্ট হবে তোমার।

দীপক কৃতজ্ঞতায় মলির দিকে তাকিয়ে বলল, যদি কিছু দরকার হয় ডেক।

যদি রাণা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়?

ডেকে দিও। কোনো অসুবিধা হবে না। দীপক উপরে উঠে গেল। ওর চোখে-মুখে চিন্তার রেখা যেন ধাঁধাঁর উত্তর পেয়েও পাচ্ছে না।

তোমারও তো কাল কাজ আছে?

আছে, কাল দেরিতে শুরু।

চুপচাপ। অপেক্ষা। কখন ফোন বাজবে। জান, লুইসা বলল কোনোদিকে না তাকিয়ে, আমি কোনোদিনও সহ্য করতে পারি না এই না-জানা অপেক্ষা করা। কখন ফোন বাজবে পনেরো মিনিট পরে বা পাঁচ ঘণ্টা পরে? ফোন পেলেই বা কি? ও ওখানে থাকবে! প্রশ্ন আছে সঠিক উত্তর নেই।

সঠিক উত্তর তো ক্লাস-রুমে মাস্টাররা দেয়। মলি একটু হেসে বলল, জীবন তো দেয় না।

জানি দেয় না। দিলে ভাল হত। হয়তো বা হত না। আমি কিন্তু নিশ্চয়তার শান্তি ভালোবাসি। জানা দরকার আমার।

তোমরা কি ঝগড়া করেছিলে রাণা যাবার আগে?

সেটাই তো মজা। লুইসা 'মজা'র চিন্তা করে একটু বিকৃতভাবে হাসল, যাবার সাতদিন আগে থেকে ভীষণ ভালবাসার আবেগ ভরা শান্তি। তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল—। আচ্ছা, তোমরা ঝগড়া কর না?

আমি করি এক তরফা। দীপক করে না।

আমি ভাবতাম আমি ঝগড়া করতে পারি না। কিন্তু ভীষণ পটু হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মধ্যে যে এত রাগ, নীচতা ছিল আমি নিজেই জানতাম না। হয়তো রাণাও নিজেকে জানত না। লুইসা আরেকটু ভেবে বলল, আমরা একই মানুষ, অথচ ভিন্ন মানুষের সঙ্গে আমরা ভিন্ন চরিত্র হয়ে যাই। তুমি লক্ষ্য করেছ?

মলি চুপচাপ ভেবে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। একজন মানুষ আমার ভাল দিকটা দেখে, অন্য মানুষ শুধু যেন খারাপটা। অথচ—

ফোন বেজে উঠল। লুইসা পাথরের মতো বসে বলল, মলি তুমি ধর। আমার ইংরেজি ওরা হয়তো বুঝবে না।

মলি ইতস্তত করে বলল, আচ্ছা।

পারসন টু পারসন। মিসেস রায় কি?

ডেকে দিচ্ছি।

মলি লুইসাকে ইশারায় ডেকে ট্রে নিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল।

কে রাণা ? জোরে বল। শুনতে পাচ্ছি না।······হ্যাঁ।······ আমি দীপক-মলির বাড়িতে আছি।······তুমি পরিষ্কার করে বল তোমার মনের ইচ্ছাটা কি ? কি বললে······আমি তো অপেক্ষা করেই আছি তোমার যাওয়ার দিন থেকে।······কি বলছ······। আর ফিরবে না ?······ঠিক আছে। ভালমত থেক। তুমি আমার সম্বন্ধে নতুন কিছু আবিষ্কার করেছ ? কি ?······ঠিক আছে। দরকার নেই জানার। গুড বাই।

লুইসা ফোন রেখে সোফায় বসে ব্রাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিল। মলি ফিরে এসে দেখল লুইসা শান্ত মুখে বসে আছে।

কি বলছে রাণা ?

ও আর কোনদিনও ফিরবে না। চল শুতে যাওয়া যাক।

মলির আর কিছু জিজ্ঞাসা করার ভরসা হল না। সে বলল, চল, তোমার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

পরের দিন মলি কাজ থেকে ফিরে এসে দেখল লুইসা ছোট একটা চিঠি রেখে গেছে আতিথেয়তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে। আশ্বাস দিয়েছে তার জন্যে চিন্তার কারণ নেই। না-জানা অবস্থাটা তার সহ্য হচ্ছিল না। এখন জেনেছে, সুতরাং এখন থেকে সে নিজের জন্যে ভাববে। সলিসিটরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। পরে একদিন ফোন করবে।

মলির বড় ক্লান্ত লাগছিল অতরাত অবধি জেগে। সে সোফাতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

দীপক ঘরে ঢুকে দেখল মলি ঘুমোচ্ছে। বেচারা! সে রান্না ঘরে ডাল ভাত চাপিয়ে দিল। ডিম সেদ্ধ মাখন দিয়ে খেলেই হবে। লুইসা কোথায় ?

মলি ঘুম ভেঙ্গে বলল, কি আমাকে ডাক নি কেন ?

তুমি এত আরাম করে ঘুমোচ্ছ। কাল যা গেছে।

সে তো তোমারও গেছে।

লুইসা কোথায় ?

চিঠিটা পড় নি ? পড়।

দীপক পড়ে বলল, আমার বোধহয় রাণার সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল।

ওরা কিচেনেই খেয়ে নিল। অন্য দিনের মতো টি. ভি. দেখতে দেখতে খাওয়া শেষ করল না।

কী রকম বন্ধু তোমার রাণা ?

রাণাকে বোঝা বড় শক্ত। ও দুনিয়ার লোকের মনের কথা শুনত, কিন্তু নিজের কথা কিছুতেই বলবে না। বিয়ের আগের দিন আমরা জানতে পেরেছিলাম ওরা প্রেম করছিল এত দিন ধরে।

ওরা দু জনে দু জনকে পছন্দ করল কি করে তো বুঝি না। সব দিকে ওরা ভিন্ন। লুইসা দশ বছরের বড়, ওর থেকে প্রায় এক-হাত বেশি লম্বা।

লুইসার সঙ্গে যখন রাণাকে দেখেছি, সে জন্যে আমরা বুঝতেই পারি নি। লুইসা সবসময় বকা ঝকা দিয়ে রাণাকে ঠিক রাখত। অনেকটা দিদির মতো যেন।

বলে গেল না ভদ্রলোক!

মানুষের মনে কি হয় কে জানে! দীপক উত্তর দিল।

তুমি কোনোদিন এমন ভাবে উধাও হয়ে যেতে পার ?

দীপক হেসে গম্ভীর ভাবে বলল, উধাও হবার কথা মনে তো আসে নি কোনোদিনও। তুমি পার ?

আমার মনেও আসে নি। অনেক সময় রাগ হলে মনে হয়েছে—দুত্তোর, ডিভোর্স করে চলে যাব।

সত্যি ?

তোমার কোনোদিনও মনে হয় নি ডিভোর্স-এর কথা।

আমি তো সেকেলে শ্যামবাজারের বাঙালী। ডিভোর্স-এর চলতি হাওয়া আমার মাথার মধ্যে আসে না। কাজ করতে গিয়ে এত ডিভোর্স দেখি, মনে হয় লোকে বিয়েই বা করে কেন?

ডিভোর্স করার সাহসও তো দরকার।

সে কথা সত্যি। আজকে বড় একটা খারাপ কেস দেখেছি অ্যাসেসমেণ্ট ক্লিনিক-এ। মনটা খারাপ হয়ে গেছে।

কি দেখলে?

একটা দেড় বছরের বাচ্চা ছেলেকে মা এমন মারা মেরেছে যে ব্রেন ড্যামেজে ছেলেটা সব্জি হয়ে গেছে।

সে কি? ভাল হবে না?

না। ব্রেন ড্যামেজ বললাম যে। অথচ—ভদ্রমহিলা বিবাহিত, স্বামীও সব জানে—

কি করে এ-দেশের মা বাবারা এমনভাবে মারে বল তো?

আমাদের দেশেও মারে। ব্যাটারড চাইল্ড সিনড্রম এখনো আমাদের দেশে ধরা পড়ে নি। মানুষের জীবন বড় সস্তা ভারতবর্ষে। কে ধার ধারে? মা বাবা তো মারবেই, শাসন তো করবেই, আমরা ধরেই নিই। চল ওঠা যাক। চা খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব আজকে। ঘুম পাচ্ছে।

লুইসাকে একটা ফোন করব?

আজকে ছেড়ে দাও। ও বোধ হয় একলা থাকতে চায়।

অদ্ভুত মেয়েছেলে বটে। কান্নাকাটি নেই। কি শান্তভাবে সব নিল। ইংরেজদের মনোবল আছে।

না গো। ওরা তোমার আমার মতোই দুর্বল। লোকের সামনে সহজে ভেঙ্গে পড়ে না, এই যা। জমা করে রাখে ডাক্তার আর সোশ্যাল ওয়ার্কারদের জন্যে।

তোমার সামনে কেঁদেছে লুইসা?

কেঁদেছে। কাল যখন দেখা করতে গেলাম। মেয়েছেলে

কাঁদলে বড় অস্বস্তি লাগে।

যাও। আমি চা করে আনছি।

তোমার দিন কেমন গেল?

কেমন আর যাবে? একজনের পা নেই, অন্যজনের হাত। একজনের এক দিক পড়ে গেছে, অন্যজন উইলচ্যার ছাড়া চলতে পারে না। তবু, মানুষের মনের জোর ভীষণ, না?

হুঁ। তোমাকে বলতে ভুলেই গিয়েছি। আমার খুড়তুতো বোনের জামাই একটা কোর্স করতে আসছে।

তাই নাকি! কবে? এখানে এসে থাকবে?

দেখা যাক। তোমার আপত্তি আছে?

না, ভালই তো হবে, বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। ঘর খালি পড়ে আছে।

তোমার খুব মন কেমন করে?

তোমার করে না? মলি পালটা প্রশ্ন করে।

সয়ে গেছে। স্বীকার করে নিয়েছি ছেলেমেয়ে বড় হলে চলে যাবে।

মলি হাই তুলে বলল, আমি শাওয়ার নিতে যাচ্ছি। তুমি শুয়ে পড়।

অর্থাৎ এ-সব আলোচনা থাক।

একসঙ্গেই না হয় শুতে গেলাম।

গা প্যাচ প্যাচ করছে। স্নান না করলে ঘুমুতে পারব না।

আজকের মতো তোলা থাকল স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক।

আট

ব্যাসিলডন থেকে ছ মাইল দূরে স্টক নামে গ্রামে রাণা আর লুইসা বাসা বেঁধেছিল। স্টক-এর পুরনো বাসিন্দাদের নাক উঁচু, তারা সহজে নতুন লোককে স্বীকার করে নেয় না। একদিকে সেকেলে

বাগান ঘেরা পুরনো ম্যানসন অথবা বাংলো প্রায় তার উলটো দিকে কাউন্সিল এস্টেট তুলেছে। বেশির ভাগ বাসিন্দাই ওয়ার্কিং ক্লাসের। এ পার। ও পার। এ পাড়ার ছেলেমেয়েরা ও পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মেশে না। কখনো হয়তো পার্কে একসঙ্গে খেলা-ধুলো করে, কিন্তু একে অন্যের বাড়িতে খেলতে যায় না।

প্রাইমারি স্কুলে কিছু কিছু ম্যানসনের বাচ্চারাও যায়। তারপরেই ভাগ হতে শুরু করে। এ পাড়ার ছেলেমেয়েরা যায় প্রাইভেট স্কুলে, ও পাড়ার ছেলেমেয়েরা কম্প্রিহেন্সিভ স্কুলে।

রাণা কনসালট্যান্ট, সুতরাং ওদের বাড়ি এ পারে। তাই বলে মাখামাখি একটুও নেই। দু-একবার ককটেল পার্টিতে ওদের নিমন্ত্রণ হয়েছে, রাণা যায় নি। লুইসাও জোর করে নি। ওরও কিন্তু ইচ্ছা নেই নাক উঁচু লোকদের সঙ্গে স্মল টক্ করে সন্ধ্যা কাটানোর। ওদের একটু আগেই রিচার্ড সিনিয়র কনসালটেন্ট-এর বাড়ি। সেই রিচার্ডের কাছেই লুইসা খবর পেয়েছিল, রাণা রিসাইন করে গেছে। জানতে এসেছিল, রাণা মন পালটেছে কিনা।

রিচার্ড-এর স্ত্রী ক্ল্যারা আজকে ফোন করেছিল লুইসাকে সন্ধ্যাবেলা এসে খেতে। লুইসা অজুহাত দিয়ে না করেছে। নিমন্ত্রণ নেয়া মানে ওদের দায়গ্রস্ত করা। এ দেশে খেতে ডাকা মানে জোড়ায় ডাকা। ও একা গিয়ে ওদের শুধু বিব্রত করা ছাড়া কিছু নয়। খাবার টেবিলে সকলের সঙ্গে বসে হেসে হেসে কথা বলতে হবে। খাওয়ার পরে হয়তো ক্ল্যারা চেষ্টা করবে একা একা লুইসাকে 'সাহায্য' করতে। মন খুলে বল, ব্যথা, বেদনা, রাগ, তিক্ততা সব উজাড় করে দাও। কিন্তু লুইসার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করল না রিচার্ড বা ক্ল্যারাকে তার প্রাণ উজাড় করে দিয়ে কথা বলতে।

ওদের বাগান গাছে ঢাকা। লুইসা সারা দুপুর সূর্যস্নান করে একটা লম্বা ঠাণ্ডা ড্রিংক নিয়ে বসল। সিগারেট ধরাল।

ও হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দরজার দিকে। মনে হল, রাণা এক্ষুণি ঘরে ঢুকে টাই খুলে ছুঁড়ে ফেলে ওর দিকে আসতে আসতে বলবে, সিগারেট রাখ চুমু খাব।

প্রায় সমস্ত সিগারেটটা নিবিয়ে সে আরেকটা সিগারেট ধরাল। রাণা কি বলত আর না বলত, তার কিছু এসে যায় না।

লুইসা সোফায় মাথা রেখে চোখ বুজে মনের ধোঁয়াটে আয়নায় নিজেকে দেখতে বসল।

রাণা চলে গেছে, যেন বুকের লোহার ভারটা নেমে গেছে। সমস্ত শরীরে ওর হালকা আরামের স্বস্তি ফিরে এসেছে। অথচ অন্য দিকে ওর প্রাণটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। শীতের মাঠের মতো খাঁ খাঁ করছে। একই মনে ভার নেমে-যাওয়া স্বস্তি আর একাকীত্বের শূন্যতা কি থাকতে পারে! ও কি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল রাণাকে ছাড়াও ওর জীবন চলতে পারে, চলবে। কতদিন নিজের ওপরেই রাগ করে ভেবেছে, ধুত্তোর দুটো জীবন নিয়ে এ কি নিষ্করুণ ছেলেখেলা করছে সে। পালাও লুইসা, পালাও। সে তো বাসা চেয়েছিল, কারাগার তো চায় নি; সে ভালবাসা চেয়েছিল, হিংস্র প্রেমের বিকার তো চায় নি। প্রতি পদে পদে সন্দেহ, অবিশ্বাস। কিন্তু রাণা তার জীবনে নেই ভাবতে প্রাণটা হাহাকার করে উঠল। এ কেমন ধরনের ভালবাসা? অত্যাচারিত হওয়া আর অত্যাচার করার আনন্দ।

রাণা চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে বুঝতে পারে নি জীবন কত অসহ্য হয়ে উঠেছিল, দু জনেরই। কতবার লুইসা মনে মনে কান্নায় ভেঙে বলেছে, তুমি চলে যাও। লিভ মি এলোন। আমাকে একা থাকতে দাও। মনে হত সে যেন বৃদ্ধা হয়ে গেছে, যৌন আবেগ সহ্য করতে পারে না। কিন্তু রাণা চলে যাবার পর থেকে তার দেহের যৌনতা ওকে বড় কষ্ট দিচ্ছে। রাণা কোথায়? কেন মানুষের মন, ইচ্ছা, আবেশ এত বিভ্রান্ত।

রাণা ওকে প্রায়ই বলত, তুমি বিভ্রান্ত। তুমি নিজেই জান না, কি চাও; কাকে চাও। কখন চাও।

রাণা যদি এত পরিষ্কার বন্ধু হবে, তবে ওকে বিয়ে করার মতো ভুল করল কি করে? কেন এ দেশে থেকে গেল? রাণা তো ভুলেও কোনোদিন এ দেশকে ভালবাসে নি। তবে ফিরে যেতে ভয় পেত কেন? বোনের বিয়ের অজুহাতে পালিয়ে গেল কেন? যাবে না কেন? ও নিশ্চয় শুনতে পেয়েছিল লুইসার বোবা চিৎকার—চলে যাও। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও।

রাণার মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। যেন চড় খাওয়া জেদী ছেলের মুখ, কিছুতেই চোখে জল আসতে দেবে না।

বুড়ো খোকা হয়ে থেক না চিরকাল। বয়স্ক হও।

তোমার মতে চললেই বুঝি বয়স্ক হওয়া হয়। আগে আগে জাতের ধাক্কা দিয়ে বলত তোমাদের।

তুমি মানুষের মনের চিকিৎসা কর। নিজের মনের দিকে কখনো তাকাও না? একে কি বলে? লুইসা রাগত ভাবে বলতে শুরু করল, ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরলে রং নাম্বার বলে লোকটা ছেড়ে দিল। তুমি ভাবলে নিশ্চয় আমার বয়ফ্রেণ্ড ফোন করছিল।

সে তো ঠাট্টা করছিলাম। রাণা হাসার চেষ্টা করে বলে।

ঠাট্টা! তুমি ঠাট্টা করতে জান? সেদিন কি করলে। ইনসিওরেন্সের লোক আসল, আমি দরজা খুলে বললাম দরকার নেই। তুমি বাথরুমের পর্দা সরিয়ে দেখলে এক ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে দরজা থেকে। মুখ লাল করে নেমে এসে বললে, ও কে?

কে, কে? আমি বললাম।

ঐ লোকটা? কি চায় তোমার কাছে? ইনসিওরেন্সের লোক। তোমার কাছে কি চায়? কত জবরদস্তি প্রশ্ন।

তুমি সারাজীবন পুরুষ-বন্ধু করে বেড়িয়েছ, দোষটা আমার হল।

যখন করেছি, তখন করেছি। তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী?

তুমি বুঝবে না।

আমি বুঝতে চাইও না। তোমার নিজের সন্দেহের আগুনে তুমি সারাজীবন জ্বলে-পুড়ে মরবে। দেখ তুমি। কদর্য মন তোমার।

তুমি আমাকে অভিশাপ দিচ্ছ?

স্টেটমেণ্ট অফ ফ্যাক্ট বলছি।

লুইসা!

ছাড় আমাকে! ছাড়। আমার গায়ে হাত দিও না। লিভ মি এলোন!

রাণা ওকে একা ফেলে চলে গেছে। সূর্য-পোড়া শরীর রাণার লোভী হাত আর খুঁজে বেড়াবে না আবেগের আনন্দ। সে এক স্বস্তি আর শূন্যতায় ডুবে গেল।

দরজায় বেল পড়ল। লুইসার ইচ্ছে করল না উঠে দরজা খোলে। কারুর সঙ্গে তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। আবার বেল বাজল। লুইসা উঠে ফ্রক গায়ে চাপিয়ে দরজা খুলে দিল, আরে রিচার্ড এস, এস।

তোমার অসুবিধা করলাম না তো!

না, এস। বস। কি দেব বল?

ড্রাই মার্টিনী দিতে পার একটু জিন দিয়ে। অনেক বরফ।

ড্রিঙ্ক তৈরি করে লুইসা পাশের সোফাতে বসল।

ক্ল্যারা আমাকে পাঠিয়েছে। তুমি এলে না। ও বলল, তুমি কেমন আছ দেখে আসতে।

ধন্যবাদ। আমি ভাল আছি রিচার্ড। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছিলাম।

লুইসা রিচার্ডের চোখের দিকে তাকিয়ে আচমকা হেসে উঠল, এক্স কলিগের স্ত্রী ভাবছ শোকে হঠাৎ পাগল হয়ে যাচ্ছে? স্বামী পরিত্যক্ত স্ত্রী স্বাভাবিক ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা তো স্বাভাবিক নয়!

লুইসা, রিচার্ড একটু ঝুঁকে বলল, তুমি বুদ্ধিমতী। আমাদের নাক গলানোর কোনো অধিকার নেই জানি। কিন্তু যদি কিছু দরকারে আসতে পারি—

লুইসার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। ওর খুব ইচ্ছা করল, রিচার্ডের বলিষ্ঠ দুই হাতে মাথা রেখে কাঁদে। রাণার ছোট্ট বুকে মাথা রেখে ও কোনোদিনও সান্ত্বনা পেত না, শান্তি পেত না।

লুইসা উঠে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার গলায় বলল, দাও, গ্লাস দাও ভরে আনছি।

রিচার্ড স্বস্তিতে সোজা হয়ে বসে। ওর ছ-ফুট শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, ধন্যবাদ। এবার ফিরতে হবে। কিছু দরকার হলে কোনো দ্বিধা না করে ফোন কোরো বা চলে এসো।

ইউ আর ভেরি কাইণ্ড রিচার্ড! গিভ মাই থ্যাঙ্কস টু ক্ল্যারা। আমি ফোন করব খন।

রিচার্ড চলে গেল। রিচার্ড আর রাণা পাশাপাশি দাঁড়ালে লুইসার অনেক সময়ে হাসি পেয়েছে। বেচারা রাণাকে কতটুকু দেখায়।

তুমি এত বেঁটে বলে তোমার খারাপ লাগে না?

একটুও না। তোমার লাগে?

না।

দু জনেই মিথ্যে কথা বলেছে। নাকি নিজেকে মিথ্যে কথা বলা। আমি অনুভব করি না, সুতরাং অনুভূতি নেই। সিম্পল লজিক। রাণার লজিক।

না ওঠা দরকার।

অনেক কাজ। ফার্নিচার বিক্রি করতে হবে। বাড়ি দেখতে কাল লোক লোক আসবে। জিনিসপত্র গোছাতে হবে। কোথায় যাবে সে ? মা-বাবার কাছে ? না। মা-বাবা লিখেছেন, এ বাড়ির দরজা তোমার জন্যে সব সময় খোলা থাকবে, আমরা যতদিন বেঁচে আছি। তোমার যখন ইচ্ছা এস। লেখে নি, 'বলেছিলাম না— !'

ম্যাগাজিন খুলে চাকরির দরখাস্ত ছাড়তে হবে। ওর জীবনে একটাই বাড়ি হয়েছিল। নিজের, না নিজের নয় তো, ওর আর রাণার। বাজারে বিক্রি করে দিতে হবে। টাকা পাঠাতে হবে রাণাকে। সলিসিটরের চিঠি এসেছে। বাড়ি বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কৃপায় বেঁচে থাকতে হবে।

লুইসা কপাল কুঁচকে ভাবতে লাগল, বাড়ির যা দাম বেড়েছে মর্টগেজ বিল্ডিং সোসাইটি সহজে দিচ্ছে না, কবে বাড়ি বিক্রি হবে, কতদিন তাকে একা একা এ বাড়িতে থাকতে হবে ?

ও রেকর্ড-প্লেয়ার চালিয়ে দিল। কি গান হচ্ছে সে শুনতে পেল না। সঙ্গীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

আহা, রিচার্ড যদি দেখতে পেত, কী ভাবে লুইসার ব্রেক—ডাউন হচ্ছে ! লুইসা চোখ মুছে রেকর্ড-প্লেয়ার বন্ধ করল। উপরে গিয়ে বাথরুমের টবে ছিপি লাগিয়ে গরম আর ঠাণ্ডা জল ছেড়ে দিল। লিকুইড হারবেল বাথ ঢেলে দিল, নীল হয়ে জল ফেনায় ফেঁপে উঠতে লাগল।

রাণার খুব ইচ্ছা হত লুইসাকে বাথ টবে ভালবাসে।

লুইসা কোনোদিনও দেয় নি। লুইসা জলে মাথা ডুবিয়ে বলল, যাও। আমার চোখের সামনে থেকে তুমি দূর হও। যাও। চলে যাও।

বাথ টবের ফেনায়-ভরা নীল জল ছলবল করে হেসে উঠল।

নয়

লুইসা স্নান সেরে খালি গায়ে ঘরে ঢুকল। একটা সুবিধা হয়েছে, রাণার লোভী চোখের ভয়ে সব-সময় জামা-কাপড় দিয়ে গা ঢেকে রাখতে হয় না। সে ফোন তুলে ডায়ল করল, লুলু ?

হ্যাঁ।

লুইসা বলছি। কি করছ ?

কিচ্ছু না।

ওয়াইনবারে যাবে নাকি ?

এক্ষুণি। আমি তোমাকে তুলে নেব।

ঠিক আছে। তৈরি হয়ে নিচ্ছি। বাই বাই ফর নাউ।

বাই বাই।

লুলু শ্রীলঙ্কার খ্রীস্টান। রাণার সিনিয়র হাউস অফিসার ছিল। ইংরেজদের মতো ড্রেস পরে। কিন্তু সাজগোজ-এর জ্ঞান ওর বড় কম। স্বামীও ডাক্তার, এ দেশ থেকে পাশ করে শ্রীলঙ্কায় ফিরে গেছে, মেডিক্যাল কলেজে সিনিয়র লেকচারার এখন। স্বামী ফিরে গেছে, স্ত্রী এসেছে এ দেশে। মেডিসিন করতে এসেছিল, কিন্তু অনিচ্ছায় সাইকিয়াট্রি করছে। লণ্ডন এবং লণ্ডনের আশে পাশে জেনারেল মেডিসিন-এ হাসপাতালে চাকরি পাওয়া আজকাল বেশ কঠিন। নর্দান আইল্যাণ্ডে অথবা উত্তর ইংলণ্ডে চাকরি পাওয়া যায় চেষ্টা করলে। কিন্তু লুলু এক ইজিপ্ট-এর ডাক্তারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, সে লণ্ডনে চাকরি করে। সুতরাং লুলুর লণ্ডনের কাছাকাছি থাকতে হলে সাইকিয়াট্রি অথবা জেরিয়াট্রিকস করা ছাড়া উপায় নেই। লুলু দু চক্ষে ইংরেজদের দেখতে পারে না, কিন্তু সে অনেক এবং অনেক কিছুকেই দু চক্ষে দেখতে পারে না। রাণার প্রতি ওর খুব ভরসা, শ্রদ্ধা ছিল, ও চলে যাওয়াতে লুলু বড় মুস্কিলে পড়ে গেছে!

রাণা মাঝেসাঝে হাসপাতালের ডাক্তারদের নিমন্ত্রণ করত। লুলুর সঙ্গে আলাপ এ ভাবেই হয়েছে। ঘন কালো চুল পিঠে ছড়ানো চকচকে কালো চোখ। একটু এলোমেলো শঙ্কা-ভরা ভাব। লুইসার ওকে দেখে মমতা হয়েছিল। ছেলে ডাক্তারদের সঙ্গে লুইসা হেসে গল্প করতে বসলেই মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়বে নিমন্ত্রিতরা চলে গেলে। অতএব লুলুকে দেখে লুইসা খুশি হয়ে আলাপ করেছিল।

প্রথমদিকে লুইসাই ওকে মাঝেসাঝে ডেকে একসঙ্গে বেরিয়েছে। লুলু ওর সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে ভুলে গেছে যে লুইসা ইংরেজ। যেন রাণার স্ত্রী হিসেবে লুইসার রঙও বদলে গেছে।

ওরা দু জনে বিলারিকির ওয়াইন বারে গেল। এটা ওদের প্রিয় জায়গা। বিভিন্ন দেশের ওয়াইন-বোতলে ঠাসা ছোট ঘরটা। চারিদিকে ছোট ছোট টেবিল ছড়ানো। ইচ্ছে করলে খাওয়াও যায়।

লুলু আমেরিকান চিজ-কেক নিল। লুইসা নিল রোস্তন ছড়ানো টোস্ট আর স্যালাড। আর এক ক্যারাফ সাদা জার্মান মোসেল ওয়াইন। যে যার টেবিল ঘিরে খাচ্ছে, গল্প করছে নিচু গলায়। মাঝে মাঝে হাসির শব্দ কোনো টেবিল থেকে ঠিকরে ভেসে আসছে। যারা শুধু ড্রিংক করতে এসেছে একা একা, তারা বার কাউণ্টরে টুলে বসে কখনো-সখনো বারমেড্-এর সঙ্গে গল্প করছে।

লুলু প্রথম দিকে একটু দূরত্ব রেখে চলত। এখন সমানে সমানে বন্ধুর মতো কথা বলে। কিন্তু রাণার সঙ্গে লুইসা থাকলে লুলু আবার সমীহভরে কথা বলত। লুইসা মনে মনে হাসত।

এখন সে সব বালাই চলে গেছে। দু জনেই আপাতত স্বামী হীনা।

ডাঃ রে-র চিঠি পেয়েছ ?

ফোনে কথা হয়েছে। লুইসা সংক্ষিপ্ত ভাবে বলল। তারপর তোমার কি খবর বল। হাসপাতালের গল্প বল আমাকে।

হাঃ! লুলু একটু ক্ষিপ্ত ভাবে 'হাঃ' টা ছুঁড়ে বলল, আর হাসপাতাল! ওরা আমাদের স্লেভ করে রেখেছে। সিস্টার বেথকে এবারে ঠাণ্ডা করেছি। বলেছি তো তোমাকে আমাকে দিয়ে প্রথম প্রথম ট্রলি ঠেলাত, ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করত।

লুইসা মনে মনে হাসল। সেও এককালে ওয়ার্ড সিস্টার ছিল, জুনিয়ার কচি ডাক্তারদের জব্দ করা ছিল এক মজার খেলা।

ডাঃ রে চলে যাবার পর আবার বদমাইশী আরম্ভ করেছিল। ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। লুলু ওর খোলা কালো চুল কানের পাশে সরিয়ে নিল।

এসেছিলাম মেডিসিন করতে ঢুকতে হল সাইকিয়াট্রীতে। জানই তো মেডিসিনে মোটামুটি পরিষ্কার ডায়গনসিস করা যায়। দেখেছ কখনো, দু জন সাইকিয়াট্রীস্টকে সহজে একমত হতে! এক মেয়েছেলের পনেরো বছর আগে বাচ্চা ছেলে মারা গেছে, এত বছর পরে এখন তার ডিপ্রেশন। বোঝ ব্যাপারটা!

কি চিকিৎসা করবে?

আমি বললাম, ভুলে যাও। ছেলে তো ফিরে পাবে না।

লুইসা ব্যথায় মনে মনে চমকে উঠল, সে তো পেটের ছেলেকে বুকে করে নি, বুকের দুধও খাওয়ায় নি, তবুও সে কি অ্যাবরসনের শোক ভুলতে পেরেছে?

আজকাল অবিবাহিত মেয়েদের বাচ্চা হলে সমাজ নাক সিঁটকোয় না। সে যদি আজকের তরুণ হত, তা হলে—

জান এ দেশের লোকরা মনের মধ্যেটা বোতলের মতো ছিপি দিয়ে চেপে রাখে, আর হঠাৎ এক্সপ্লোড করে।

রাণা কি তোমাকে ভুলে যাওয়ার কথা বলতে শিখিয়েছে?

সাইকোথেরাপী? কনভেয়ার বেল্টে মানুষ আসছে দুঃখের

জঞ্জাল নিয়ে, ন্যাশনাল হেলথে সময় কোথায় সাইকোথেরাপীর? কে শেখাচ্ছে আমাদের সাইকোথেরাপী? ওষুধ দাও শিশি ভরে, দাও ইনজেকশন, আর ই. সি. টি। ঘুম পাড়িয়ে রাখ দুঃখ, রাগ আর ঘৃণাকে। প্রেসক্রিপশন লেখার কেরানি আমরা, মুনাফা লুটছে প্রাইভেট ড্রাগ কোম্পানি!

মানুষকে কখনো ভুলে যেতে বল না। লুইসা আনমনে বলল।

কলকাতা যাচ্ছ কবে?

আমি কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারব?

না, পারবে না, আমার মত যদি জানতে চাও। লুলু স্পষ্ট কথা বলে, ডাঃ রেকে ধরে নিয়ে এস!

লুইসা জোর করে হাসল। কথা ফেরাবার জন্যে বলল, নতুন ডাক্তার কারা আসল?

আর বল কেন? কি ভুল করেছি। মহাদেশাইকে তুমি চেন না। ওর সঙ্গে লণ্ডনে কাজ করতাম। চাকরি খুঁজছিল। খবর দিলাম। এখন চাকরি নিয়ে আমাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে।

তোমাকে পছন্দ করে বুঝি?

না, না সে ধরনের পছন্দ নয়। একা থাকতে পারে না এশিয়ান ছেলেরা। পায়ে পায়ে ঘোরে। রোজ চায় আমি ওকে রান্না করে খাওয়াই, মনের দুঃখের কথা শুনি। ঘ্যানঘ্যানানী ভাল লাগে না রোজ রোজ!

সাদি কেমন আছে? লুইসা জিজ্ঞাসা করল। সাদি লুলুর সঙ্গি এ দেশে।

লুলু মুখ-বিকৃতি করল, জান লুইসা, এশিয়ানদের সঙ্গে অ্যাফেয়ার করা বড় মুস্কিল। একেবারে গ্রাস করে নিতে চায়। ইংরেজ ছেলেরা অ্যাফেয়ার বোঝে, ফুরিয়ে গেছে ভালবাসা—ও আমাকে লাথি মারল, অথবা আমি ওকে লাথি মারলাম। কোনো কান্না-কাটি নেই, রাগ-অভিমান নেই, পরে আবার বন্ধুত্ব কর। কিন্তু

এশিয়ান ছেলেরা একেবারে জোঁকের মতো রক্ত চুষে নিতে চায়। কি করব বুঝতে পারছি না।

সাদিকে পছন্দ হচ্ছে না ?

দেখ লুইসা, তোমার কাছে তো আমার কিছু লুকোনো নেই। আমি বিবাহিত, দু দিন পরে দেশে চলে যাব। আমি সঙ্গী চেয়েছি। এক স্বামী দেশে রেখে বিনা-বিয়ের অন্য স্বামী তো চাই নি আমি।

এশিয়ান ছেলেরা কি সবাই ভীষণ প্রেমে পড়ে ? লুইসা রাণার কথা ভেবে বলল, এত প্রেম যে নিজেরাও সহ্য করতে পারে না ?

এক বছরে আমি দুই রকমের এশিয়ান ছেলে দেখলাম। একদল ভীষণ প্রেমে পড়ে, অন্যদল মেয়েদের সঙ্গে বেশ্যার মতো ব্যবহার করে। মাঝামাঝি তো আমি বড় একটা চোখে দেখি নি। অবশ্য ডাঃ রে-র কথা আলাদা।

লুইসা ফাঁদ এড়িয়ে গেল। ক্যারাফ থেকে মোসেল শেষ করে ঢেলে নিয়ে বলল, আর নেবে নাকি ?

না, ড্রাইভ করব যে আমি। তুমি নাও।

কফি খেতে পারি। তুমি নেবে ?

নাও দুটো।

লুইসা কফির অর্ডার দিল।

আমি তো নিজেই বকে গেলাম। তুমি কেমন আছ ?

ভাল। লুইসা সত্যি করে বলল, ভালই আছি আমি। মনে মনে বলল, ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরতে হবে না, ঘন ঘন ঘড়ি দেখে রাণার ফেরার আগে ঘরে পৌঁছুতে হবে না। সে নিশ্চিন্ত, সে স্বাধীন। স্বাধীনতা নিয়ে কি করবে সে, লুইসা এখনো গুছিয়ে ভেবে উঠতে পারে নি।

আমার এ উইকএণ্ড ছুটি আছে। থিয়েটরে যাবে শনিবার ? লুলু বলল।

চল। সাদি যাচ্ছে সঙ্গে ?

না। ওকে একটু এড়িয়ে চলছি। তোমার সঙ্গে গেলে কিছু মনে করবে না।

সাদিকে যদি ছাড়তেই চাও নর্থে চাকরি নাও না কেন?

লণ্ডনে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন আছে। উত্তর ইংলণ্ডে আমি কাউকে চিনি না। লণ্ডন অনেকটা নিজের দ্বিতীয় দেশ হয়ে গেছে। তুমি হয়তো বুঝবে না লুইসা!

না, বুঝব। রাণাও তাই বলত। চল, ওরা ঝাঁপ বন্ধ করার ব্যবস্থা করছে।

লুলু হঠাৎ লুইসার হাত ধরে বলল, ব্যাসিলডনে তুমিই আমার সত্যিকারের বন্ধু। তুমি চলে গেলে আমার বড় খারাপ লাগবে।

লুইসা একটু হেসে বলল, তুমি তো দু দিন পরেই আবার অন্য হাসপাতালে চলে যাবে।

তা সত্যি, এ দেশে যতদিন আছি চরকির মতো ঘুরতে হবে। লুলু পয়সা মিটিয়ে উঠতে উঠতে বলল, যেই চাকরি খোঁজার সময় আসে, নিজেকে গালাগাল দিই, সুখে থাকতে ভূতে ধরেছিল, এ দেশে আস আরো।

লুইসা হেসে ফেলল। লুলুও হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে থাকলে আমি ভুলেই যাই যে তুমি ইংরেজ।

শত্রু ক্যাম্পের লোক?

শত্রু নয়। শুধু অন্য ক্যাম্প।

লুলু জনবিরল রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, চল সাউথ এণ্ডে যাবে?

না। অন্য একদিন। আমার বড় ক্লান্ত লাগছে।

সেই ভাল। এ দেশের সমুদ্র দেখলে আমার হতাশ লাগে। বাড়ি গিয়ে ঘুমোনো যাবে। সাদিও হয়তো আসবে।

লুইসা চুপ হয়ে থাকল। সকলেরই যেন কেউ না কেউ আছে। ওকে একা বাড়িতে ঢুকে একা বিছানায় শুতে হবে!

লুলু সাবধানে গাড়ি চালাতে লাগল। এ সময়ে সব পাব বন্ধ হয়। কেউ কেউ ড্রিঙ্ক করে পাগলের মতো চালায়। কোথায় পুলিশের গাড়ি ঘাপটি মেরে বসে আছে, সুযোগ পেলেই ধরবে, মুখে অ্যালকোহলের গন্ধ পেলে রক্ষা নেই, থানায় নিয়ে ব্রেথী-লাইসার টেস্ট দেবে। লাইসেন্স যাবে, অসম্মানের একশেষ। কি হল সেদিন ডাঃ দত্তর ?

লুলু লুইসার বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে বলল, তোমার একা একা লাগলে আমায় ফোন কোরো। চলে আসব।

থ্যাংকস। লুইসা নেমে গেল। অদ্ভুত মেয়ে লুলু। ওর কথা শুনলে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসিও পায়। কিন্তু মেয়েটার মনটা ভাল।

গুডনাইট।

গুডনাইট।

লুইসা দরজা খুলে একটুক্ষণ দাঁড়াল আলো না জ্বালিয়ে। ও বড় ভালবেসে ঘর বেঁধেছিল, ঘর সাজিয়েছিল। ঘর তার ভেঙ্গে গেছে। অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হলে, চমকে লুইসা আলো জ্বালিয়ে দিল। নাঃ, চেয়ারে কেউ বসে নেই ওর জন্যে। সোফায় কুশনের অন্ধকার ছায়ায় মনে হয়েছিল লুইসার রাণা বুঝি চুপচাপ ওর আসার অপেক্ষা করে বসে আছে। গম্ভীর মেজাজে বলবে, হাত ঘড়ি দেখে, কি খুব ফুর্তি করে আসলে ? বয়ফ্রেণ্ডের নাম কি ?

দশ

তপন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক থেকে তিন মাসের কোর্স করতে এসেছে ব্যাঙ্কিংয়ে। দীপক তুলে নিয়ে এল ওকে হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে।

তপন গাড়ি থেকে লণ্ডন দেখে মন্তব্য করতে লাগল, এই আপনাদের লণ্ডন। কি ঘিঞ্জি, কি সরু রাস্তা। বাড়িগুলো কেমন

যেন। এত ট্রাফিক!

দীপক মনে মনে প্রমাদ গুণল। এই ছেলেছোকরা যদি সমানে লণ্ডনের গুণগান করে চলে মলি তো ছেলেকে খিচুড়ি বানিয়ে ছাড়বে। শত হলেও জামাই।

থাকতে হয় ম্যারিকায়। কী বিরাট বিরাট রাস্তা, কী সব গাড়ি। ঝকঝকে বাড়ি। আপনি গেছেন ম্যারিকায়?

না। এখনো সুযোগ হয় নি।

কি এখানে পড়ে আছেন! ওদেশে ডাক্তারদের যা রোজগার দেখলাম না। ছত্রিশ হাজার ডলার, চিন্তা করতে পারেন?

কতদিন ছিলে?

একমাস।

কোর্সে গিয়েছিলে?

না, আমার দিদির কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

তা, টুলুকে নিয়ে এলে না কেন সঙ্গে?

টুলুর সবে বাচ্চা হয়েছে। বাপের বাড়িতে আছে।

বুঝলেন মামা, এ দেশে পড়ে থাকবেন না। ইংলণ্ডের দিন শেষ হয়ে গেছে। ম্যাগী থ্যাচার যতই চেঁচাক না কেন?

তোমাদের আমেরিকার অবস্থাও তো কিছু ভাল দেখছি না। দীপক রাস্তায় চোখ রেখে বলল।

ওসব বাজে কথা। দিদিদের যা বাড়ি না। বিরাট লন। তিনটে গাড়ি। সুইমিং পুল। সে একখানা—

দীপক এক ঝলক ছোকরাকে দেখে নিয়ে গাড়ি চালাতে মন দিল। নর্থ সার্কুলার রোড একটু খালি হয়েছে। এতক্ষণ জগন্নাথ-এর পিছন পিছন আসতে হয়েছিল এমন পাজি ড্রাইভার, রাস্তাও দেবে না ওভারটেক করতে! সত্যি, এত ট্রাফিক না! একটা জাপানী মোটরবাইক সাঁ করে ওর ডান দিক থেকে বেরিয়ে গেল। ছোকরার বক্‌বকানী শুনতে হয়েছিল আর কি! দীপক

খুব মন দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল। ওর অল্প বয়স থাকলে ও মোটরবাইক চালাত। ট্রাফিকের বালাই নেই। পেট্রলের দামে ব্লাড:প্রেসার বেড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। দিব্যি আছে ওরা। একটু যদি গাড়ির ড্রাইভারদের সুবিধা বুঝে ওরা চালাত! অবশ্য অ্যাকসিডেন্ট রেটও ওদের তেমন বেশি। দেখ, দেখ, একটা সাইকেলও আবার চলছে। ট্রিট এ বাইক লাইক এ গোল্ড ডাস্ট। দীপক বাইককে অনেক জায়গা দিয়ে সরে এল।

বুঝলেন মামা, ইংলণ্ড আমাদের আর কি শেখাবে!

গাড়ি বাড়ির সামনে থামিয়ে দীপক জোরে নিশ্বাস নিল। ও কান বন্ধ করে গাড়ি চালাচ্ছিল। এ ছেলের কথাবার্তা শুনে সে হাসবে না রাগ করবে বুঝে উঠছিল না। সে সুটকেশ হাতে করে দরজা খুলে সোজা মলির খোঁজে উপরে চলে গেল। মলি চুল আঁচড়াচ্ছিল। দীপক ফিস ফিস করে বলল, তপন এসেছে।

চল। ফিস ফিস করছ কেন?

দীপক নিচু গলায় গলা খাঁকানী দিয়ে বলল, ও একটু আবোল তাবোল বকে। তুমি গায়ে মেখ না যেন।

মলি দীপককে ভাল করে দেখে নিয়ে নিচে নেমে এল।

বস তপন। দেখেছ তোমার মামার কাণ্ড, তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। বস, বস। চা খাবে না কফি খাবে?

একটু ডাক্রি হলে ভাল হত। যা গরম না।

ডাক্রি? মলি জিজ্ঞেস করে।

ও একটা ককটেল।

আমি তো ককটেল বানাতে জানি না।

সে কি! তবে লাগারই দিন। তপন কৃপাভরে বলল।

নিশ্চয়। দীপক একটা লাগার এনে দাও। এখন খাবে না একটু পরে?

না, প্লেনে যা ঠেসে খেয়েছি না, একটুও ক্ষিধে নেই।

কোনো অসুবিধে হয় নি তো ?

কিস্সু না।

দীপক ফ্রিজ থেকে 'লাগার' এনে দিল। মনে মনে ভাবল দিদি নিশ্চয় ম্যারিকায় 'লাগার' খেতে শিখিয়েছে। নাকি দেশেই আজকাল এ-সব চলছে। যাই বল, ছোকরা খুব স্মার্ট।

আপনি খাবেন না, মামা ?

এখন ইচ্ছে করছে না। মলি, তোমাকে দেব ?

দাও না।

ছেলের ক্ষিধে নেই, দীপকের খুব ক্ষিধে পেয়েছে।

বাড়ির সব ভাল তো ?

ভাল ? জ্যোতি বসু কি আমাদের ভাল থাকতে দিচ্ছে ? লোড শেডিং-এ বাপ বাপান্ত। এয়ার কণ্ডিশন চলে না। কয়লা নেই, গ্যাস নেই, কেরোসিন নেই।

ইন্দিরা গান্ধী এসে সব যে ঠিক করে দেবে বলল।

বুঝলেন মামীমা, আমাদের দেশে সব সমান।

ব্রিটেন ছেড়ে এবার ভারতবর্ষ। দীপক মনে মনে ভাবল।

আমেরিকা ভাল লেগেছে তোমার ?

ভীষণ। তাই তো মামাকে বলছিলাম, এ দেশে পড়ে আছেন কেন ?

দীপক তাড়াতাড়ি বলল, চল মলি আমরা খেয়ে নিই। তপন এখন খাবে না বলছে। ও বিশ্রাম করুক।

মলি ভালমানুষের মতো বলল, আজকে তো রবিবার। তোমার এত তাড়া কেন। একটু গল্প-সল্প করি আগে। না কি তুমি বিশ্রাম করতে চাও ?

না, না। তপন সোৎসাহে বলল, আমার বিশ্রাম বেশি লাগে না।

মামিমার মতো উৎসাহী গরিব লণ্ডনবাসী শ্রোতা পেয়েছে, বিশ্রাম দিয়ে কি হবে ?

মলি দীপককে নির্দেশ দিল, রান্না করা আছে, সন্ধ্যেবেলা খাওয়া যাবে। এখন না হয় স্যাণ্ডউইচ করে এস, দুপুরের খাওয়ার পালা শেষ হবে।

কি বলছিলে আমেরিকার কথা। কোথায় ছিলে ?

নিউজারসির একটা টাউনে। নিউ ইয়র্ক থেকে এক ঘণ্টার পথ।

কে থাকে ?

আমার দিদি-জামাইবাবু। দু জনেই ডাক্তার। তপন ছোট বসার ঘরটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, ওদের কাণ্ডই আলাদা। বিরাট বাড়িতে থাকে ওরা। সে নিউক ইউর্ক কি ? ঘাড় উঁচু করে দেখতে দেখতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে।

সত্যি আমেরিকানরা যে কেন দলে দলে এ পোড়া পুরনো গরিব দেশে ছুটে ছুটে কি দেখতে আসে কে জানে। বোধহয় ব্রিটেনকে মিউজিয়ম-এর মতো দেখে ওরা। না-বোঝার মতো করে মলি বলল।

সত্যি মামীমা, হিথরো থেকে রাস্তা যেটুকু দেখলাম না খুব হতাশ হয়েছি।

তিনমাস তোমার খুব কষ্ট হবে এ গরিব দেশে থাকতে।

না, আপনারা তো আছেন। তপন যেন উদার হবার চেষ্টা করল।

দীপক ফিরে এল স্যাণ্ডউইচ আর কফি নিয়ে। তপনের কথা শুনে বলল, আমরা সারাদিন কাজে থাকি, তোমার কিন্তু একা একাই ঘুরে ফিরে বেড়াতে হবে। সন্ধ্যেবেলা তোমাকে আণ্ডার গ্রাউণ্ড দেখিয়ে আনব। ম্যাপ একবার বুঝে নিলে কোনো অসুবিধা হবে না।

আমার জন্যে ভাববেন না। আমার খুব তাড়াতাড়ি বন্ধু হয়ে যায়।

দীপক ভাবল, কোন দেশে এসেছ জাননা তো বাছা।

মলি স্বামীকে উপেক্ষা করে বলল, দেশের গল্প বল। কী রকম হাল চাল কলকাতার।

বললাম তো জিনিসপত্রের কথা। ব্ল্যাকমার্কেট, ভেজাল, করাপশন, আর চুরি-ছিনতাই, নোংরা, ভিড় এই ছটা শব্দ দিয়ে কলকাতাকে বর্ণনা করা যায়।

চুরি-ছিনতাই খুব হচ্ছে বুঝি ?

হচ্ছে না! মেয়েছেলেদের হ্যাণ্ডব্যাগ, আর গায়ে এক রত্তি সোনা থাকলে আর কথা নেই। টুলু তো আজকাল কাঁচের চুড়ি পরে বেরোয়। সব ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছে।

মলি সহানুভূতির সুরে বলল, আহা রে। এত গয়না অথচ ব্যাঙ্কে পচছে।

গয়না সব আমার মা-ই ওকে দিয়েছে। তারপর দেখুন না, এই সেদিন শ্যামবাজারে এক সাউথ ইণ্ডিয়ান বুড়ো মহিলার ব্যাগই শুধু কেড়ে নেয় নি, শাড়ি পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে।

শাড়ি! মলি বিশ্বাস না করা গলায় বলল, গায়ে পরা শাড়ি ?

বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার। না হবারই কথা। কিন্তু সত্যি কথা।

দীপক-মলি দু জনের দিকে তাকাল। দীপক আর তপন হাসতে শুরু করল।

বিভীষণ-এর রাজত্ব হয়েছে, বুঝলেন ?

তা শাড়ি কেন ? মলি আতঙ্কে বলল।

মাদ্রাজীরা দামী সিল্ক-এর শাড়ি পরে জানেন তো। বুড়ি রাস্তায় পেটিকোট পরে কান্নাকাটি, এক বাড়ির দোতলা থেকে শাড়ি ছুঁড়ে দিলে তবে স্বস্তি। বুঝুন একবার, এই আমাদের দেশ।

মলি বলল, ওরা মারধোরও করে কি ?

না, তা করে না।

এ দেশে করে। মাগিং। মলি বলল।

নিউইয়র্কে শুট করে। দীপক যোগ করে দিল। ছিনতাই তো বদমাশদের কাজ। কিন্তু সাধারণ মানুষেরা কি করে বাঁচে, নেড়ী কুত্তার বাঁচার মতো বাঁচাকে সহ্য করে আমি তা বুঝতে পারি না।

তুমি আবার দেশ দেশ কর। শ্যামবাজারে গেলেই হয়েছে আর কি। একা বেরুতে পারব না। ঘরে বন্ধ হয়ে দম আটকে মরব।

আমার মা বোনরা তো আছে। দীপক মনে করিয়ে দেয়।

তারা আছে, উপায় নেই বলে।

সেটা ঠিক না। মাকে একবার এনেছিলে, একমাস পরেই হাঁপিয়ে উঠলেন। কবে আমাকে দেশে পাঠাবি মনে আছে।

আমার বাবা দেশে ফিরতে ভয় করে। মলি বলল।

বলছি তো, ম্যারিকা চলে যান। খুব আরামের দেশ। কি বিরাট—

আর সহ্য করতে না পেরে, মলি ওকে থামিয়ে বলল আমাদের গরীব লণ্ডনই ভাল। তাও দেশ দেশ মনে হয়। তুমি কি ম্যারিকায় সেটল করবে না কি ?

না, ওরা বড় কড়া। সহজে ওয়ার্ক পারমিট দেয় না। জামাইবাবু তো বলছে, ব্রেজিলে চলে যাবে।

সে কি, ম্যারিকা ছেড়ে ব্রেজিল !

ও দেশে কথায় কথায় ডাক্তারদের 'স্যু' করে। দিদি রাজি হচ্ছে না, আবার ভাষা শিখতে হবে।

পথে এস ছোকরা। দীপক নিজের মনে বলল, স্বর্গীয় দেশের একটা খুঁত অন্তত ছেলে স্বীকার করেছে।

তাছাড়া জানেন তো, ভাগ্নে ভাগ্নীরা একেবারে ম্যারিকান হয়ে

গেছে। সবে তো পনেরো-ষোল বয়স, মা-বাবার সামনে পা তুলে সিগারেট ফোঁকে, মদ খায়। যা ইচ্ছে তাই করে, আমার ছেলে আমার মুখের ওপর কথা বললে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দিতাম। আমাদের সময় বাবার সামনে টু শব্দটি করতে পারতাম না—

সেটাই কি ভাল? দীপক আস্তে আস্তে বলল, যত বাচ্চাই হোক, ওদেরও তো মতামত আছে। শোনা দরকার ওরা কি বলতে চাইছে।

আপনার ছেলেমেয়ে নিশ্চয় আপনাদের মুখের ওপর কথা বলে না। নাকি বলে এ দেশেও?

মুখের ওপর কিনা জানি না। তবে তারা যা বলতে চায় তা আমরা শুনতে চাই, জানতে চাই বৈকি!

ওরা কোথায়?

ওরা ইয়োরোপে।

দীপক মনে মনে বলল, ভাগ্যিস ওরা বাড়িতে নেই, না হলে ওরা তপনকে কুমড়োর মতো ছিলে ছিলে করে কাটত, তপন হয়তো টেরও পেত না।

যাই বলুন মামা, ডেমোক্রেসির একটা সীমা আছে।

সে কথা সত্যি, আমাদের দেশ এক চরমে, আর ওরা আরেক চরমে। দুটোর কোনোটাই ভাল নয়।

মলি হাঁ করে কথা শুনছিল, ও হাত বাড়িয়ে স্যাণ্ডউইচ নিতে যাবে, দেখল শেষটা তপন নিয়ে নিয়েছে। ছেলের না কি ক্ষিধে নেই, সমানে খেয়ে চলেছে।

তপন কিছুদিন থাকার পর একদিন মলি রাগ করে দীপককে বলল, কেমন ছেলে গো। আমি কাজ থেকে ফিরে ওর জন্যে স্পেশ্যাল রান্না করে রাখি, বলেও যায় না কোন দিন খাবে

কোন দিন খাবে না!

দীপক তাড়াতাড়ি বলল, আমি ওকে বলবখন, বলে যেতে।

এটা কি ও দেশ পেয়েছে? ঝি-চাকর সব করে দেবে! ঘরটা রোজ কি করে রেখে যায়? বাথটব পর্যন্ত পরিষ্কার করে না স্নান করে, যেন জমাদার আছে পরিষ্কার করার।

দেশের ছেলে তো বুঝতে পারে না, এ-দেশে সব নিজেদের করতে হয়।

দেখতে তো পাচ্ছে। আমি কি ঘরে বসে আছি ওকে সেবা করার জন্যে।

আমি বাথটব পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

কর গিয়ে। আমার ঘেন্না করে দেখতে। থাকত ইংরেজ ল্যাণ্ডলেডির কাছে, দু-দিনে ছেলেকে সোজা করে দিত।

যাক গে। আর ক-টা দিন। জামাই মানুষ।

হ্যাঁ; জামাই! মলি উত্তরে বলল।

তুমিই বা কেন স্পেশ্যাল রান্না কর ওর জন্যে, কি ভালবাসে, কি না বাসে!

মলি ফিক করে হেসে ফেলল। ওকে যে এত ঠাট্টা করি ও বোঝেও না। ভাবে বুঝি ওর সঙ্গে সায় দিয়ে কথা বলছি। তোমার জামাইয়ের 'ইগো' লোহা দিয়ে তৈরি!

বন্ধু হয়েছে মনে হচ্ছে ছেলের!

বন্ধু হয় নি! এ দেশের লোকরা স্ট্রেঞ্জারদের নেমতন্ন করে নাকি?

তবে কি একা একা ঘুরে বেড়ায়?

মলি আভেন পুঁছতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কি, বান্ধবী পেয়েছে বুঝি?

আমি কি করে জানব? মলি বলল।

তুমি জান মনে হচ্ছে! যাক গে। যা ইচ্ছে করুক। দেশে

ফিরে গেলেই হল।

দরজা খুলে তপন দু জনকে দেখে একটু লাজুক ভাবে বলল, কি আপনারা এখনো জেগে আছেন।

এই শুতে যাচ্ছিলাম।

খেয়েছ, না খাবে ?

না, খেয়ে এসেছি। একজন খেতে নিয়ে গেল। তপন মলির চোখ এড়িয়ে বলল।

মলি হাসল মনে মনে। কলারে যে লিপিস্টিকের দাগ জামাই কি তা জানে ? টুলু না জানলেই হল !

যা গরম না আপনাদের লণ্ডনে। তপন রুমাল দিয়ে কপাল মুছে বলল।

গরম ! দীপক অবাক হয়ে বলল, আজকে তো হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। আমি তো জাম্পার পরে আছি।

তোমার বয়স হয়েছে, মলি হেসে বলল, জাম্পার পরেছ। চল, অনেক রাত হয়েছে। তপন তোমার ঘরে জল রেখে এসেছি। কালকে তো শনিবার, আমরা হয়তো একটু দেরি করে উঠব।

তুমি নিজে চা করে নিও যদি ইচ্ছে করে। দীপক বলল।

আমি কাল ভোর ছ-টায় বেরুব। স্ট্রাটফোর্ড আপন অ্যাভন-এ যাব। দেখে আসি আপনাদের সেকস্পীয়রকে !

খুব ভাল। কেমন ভাবে যাচ্ছ ?

কোচে।

বেশ, আনন্দ করে ঘুরে এস।

দীপক জামা কাপড় ছেড়ে শুতে শুতে বলল, এই না কথা ছিল কালকে আমরা ওকে অক্সফোর্ডে নিয়ে যাব। ভুলে গেছে বোধহয়।

মলি মুখ টিপে হেসে বলল, ও নিজেই যাবেখন। যা দেখাবার

অনেক দেখিয়েছ ওকে।

ভালই হল। ছুটোছুটি করতে হবে না।

মলি পাশে শুলে, দীপক সরে এসে বলল, সত্যি ওর বান্ধবী হয়েছে নাকি ?

তোমার কি দরকার ?

বাঃ, টুলুর কথা ভাবতে হবে না।

ছুটির প্রেম ছুটি ফুরোলেই ফুরিয়ে গেল। তুমি চিন্তা কোরো না তো!

হুঁ। দীপকের চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে, পুরনো এক টুকরো ছবি ভেসে এল ঘুম চোখে। মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে মীনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সে হাত ধরেছিল একদিন মীনার, তারপর—দীপক মলির বুকে মাথা রেখে ঘুমে ডুবে গেল। 'তারপরে—' কি হল আর জানা যাবে না।

তপনের কোর্স শেষ হতে সাতদিন দেরি আছে। দীপকের ক্লিনিক থেকে আজ দেরি হয়েছে বাড়ি ফিরতে। মিটিং ছিল, স্কুল হেলথ কাউন্সিলের। বাড়ি ফিরে দেখে মলি একা বসে টি. ভি.-তে ন-টার খবর শুনছে বা দেখছে।

খেয়ে নিয়েছ তো ?

হ্যাঁ। তুমি খেয়ে এসেছ তো ?

হ্যাঁ। চা খাবে ?

খাব।

দীপক চা করে নিয়ে এল।

এবারের ওলিম্পিক মাঠে মারা মারা যাবে মনে হচ্ছে। থ্যাচার যা পিছনে লেগেছে না!

কার্টার ইয়োরোপের কান ধরে টানাটানি করছে। একদিকে রাশিয়া অন্য দিকে আমেরিকা! দুনিয়াটা একটা মজার জায়গা হয়েছে বটে। তা তপনবাবু কোথায় ?

বেরিয়েছে ফিরে এসে।

সাতদিন তো জামাইয়ের মুখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। দিদির চিঠির উত্তরও দেয়া হয় নি। তপনের হাতে দিয়ে দেব।

দীপক, মলি ফরাসী ব্যালে দেখতে দেখতে বলল, আরো কিছুদিন থেকে যেতে চাইছে।

কেন ?

কেন কি। লণ্ডন ভাল লেগেছে।

লণ্ডন বড় বেশি ভাল লেগেছে ছেলের। এমন বিশ্রী, নোংরা, ঘিঞ্জি জায়গা হয় না, এখন কি হল ? তুমি কিছু বলেছ ?

আমি কিছু বলি নি।

আমার ইচ্ছে ও ফিরে যাক। কার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, এ ছেলের মাত্রাজ্ঞান নেই, বৌ দেশে রেখে এসেছে, চিন্তা নেই কোনো !

তুমি বোলো ওকে।

দেখা হলে তো ! তুমি উৎসাহ দাও নি তো !

তুমি আমাকে ভেবেছ কি !

নিজের ছেলেমেয়ের বেলায় নয়। অন্যদের বেলায় তুমি খুব উদার হয়ে যাও দেখছি।

বাজে কথা বোলো না। মলি চটে উঠে বলল, তপু তনিকে বিনা কারণে কখনো কিছু বারণ করেছি ? আর ওদের বয়সের সঙ্গে তপনের তুলনা হয় ? আঠাশ বছরের যুবক মানুষ !

তুমি তপনের হয়ে ঝগড়া করে মরছ কেন ?

তুমি তপনকে নিয়ে আমাকে ঠেশ্ দিয়ে কথা বলছ কেন ?

চুপচাপ। ব্যালের মনে ব্যালে হয়ে যাচ্ছে। মলি কিছুক্ষণ পরে উঠে চলে গেল উপরে। দীপক উঠে টি. ভি. বন্ধ করে দিল। নিচ থেকে চেঁচিয়ে বলল, আমি একটু হেঁটে আসছি।

দীপক ইদানীং শরীর-চর্চায় মন দিয়েছে। জগিং করে না, সে

হাঁটে সময় পেলেই। রাগের খুব ভাল ওষুধ হাঁটা। হন হন করে হাঁটা। মানুষজন রাস্তায় বড় কম। দোকানপাট বন্ধ। শুধু গাড়ি চলছে। গরম পড়লে রাস্তায় নয়, পাব-এ অথবা পার্কে ওরা বসে গল্প করে, আড্ডা মারে। কেমন যেন খাঁ খাঁ লাগে রাস্তা।

কুকুর নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছে দু-চারজন। পার্কের গেট বন্ধ। হাঁটতে হাঁটতে সে লর্ডসের কাছে এসে গেল। লর্ডস পাব-এ যেতে তনি খুব ভালবাসত। ওরা সন্ধ্যাবেলা এক-একদিন একেক ব্যাণ্ড নিয়ে আসে। যেদিন পল্লীগীতি বা ফোক শুরু হত দীপকের ভাল লাগত। অন্য ব্যাণ্ড বড় বেশি শব্দ করে, কিছুক্ষণ পরে কান ঝালাপালা লাগে। প্যারিসের রাস্তা মাত্র আধ ঘণ্টার ব্যাপার প্লেনে গেলে। দীপক লিখেছে তনিকে বেড়িয়ে যেতে লণ্ডনে। তনির এক কথা, এক বছর পরে আসব। এত জেদ কেন তনির? লেখে কেবল, ভাল আছি। আমার জন্য চিন্তা কোরো না। বাবা-মাকে দেখতে ইচ্ছে করে না? দীপক লিখেছিল মলিকে না বলেই, সাতদিনের ছুটিতে প্যারিসে আসব ভাবছি। তোমার সঙ্গেও দেখা হবে, প্যারিসও আবার দেখা হবে। তনি লিখেছে, সে প্যারিস ছেড়ে ফ্যামিলির সঙ্গে সাউথ অফ ফ্রান্সে যাচ্ছে তিন মাসের জন্যে। মলিকে চিঠি দেখায় নি। অভিমানে ওর বুক ভরে গেছে, আর তীব্র বুকের ব্যথায়। ওর প্রাণের তনি যে ওকে কোনোদিনও এত ব্যথা দেবে তা কি সে জানত!

মনে পড়ে তনির আট বছর বয়স। ও একা স্কুলে যাবে। দীপকের ক্লিনিকে যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। সে রাস্তার কোণায় দাঁড়িয়ে ছিল। তনি ঠিকমতো রাস্তা পার হতে পারবে তো! এত ট্রাফিক লণ্ডনে! কাগজে তো সব সময় পড়া যায়, বাচ্চারা গাড়ির ধাক্কায় আহত, মৃত। মলি দীপককে বলেছে, ওকে বাচ্চা করে রেখ না তো! বড় হতে দাও। ওকে শিখিয়েছ তো রাস্তা পার হতে, আর ও তো একা যাচ্ছে না। ডিক, টিনাও তো

যাবে। ললিপপ লেডি রাস্তা পার করে দেয়, দেখ তো!

দীপক সব বোঝে। কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক ও ছটফট করেছে। তনি ঠিকমতো স্কুলে পৌঁচেছে তো!

মা, সাবধানে রাস্তা পার হবে। যতক্ষণ না ললিপপ লেডি হাত ধরে পার না করিয়ে দেয় দাঁড়িয়ে থাকবে ফুটপাথে।

রোজ সকাল বেলায় দীপকের এক কথা। একদিন ঝগড়া হয়ে গেল মলির সঙ্গে। দীপক রাগ করে বলল, তুমিও এ দেশের বুলি ধরেছ। পেট থেকে বাচ্চা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে বড় হতে দাও। রোজ ক্লিনিক হাসপাতালে এক কথা শুনি, বাচ্চাদের বাচ্চা থাকতে দেবে না, শিশুরা শিশু নয়, জন্মাবার পর থেকেই সব 'মিনিয়েচর এ্যডালট'। আমার হাত থেকে ঐ শিশুগুলো বড় হয়ে রাণার ক্লিনিকে যাবে, সাইকিয়াত্রিক পেসেন্ট হয়ে!

কি চাও তুমি, মলি একটু থতমত খেয়ে বলেছে। দীপক সহজে লেকচার দেয় না, আমাদের দেশের মেয়েদের মতো তনিকে আলমারির পুতুল করে রাখবে?

রাণা আসলে দীপক আলোচনা করেছে ওর সঙ্গে। মলি আর লুইসা বসে শুনছিল। রাণা ভাল শ্রোতা পেয়ে উত্তেজিত হয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করে।

পারস্পেকটিভটা আগে ঠিক কর। কোন শ্রেণীর কথা বলছ? তোমাদের মতো কম্ফর্টেবল মধ্যবিত্তর কথা? এ দেশেও এক শ্রেণীর লোক আছে যারা চায় না কোনোদিনও ছেলেমেয়েরা বড় হোক। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা হচ্ছে বৃদ্ধ মা-বাবাদের ইনসিউরেন্স বা সোশ্যাল সিকিউরিটি। দেশের গ্রামের গরিব শিশুরা মা বাবা কাকা পিশির সঙ্গে কাজ করতে করতেই না-জানার আগেই বড় হয়ে যায়। তোমাদের মতো লোকেরা আধোআধো করে ছেলে-মেয়েদের বড় কর। যেন ওদের শরীর মোমে গড়া। বুদ্ধি বড়দের থেকে ধার করা। শিশুরা যেন মানুষ নয়, মা-বাবার থেকে ধার

করা স্পার্ম আর এগের জড়বস্তু।

দীপক রাগ করে বলল, শিশুদের যদি জড়বস্তু বলে ভাবতাম তবে আমরা ওদের অত ভালবাসতে পারতাম না। প্রতিদিন চোখের সামনে দেখছি আমার ছেলেমেয়েরা একটু একটু করে বড় হচ্ছে, শরীরে মনে বুদ্ধিতে।

তবে, মলি খপ্ করে বলল, রাণা তো বড় হবার কথাই বলছে।

বড় হবার কথা বলছে। দীপক মনে করিয়ে দিল। মা-বাবার দায়িত্বের কথা বলছে না। ও কি বুঝবে, ওর তো এখনো ছেলে-মেয়েই হয় নি।

হবেও না। লুইসা বলে বসল।

তোমাদের ঐ এক কথা। যেন জীবনের সবরকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে না গেলে অন্য লোকের অনুভূতি বোঝা যায় না। তবে তো বুঝি না বলে তোমার আমার ডাক্তারি ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর দায়িত্বর কথাই যদি বলছ, তোমার দায়িত্ব নেই, ছেলে-মেয়েদের বড় হতে সাহায্য করা ? পাখিদের দেখ না, বাসা তৈরি করে খাবার এনে দেয় শিশুদের, তারপরে উড়ে যেতে দেয়।

মানুষরা তো পাখি নয়, পশুও নয়। দীপক জোর দিয়ে বলল, মা-বাবার দায়িত্ব যতদিন বেঁচে আছে ততদিন থাকে।

দীপক, তাহলে বলতে চাইছ তোমার জন্যে তোমার মা এখনো রেসপনসিবল ? মলি জিজ্ঞাসা করে।

মা বাবা নিয়ে দীপক মলিকে ঘাঁটায় না। ওর মা ছেলে-বেলাতেই মারা গেছে, বাবা বেঁচে থাকতেও নেই বললেই চলে। সে চুপ করে গেল।

পরের দিন থেকে সে মুখে আর পই পই করে তনিকে সাবধান করে দিল না। তনিই বাবার মুখ দেখে সান্ত্বনা দিল, আমি তো টিনার সঙ্গে স্কুলে যাই।

বাইরের লোকের কাছ থেকে কিন্তু কখনো টফি, চকলেট নিও না ভুলেও।

মা আমাকে বলে দিয়েছে!

ঠিক আছে, মনে থাকে যেন।

দীপক যত্ন করে তপু-তনিকে বাংলা বলতে শিখিয়েছে।

ওদের ইংরেজি বলতে দাও না, স্কুলে যখন যাবে হাঁদার মতো বসে থাকবে।

তুমি দেখ। দু দিনে ওরা ইংরেজি বলতে শিখে যাবে। টি. ভি. দেখছে, ইংরেজি বই পড়ছে। পাড়ায়, পার্কে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছে।

দীপক খুব সাবধানে বাংলা বাঁচিয়ে রেখেছে বাড়িতে। তপু তনি দু দিনেই ইংরেজদের মতো কথা বলতে শুরু করল। বাড়িতে ইংরেজি বললেই দীপক মনে করিয়ে দিয়েছে, আমরা বাঙালী। বাংলা বলতে ভুলে গেলে দেশে যখন যাবে, দাদু-দিদিমার সঙ্গে কি করে কথা বলবে ?

অ আ ক খ পর্যন্ত শিখিয়েছিল। তপু, তনি, দু জনেই শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করল। বাংলা বলতে হবে বাড়িতে—বলবে ওরা। বাংলা কিছুতেই লিখতে-পড়তে শিখবে না। দীপক হাল ছেড়ে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত।

ঘুরে ফিরে কেবল তনির ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। দীপক হয়তো বকতে যাবে, তনি কিছু দুষ্টুমী করেছে, তনি ওর ডাগর ডাগর চোখ মেলে, মুখে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

দীপক ওকে হেসে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে বলত, মা, দুষ্টুমী করে না। মা রাগ করে, বাবা দুঃখ পায়।

হুঁ।

দীপক নিজের মনেই হাসল। তনির ছেলেবেলার বন্ধু ডিক এগিয়ে বসে বলল, গুড ইভনিং স্যার।

দীপক চমকে গেল। ও নিজের মধ্যে এত ডুবে ছিল যে এক মুহূর্ত চিন্তা করে পেল না ছেলেটা কে।

অ্যাফ্রো হ্যার স্টাইল, আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রঙ, গলায় লাল পুতির মালা, কানে সোনার দুল। ডিকই আবার বলল, তোমার ওখানে যাব যাব ভাবছিলাম। দেখা করে চিঠি লিখতে লিখেছে তনি।

দীপক মনে মনে বলল, তনি কি জানতে চায়! কিন্তু মুখে বলল, তুমি এখন কি করছ?

বারে কাজ করছি।

কলেজে যাবে না?

যাব এ বছরে।

কি পড়বে ভাবছ?

ম্যাথ্‌স নিয়ে পড়ব। রি-সেসনে তো আর্টের যুগ শেষ হয়ে আসছে মনে হচ্ছে।

তোমরা কি সবাই একবছর ছুটি নিয়েছ?

ছুটি কোথায় আর?

আঃ লেখা-পড়া থেকে ছুটি। তনি তো এ্যালিয়েস ফ্রাঁসেতে ফরাসি পড়ছে। ও বেচারার খুব খাটুনি দেখে এলাম।

তুমি গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, এক সপ্তাহের জন্যে গিয়েছিলাম। ভাল আছে তনি।

আচ্ছা আবার দেখা হবে।

দীপক তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল। ডিক যেতে পারে প্যারিসে, অথচ দীপক আর মলির যাবার অনুমতি নেই। ওর চোখ জ্বালা করতে লাগল। বাড়ির দরজায় এসে ওর নিজের ওপর রাগ হল। ডিককে সে কেন ভাল করে জিজ্ঞাসা করল না তনির কথা। বুড়ো বয়সে এ কী ছেলেমানুষী তার। তপু-তনির বয়সে তার তো বন্ধুঅন্ত প্রাণ ছিল।

দরজা খুলে দেখল তপন বসে বসে কফি খাচ্ছে।

কফি খাবেন না কি মামা ?

না। একগ্লাস জল খাব। মলি কোথায় ?

মামিমা শুতে গেছে। আমাকে বলে গেল আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে।

ও হ্যাঁ। দীপকের মনে পড়ল ওরা শুধু শুধু তপনকে নিয়ে ঝগড়া করেছে কিছুক্ষণ আগে।

তা তোমার তো যাবার সময় হয়ে গেল।

হ্যাঁ, মামিমাকে বলছিলাম আর কিছুদিন থেকে যাব, আপনাদের আপত্তি না থাকলে। অফিসে ছুটোছুটি করেই তো সময়টা গেল। একটু বিশ্রাম দরকার মনে হচ্ছে।

আমার ইচ্ছে নয় তুমি লণ্ডনে থাক। টুলু একা একা আছে বাচ্চা নিয়ে। তোমার এখন যাওয়া দরকার। দীপক নিজেই অবাক হয়ে গেল এত স্পষ্ট করে সে কথা বলছে বলে।

ও তো বাপের বাড়িতে আছে। আবার যদি আমার না আসা হয় !

বাচ্চারা বড় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় তপন। পরে আফশোস করবে। আজকাল তো তোমরা হরদম আসছ বিলেতে। এ দেশ ও দেশ তো জলভাত হয়ে গেছে।

আপনার টাকা আমি দেশে গিয়ে ফেরত দেব মামা।

তপন ! দীপক বিরক্তি আর হতাশায় বলল, আমি টাকার কথা ভাবছি না। আমি চাই না তুমি আর লণ্ডনে থাক।

তপন কফির কাপ টেবিলে ঝপাং করে রেখে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আমি শুতে যাচ্ছি।

গুডনাইট।

তপন উত্তর দিল না। দীপক একটু দুঃখিত হয়ে ওর কফির কাপ রান্নাঘরে গিয়ে ধুয়ে তুলে রাখল।

তিন সপ্তাহ পরে দিদির চিঠি এল : 'তুমি আমার অতি প্রিয় ছোট ভাই ছিলে। আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই তুমি আমার একমাত্র জামাইয়ের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিবে। টুলু কান্নাকাটি করিতেছে। আমি যে কি করিয়া টুলুর শ্বশুর বাড়িতে মুখ দেখাইব জানি না।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ভুলিয়া গিয়াছ আমার বাবা তোমাকে সাহায্য না করিলে তুমি আজ ডাক্তার হইয়া বিলাতে ফুটানি করিতে পারিতে না।'

মলি দীপকের মুখ দেখে বলল, কি লিখেছে তোমার দিদি।

পড়।

তুমি পড়ে শোনাও। আমি বাংলা হাতের লেখা পড়তে পারি না।

দীপক পড়ে শুনিয়ে চিঠিটা দলামোচা করে ছুঁড়ে ফেলল ঘরের কোণায়।

মলি দীপকের পাশে বসে বলল, তুমি দিদির ওপর রাগ করছ কেন ? দিদি কি করে জানবে জামাইয়ের কীর্তি-কারখানা।

দিদি কি করে ভাবতে পারে ? কি করে···দীপক দাঁড়িয়ে উঠে ঘরে পায়চারি করতে শুরু করল, কাকা মেডিকেল কলেজের এ্যানট্রেন্স ফি, আর পরীক্ষার টাকা দিয়েছিল। আমি তার চার গুণ টাকা ফেরত দিয়েছি। তবু ভুলতে দেবে না। টাকা নিই নি তো, দাসখত লিখে দিয়েছি !

দীপক মলির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ছোকরাকে আরো যত্ন কর। জিনিস কিনে দাও। বান্ধবীর গল্প শোন। অকৃতজ্ঞ কোথাকার !

মলি নরম করে বলল, বস তো। তুমি এত মন খারাপ করছ কেন ? কৃতজ্ঞতা কেন চাও ? কেউ কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে ভালবাসে না। বস দেখি। মলি জোর করে দীপকের হাত ধরে ওকে বসাল,

ছেলে বোধহয় ভয় পেয়েছে আমরা কিছু লিখে বসব। তাই আগে ভাগে আমাদের নামে গিয়ে লাগিয়েছে। দিদি কি করে বুঝবে? আর সাহায্যের কথা! আমাদের দেশের লোক কোনোদিন ভুলতে দেয় একবার সাহায্য করলে। জেনারেশন ধরে ওদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে হবে। মলি একটু তিক্তভাবে বলল, দেখ না আমার মামার বাড়ির কাণ্ড। হরদম হুকুম করছে, লোক পাঠাচ্ছে, যেন মামাবাড়ির জন্যে বিনাপয়সার হোটেল খুলে বসে আছি আমরা!

এবার দীপকের সান্ত্বনা দেবার পালা। সে মলিকে কাছে টেনে বলল, মরুক গে, এ-সব বাজে ব্যপার নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই। চল লর্ডসে যাই। ডিক ওখানে কাজ করছে।

ওরা গিয়ে দেখল ডিক একসপ্তাহ হল কাজ ছেড়ে দিয়েছে। বড় চঞ্চল ছেলে, দীপক বিরক্ত হয়ে ভাবল। হতাশা ঢেকে বলল, কি নেবে তুমি?

শাত্রুজ নেব।

দীপক এক পাইণ্ট ডাবল ডায়মণ্ড নিল। পাব-এর ভেতর এক ফোঁটা জায়গা নেই। দীপক বলল, চল বাইরে গিয়ে বসি।

বাইরে লোহার চেয়ার পাতা। একটা চেয়ার খ[illegible]ছিল। মলি টেনে বসল। দীপক দেয়ালের কার্নিশে বসল।

বাজনার বিরতি। ব্যাণ্ডের লোকেরা সব বিয়ার নিয়ে বসেছে, ওদের ঘিরে অল্প-বয়সীদের ভিড়।

দীপক গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, এবারে দেশে গেলে তো দিদির সঙ্গে দেখা হবে, কি যে বলব জানি না।

সত্যি দেশে যাবে নাকি?

চল। ঘুরে আসি। চার বছর হয়ে গেল। মনটা ছটফট করছে। তোমার করে না?

করে, আবার করেও না। মনটা যেন কোথাও বসে না। কেমন যেন ছন্নছাড়া লাগে। মলি ছোট্ট গ্লাসে তরল সবুজ শাত্রুজে

ঠোঁট ভিজিয়ে আনমনা হয়ে গেল।

রাস্তার ওপাশে ছোট্ট একটা পার্ক খুব যত্ন করে সাজানো। নানা রঙের ফুলের বাহার। এতদিন আছে এ দেশে তবুও কিছুতেই ও ফুলের আর গাছের নাম মনে রাখতে পারে না। তরুণ জীবনে কৃষ্ণস্বামী ওকে এ দেশের ফুল চেনাবার চেষ্টা করেছিল। মাসিকে লুকিয়ে পার্কে-পার্কেই তো ওদের দেখা হত। সেণ্ট জেমস পার্ক, হাইড পার্ক, গ্রীণ পার্ক, হল্যাণ্ড পার্ক, সার্পেণ্টাইন লেকে বোট চড়া। কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে সে লণ্ডনকে ভালবেসে ফেলেছিল। মনের কোথায় মাসির জেনে যাওয়ার ভয় সব সময় থাকত, কিন্তু যতটুকু সময় কৃষ্ণর সঙ্গে থাকত প্রতিটি মুহূর্ত যেন ফুলে-ফুলে ফুটে থাকত। ঝড়, বৃষ্টি, স্মগ, স্নো কিছুই যেন এসে যেত না।

কৃষ্ণ এখন কোথায় থাকে? মাদ্রাজে? সেও কি বিয়ে করে ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখে আছে! সে কি কখনো মলির কথা হঠাৎ হঠাৎ ভাবে? ভাবতে ভাল লাগে যে সে ভুলে যায় নি। মলি যে মাসির/ভয় কাটিয়ে ওর সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে নি, কৃষ্ণ কি সেজ[redacted]ক ক্ষমা করেছে?

কৃষ্ণ যাবার আগে শেষ দিন, হাইড পার্কে মলির হাত দু হাতে তুলে নিয়ে বলেছিল, লীনা, তুমি আজ নিশ্চয়তা ছেড়ে চলে আসতে ভয় পাচ্ছ। একদিন আশা করি বুঝবে নিশ্চয়তা তোমার নিজের মধ্যেই আছে। কেউ তোমাকে প্লেটে করে উপহার দেবে না। সারা জীবন কি তোমার ভয়ে ভয়েই কাটবে? আমার সঙ্গে চলে আসতে তোমার ভরসা হল না লীনা!

মেয়েরা অল্প বয়সে যেমন করে কাঁদতে পারে, মলি ঝর ঝর করে কেঁদেছে, কৃষ্ণর শার্ট ভিজেয়ে কেঁদেছে। খেয়াল করে নি লোকজন আড়চোখে দেখে যাচ্ছে।

চল। রাজি থাক, এক্ষুণি আমার সঙ্গে এস। মাসির কাছে

ফিরে যেও না।

মলি কেঁদেই চলেছে।

কৃষ্ণ ওর পিঠ থেকে হাত সরিয়ে বলেছে, অনেক হয়েছে। ওঠ। যাক।

মলি ওকে দু হাতে আঁকড়ে ধরেছে।

চল। কৃষ্ণ ঠাণ্ডা গলায় বলেছে। আণ্ডার গ্রাউণ্ডে নেমে টিকিট কেটে দিয়েছে, তুমি যাও। আমি পরে বাড়ি ফিরব।

আমার সঙ্গে একটুখানি এস।

না, লীনা, হয় তুমি আমার সঙ্গে এস, না হলে, তুমি একা তোমার মাসির কাছে ফিরে যাও।

মলি উত্তর দেয় নি। নিচে নামা চলন্ত সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

গুড বাই। কৃষ্ণ ওকে স্পর্শ না করে বড় বড় পা ফেলে উপরে উঠে গেছে।

আর কোনোদিনও কৃষ্ণর সঙ্গে দেখা হয় নি। লীনা ফোন করেছে সাতদিন ধরে, ল্যাণ্ডলেডি রুক্ষ ব্যবহার করেছে, তাও সে ফোন করেছে। যাবার আগে আরেকবার কৃষ্ণ যদি দেখা করে। আবার ফোন করেছে। কৃষ্ণ লণ্ডন ছেড়ে চলে গেছে ভারতের মুখে।

কি ভাবছ এত ময়লা ?

আবোল-তাবোল। মলি হলুদ আর লাল টুলিপ ফুল থেকে চোখ সরিয়ে বলল। দেশ থেকে যদি কোনোদিনও পা না বাড়াতাম জীবন কেমন হত কে জানে!

দীপক বিয়ারে মুখ ডুবিয়ে বলল, দেশের কথা ভাবছিলে ?

দেশ আমার কোনটা বল ? জন্ম রেঙ্গুনে, ছেলেবেলার অর্ধেকটা কেটেছে বর্মা দেশে, তারপর হাঁটাপথে ডিব্রুগড়, মা হারিয়ে কলকাতা, লণ্ডন, কলকাতা, মেলবোর্ন কলকাতা লণ্ডন। 'ভয়'

তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের।

ভয়? ভয় কেন বলছ?

মলি সে কথার জবাব না দিয়ে খাপছাড়া ভাবে বলল, কলকাতায় যেতে আমার খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু ফিরে যেতে ভয় করে। বেড়াতে যখন যাই, ভাল লাগার মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি লেগে থাকে। সবাই এত আদর যত্ন করে, পাল্লা দিয়ে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। আমরা নিজের দেশেরই কেমন যেন অতিথি হয়ে গিয়েছি।

এবার চল দেশে গিয়ে একটু ঘুরে বেড়াব! ভারতবর্ষের কতটুকুই বা আমরা দেখেছি।

আমাকে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাবে?

চল। যাব। শুনছি স্টারলিং-এ ট্রেনের টিকিট কাটলে নাকি বেশ সস্তায় দেশ ঘোরা যায়। তোমার বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে গেল! দীপক হেসে বলল।

তোমার খারাপ লাগবে?

মনে হয় লাগবে না। ভদ্রলোককে দেখার কৌতূহল আছে।

আজ দুপুরে লুইসাকে ফোন করেছিলাম। মলি কথা ঘোরালো।

কি বলল?

রাণার চিঠি এসেছে। ও আর ফিরবে না। আচ্ছা বন্ধু তোমার! একসঙ্গে যখন দেখতাম বৌ থেকে তো চোখ সরাতো না!

লুইসা কেমন আছে?

মনে হল তো ভাল আছে। বাড়ি বিক্রির জন্যে ভাবনায় পড়েছে। বাজার নাকি টাইট।

আরেকটা শাত্রুজ নেবে?

না। তুমি যাচ্ছ যখন আমার জন্যে টমাটো যুস উস্টার সস দিয়ে নিয়ে এস।

পুরোদমে পপসঙ্গীত চলেছে। গানের একটা কথাও বোঝা যায় না। বাইরে বসে মনে হচ্ছে ছেলেটা চেঁচিয়ে মরছে কেন? কি বলতে চাইছে ওরা?

দীপক ফিরে এসে একটা খালি চেয়ার টেনে বসল। চারদিকে পটেটো চীপস-এর ব্যাগ ছড়ানো, কোক-এর স্ট্র। ইংরেজরাও আজকাল নোংরা হয়ে গেছে।

তুমি রাণাকে একটা চিঠি দাও।

দেব ভাবছি। কি লিখব জানি না।

তোমার কি মনে হয় রাণা সত্যিই ফিরে আসবে না?

মনে হচ্ছে তাই। ও সহজে মন ঠিক করে না, মন বদলায়ও না।

এত বড় চাকরি, এত সুন্দর বাড়ি, স্ত্রীকে ছেড়েছুড়ে চলে গেল। ওদের বিয়েটাই ভুল। লুইসা ওর চেয়ে এত বড়, ওর পাশে রাণাকে বাচ্চা ছেলে দেখাতো।

লুইসা বয়সে বড় বলেই হয়তো রাণা ওকে বিয়ে করেছিল। সমবয়সীতেও তো বিয়ে ভাঙে।

তা ভাঙে। তোমার কি মনে হয় না লুইসার কলকাতায় গিয়ে রাণার সঙ্গে বোঝাপড়া করা উচিত!

অন্য মেয়ে হলে বলতাম 'হ্যাঁ'। কিন্তু লুইসা যাবে না। হয়তো এমনভাবে বিয়ে ভাঙ্গাটাই ওদের দরকার ছিল। চল, এই রবিবার ওকে দেখে আসি!

না। লুইসা বলেছে ও একা থাকতে চায়। ভাবার সময় চায়। মলি টমাটো যুস খেয়ে বলল, আমি একা একা ভাবতে গেলে তো পাগল হয়ে যেতাম। মলি একটু চুপ করে আবার বলল, তুমি এ ভাবে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে?

দীপক মলিকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, মরে যেতে পারি। ছেড়ে যাব না। চল, বাড়ি চল, আবোল তাবোল না বকে।

চল।

সে রাত্তিরে ওরা অনেক আদর করে ভালবাসল। মলি স্বপ্ন দেখল কৃষ্ণস্বামী ওকে জড়িয়ে ধরেছে। দীপক গভীর সুখে স্ত্রীকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এগারো

মলির মামাতো ভাই-বোন রীতা আর অতনু এ দেশের স্কুল কলেজে পড়ে। রিতা 'এ' লেভেল পাস করে পোর্টসমুথ কলেজে ঢুকেছে, অতনু লণ্ডনের ইলিং পলিটেকনিকে ফটোগ্রাফি পড়ছে। অতনু সচরাচর আসে না। তনু থাকতে তাও মাঝে মাঝে আসত। রীতা দেশে যাবে গ্রীষ্মের ছুটিতে, সাতদিন থেকে যাবে মলির কাছে।

মলি খুব খুশি রীতা এসেছে বলে। দীপকও ব্যস্ত হয়ে এটা ওটা কিনে আনে, ওকে এখানে-সেখানে বেড়াতে নিয়ে যায়।

মলি তাড়াতাড়ি কাজ থেকে ফিরে রান্না করতে বসল। সারাদিন হাসপাতালে খুব খাটুনি গেছে। তবু ভাবল, রীতা কতদিন দেশি রান্না খায় না। ও রান্না করতে করতেই রীতা ফিরে এল অক্সফোর্ড স্ট্রিট থেকে 'শপিং' করে। মা-বাবা বন্ধুদের জন্যে লিস্ট ধরা শপিং।

খুব শপিং করলে দেখছি আজকে? দুপুরে খেয়ে গিয়েছিলে তো?

হ্যাঁ।

কোক আছে ফ্রিজে।

নিচ্ছি। ব্যাগগুলো উপরে রেখে আসি।

রীতা কোক হাতে আর মলি রান্না করতে করতে গল্প করতে লাগল। কলেজের গল্প। দেশের গল্প। মামা-মামিমার গল্প। রীতা ক্ষোভের সঙ্গে বলছিল, সে খুশি যে সে এ দেশে পড়তে

এসেছি, দেশে কোনো স্বাধীনতা নেই মলি দি। এ দেশে এসে আমার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। দেশে সব সময় মা-বাবা কানের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে। কোনো কিছুই নিজে মন ঠিক করে করার উপায় নেই। যেন আমি এখনো একটা বাচ্চা!

মলি রীতাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলল, আমরা ভুলে যাই যে ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। আমরা হয়তো অনেক সময়ে অযথা চিন্তা করি। কিন্তু তোমাদের ভালর—

জন্যেই কর এই তো! রীতা যোগ করে দিল। মা সব সময় বলবে, কিনা করেছি তোমাদের জন্যে। আমাদের ছোটবেলায় আমরা এ পাই নি সে পাই নি। সব সময় এক কথা, ভাল লাগে? তনুকে তুমি দিব্যি প্যারিসে যেতে দিয়েছ। যেন আমার কলকাতার বন্ধুরা সব নিষ্পাপ। যত পাপ যেন এ দেশে।

আমাদের দেশের মূল্যবোধ তো অন্যরকম রীতা। তাই তোমার মা-বাবা হয়তো ভয় পায় যে—

মূল্যবোধ হয়তো এককালে অন্যরকম ছিল। এ দেশে ওরা যা খোলাখুলি ভাবে করে, আমার বন্ধুরা কলকাতায় লুকিয়ে, মিথ্যে কথা বাড়িতে বলে নিজেদের অনেক বেশি সস্তা খেলো করে দেয়।

দেশে কি আজকাল—মলির কথাগুলো হাওয়ায় ঝুলতে লাগল।

মলি দি, রীতা বলল, তুমি দেশে বেড়াতে যাও, জানতে পার না কলকাতায় কি হচ্ছে, কি চলছে। মা বাবা যেন চোখ বুঁজে কলকাতায় চলাফেরা করে।

দীপক কাজ থেকে ফিরে দেখল মলি আর রীতা গল্প করছে রান্না ঘরে।

কি অক্সফোর্ড স্ট্রিট কিনে এনেছ বুঝি আজকে?

উঃ যা ভিড় না! সারা কলকাতা যেন 'সেলফ্রীজে' গিজ গিজ

করছে। দু জন স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, যার বন্ধুরাও এসেছে।

ওরা কি সব এখানে থাকে?

না, সব কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে। একজন এসেছে বিয়ের বাজার করতে!

তাই বুঝি! দীপকের কলকাতার সঙ্গে রীতার কলকাতার কোনো মিল নেই। কোথায় শ্যামবাজার আর কোথায় আলিপুর। কলকাতা থেকে বিয়ের শপিং করতে লণ্ডনে!

আমি কিছু করব নাকি?

না, রান্না হয়ে গেছে। রীতা তুমি টেবিলটা ঠিক করে দাও না!

রীতা বাংলায় কথা বলে না। দেশে মিডলটন রোর লরেটোতে পড়েছে। স্কুলে বাধ্য হয়েছে বাংলা লিখতে-পড়তে, খুব অনিচ্ছার সঙ্গে শিখেছে সে। ওরাও ইংরেজিতে কথা বলে রীতার সঙ্গে।

খেতে বসে দীপক জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগছে পোর্টসমুথ?

ভীষণ খারাপ। আমি যে হলে আছি সেখানে একজনও ভদ্র ছেলেমেয়ে নেই।

দীপক বোঝার চেষ্টা করছিল রীতা কি বলছে। মলি দীপককে চোখ টিপে বলল, প্রাইভেট স্কুলে পড়া কোনো ছেলেমেয়ে নেই ওদের হস্টেলে।

রিয়েলি? দীপক তবুও যেন বুঝল না। ওদের সঙ্গে কথা বলা যায় না। অসভ্যের মতো ব্যবহার করে। মাতলামি করে। বার-এ চেঁচামেচি করে। আমি স্টেরিও একটু চালালেই দরজায় ধাক্কা দেবে!

তোমার স্কুলের বন্ধুরা কেউ ওখানে যায় নি?

না। আমি উইক-এণ্ডে ওদের কাছে পালিয়ে যাই। পোর্টসমুথে থাকলে পাগল হয়ে যাব।

ওদের সঙ্গে মিশতে না পারলে থাকা তো মুশকিল হবে তোমার ওখানে!

মলি তাড়াতাড়ি বলল, কলকাতায় বাড়ি থেকে স্কুলে গেছে। এখানে বোর্ডিং স্কুলে পড়েছ, কলেজের জীবন একেবারে অন্যরকম। প্রথম প্রথম একটু তো অসুবিধা হবেই। মলি ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল, দেখ কিছুদিন পরে তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।

ওদের সঙ্গে কি বন্ধুত্ব হবে জানি না। রীতা মুখ ফুলিয়ে বলল, যে মেয়েটাকে আমার ভাল লাগে ওর বাবা হচ্ছে লণ্ডনের বাস ড্রাইভার।

তনি-তপু তো বলে এ দেশের কলেজের জীবন খুব ইণ্টারেস্টিং। কত ধরনের ছেলেমেয়ে, কতরকমের ক্লাব।

তনি বেশ মজা করে প্যারিসে আছে। আমার খুব যাওয়ার ইচ্ছা ছিল এই ছুটিতে।

যাও না কেন ?

মা-বাবা দেবে না। গরমে টোস্ট হতে হবে কলকাতায়। শুনছি ষোল ঘণ্টা করে লোডশেডিং। এয়ার কণ্ডিশনার চলে না, ফ্রিজ বন্ধ। যা অবস্থা না। জেনারেটর চলে একটা ঘরে শুধু।

দীপকের মনে পড়ল, শ্যামবাজারের বাড়িতে সেকি উত্তেজনা, দীপক যেদিন অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসে দুটো সিলিং ফ্যান কিনে নিয়ে এসেছিল।

তোমার আজকে ছুটি। মলি বলল দীপককে। তুমি চা করে নিয়ে বস। রীতা বাসন না হয় তুলে দেবে, আমি মেজে দেব।

ওরা গল্প করতে লাগল। তোমার দেশে যেতে ইচ্ছে করে না বুঝি ?

হ্যাঁ, তা করে। গরমে যেতে ইচ্ছে করে না। আবার খ্রীস্টমাসের ছুটিতে তো যাবই। ইচ্ছা ছিল প্যারিসে যাব বন্ধুদের সঙ্গে, তা হবে না।

প্যারিসে তো তুমি গেছ।

হ্যাঁ, সে তো মা-বাবার সঙ্গে ইয়োরোপ ঘুরেছি। কিন্তু বন্ধুদের

সঙ্গে যাওয়া আলাদা।

তা বটে।

তনি কবে ফিরবে?

এই তো সেপ্টেম্বরে ফিরে আসবে।

ফোন বেজে উঠল। রীতা দৌড়ে গেল ফোন ধরতে। তার আগেই দীপক ডেকে বলল, রীতা তোমার ফোন।

দীপক রান্নাঘরে ফিরে এল। ছেলের গলা। ঘরে থাকলে রীতার কথা বলতে অসুবিধা হবে।

তোমার তো রীতার সঙ্গে খুব ভাব দেখি।

তনি তো বসে আমার সঙ্গে গল্প করে না। মলি অনুযোগ করে বলল।

এবার ফিরে আসলে তুমি বসে গল্প কর।

দু সপ্তাহ হয়ে গেল, কোনো চিঠি নেই। কেমন আছে কে জানে।

ভালই আছে। দীপকই বলল, অল্প বয়সে নিজেদের জীবন নিয়ে ওরা বড় ব্যস্ত থাকে। ভুলেও যায় যে মা-বাবা চিন্তা করে।

বললে বলবে, চিন্তার কি আছে। খারাপ খবর থাকলে তো জানবেই। তপুর কথা! এমন লক্ষীছাড়া ছেলে!

তুমি এখনো ছেলের ওপর রাগ করে আছ?

মলি উত্তর দেয় না। রাগ আর অভিমান কি এক, মলি মনে মনে ভাবে, অভিমান আর হতাশা? শব্দ দিয়ে কি সবসময় অনুভূতি প্রকাশ করা যায়? মলি নিজেকেই প্রশ্ন করে।

বাসন মাজা, গোছানো হয়ে গেছে। রীতা কথা বলে চলেছে। দীপক চা বানিয়ে বলল, এখানে বসেই চা খেয়ে নেওয়া যাক। ফোনে যে ওরা কি এত কথা বলে জানি না।

তুমি তো অল্প বয়সে প্রেম কর নি, তুমি কি করে জানবে?

ফোন বলে বস্তু ছিলও না আমাদের বাড়িতে। ওর মা-বাবা কি

জানে ওর প্রেমের কথা ?

হার্টফেল করবে শুনলে! মলি হেসে বলল, ইংরেজ বয়ফ্রেণ্ড! ও বলতে ভুলে গিয়েছি অতনু এসে খাবে কাল রাত্রে।

নক্সালবাড়ি ছেড়েছে মনে হয় এ দেশে এসে!

মনে তো হয়। মামা অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে জেল থেকে ছাড়িয়ে ওকে এ দেশে পাঠিয়েছে।

রীতা ফিরে এসে বলল, কাল সন্ধ্যাবেলা আমি একটু বেরোব।

কাল যে অতনু আসবে বললাম।

আঃ, রীতা বিরক্ত হয়ে বলল, ফোন করে বলে দিচ্ছি রবিবার আসতে।

ও যে রবিবার স্কটল্যাণ্ডে চলে যাবে দু সপ্তাহের জন্যে।

অতনুটা সবসময় জ্বালায়। এসেই লেকচার দিতে শুরু করবে। দেশ থেকে পালিয়ে এসে ফুর্তি করছে আর আমাকে বড় বড় কথা। রীতাই একটু ভেবে আবার যোগ করল, না দেখা করলে আবার মা-বাবা রাগ করবে! ঝামেলা। আমি একটা ফোন করে বারণ করে দিচ্ছি আমার বন্ধুকে।

দাদাকে বিশেষ পছন্দ করে না মনে হচ্ছে। দীপক মন্তব্য করল।

আবার আধঘণ্টা খানেক ঘর বন্ধ। দীপক বলল, আমি শুতে যাচ্ছি। তুমি রাত করো না।

না, চল। আমিও যাচ্ছি।

চল। দীপক খুশি হয়ে বলল।

দীপক রোজকার মতো সবার আগে উঠে চা করে খবরের কাগজ নিয়ে বসল। আজকে শনিবার। ক্লিনিকে দৌড়ুতে হবে না।

এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে চাকরি করে করে দীপক ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। দিন নেই রাত নেই খালি ডিউটি কল।

শিশু রোগের বিশেষ হওয়ার একটা পরীক্ষা পাশ করে দ্বিতীয় পরীক্ষায় দু বার ফেল করে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিল। নিজের ছেলেমেয়ের মুখ যদি দেখতে না পাই, বইয়ে মুখ ডুবিয়ে রেখে লাভ কি! দীপক জানে, মলি মনে মনে হতাশ হয়েছে, কিন্তু মুখে বলেছে, তোমার যা ভাল মনে হয় কর। তখনকার দিনে জি. পি, প্র্যাকটিসে এমারজেন্সি সার্ভিস ছিল না, দিন রাত কল-এ থাকতে হত। দীপক একদিন মলিকে বলল, কমিউনিটি হেলথ অফিসারের চাকরি আছে একটা, ভাবছি অ্যাপলাই করব কিনা।

কি ধরনের কাজ ওটা?

স্বস্তির কাজ বলতে পার। বলতে গেলে নটা পাঁচটা, স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, হাসপাতালে ক্লিনিক নেওয়া। কিন্তু প্র্যাকটিসের মতো অত টাকা নেই। কোনো বাড়তি নেই।

তোমার যদি পছন্দ হয় অ্যাপলাই করে দাও।

তোমার আপত্তি নেই তো!

বাঃ, আপত্তি কেন করব?

টাকা কম, স্টেটাস কম?

তা হোক, কাজ করেই তো সারা জীবন কাটবে, যাতে তোমার সুখ সেই কাজই কর।

সময়ও পাব পড়ার। আবার পরীক্ষা হয়তো দেব। দেশে ফেরারও সুবিধা হবে ডিগ্রি নিয়ে।

ভালই তো!

সেই থেকে দীপক কমিউনিটি হেলথ অফিসার। চাকরি করে সে পরীক্ষা পাশও করেছে। সে এখন পুরোপুরি শিশুরোগের বিশেষজ্ঞ।

দীপক কাগজে পড়ল নার্সরা খুব আপত্তি করছে, ওদের চোদ্দ পারসেণ্ট মাইনে বেড়েছে, ডাক্তারদের বেড়েছে তিরিশ পারসেণ্ট। দীপক খুশি হয়েছে নিজের মাইনে বাড়াতে। কিন্তু এও জানে যুক্তি-সঙ্গত ভাবেই নার্সরা রাগ করবে, ডাক্তারদের প্রতি ওদের মন

আরো বিষিয়ে যাবে। থ্যাচার এটা ভাল করে নি।

চিঠি এসেছে কি না দেখেছ? মলির ভোরবেলার গান।

দেখছি।

তনির চিঠি, তপুর কার্ড। দীপক তনির চিঠি খুলতে খুলতে উপরে উঠল। সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল আর কি। এ দেশের সিঁড়িগুলো বড় সরু সরু।

এই নাও দু জনেরই চিঠি এসেছে। ভাগ্য খুব ভাল আমাদের আজকে।

তনি লিখেছে: প্রিয় বাবা, আমি খুব ভাল আছি। ফরাসি আগের চেয়ে অনের ভাল বলতে পারি, লেখা ও পড়াও অনেক সহজ হয়ে গেছে। ক্যামু পড়ছি। অদ্ভুৎ লেখক। ওর কথা লোকে প্রায় ভুলেই গেছে।

মিশেল, আমার বন্ধু হয়তো লণ্ডনে যাবে এক সপ্তাহের জন্যে। তোমাদের কি অসুবিধা হবে ওকে রাখতে? ও শুধু রাতে শোবে সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে যাবে। কোনো অপত্তি থাকলে আমাকে জানিও। ডিক কি তোমার সঙ্গে দেখা করেছে? ওর যা ভোলা মন ওকে কোনো বিশ্বাস নেই।

প্যারিসে ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি পড়ছে। এ দেশের সরকার সব ইমিগ্রেন্টদের তাড়াবার চেষ্টা করছে। ছাত্রমহলে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। আমি মিছিলে যোগ দিয়েছিলাম। চিন্তা কোরো না সে জন্যে। জার্মানি. সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বৃটেন এরা সব এক। সভ্যতার বড়াই করে। দরকারের সময় গেস্ট ওয়ার্কারদের ডেকে ডেকে এনেছে, কম পয়সা দিয়ে কাজ করায়, স্লামে রাখে, এখন লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে চাইছে।

ভাবতে পার লণ্ডনের কেটারিং, আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে, ন্যাশনাল হেলথ কালো আর ওভারসীস লোক ছাড়া চলছে! আমি ভাবছি লণ্ডনে ফিরে অ্যান্টি নাৎসী লীগে যোগ দেব।

'ব্ল্যার পীচ'-এর কি রায় বেরলো দেখলে তো। ন্যাশনাল ফ্রন্ট নিশ্চয় হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

এখন শেষ করছি। মা কেমন আছে? তুমি ও মা আমার অনেক ভালবাসা জেনো। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। আমি এখন অনেক চিন্তা করতে শিখেছি। মাকে পরে চিঠি দেব।

তোমাদের

তনু

কি এত লিখেছে?

পড়। কই তপুর চিঠি দেখি।

তপু কোপেনহেগেন থেকে লিখেছে, আমরা খুব আনন্দ করে বেড়াচ্ছি। কালকে নরওয়ের দিকে রওনা হব। দেখা হবে। ভালবাসা। তপু।

তপুর চিঠি বড় সংক্ষিপ্ত। চিরকাল তনি কখনো-সখনো বড় করে চিঠি লেখে।

হাঃ, লণ্ডনে এসে মিছিলে যাক, মলি বলল, পুলিশের ট্রাঞ্চন খেয়ে মরুক আর কি ব্ল্যার পীচ-এর মতো। প্যারিসে গেছে ভাষা শিখতে, থাকতে তো নয়, ওর কি দরকার এ-সবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার। ওকে লিখে দাও চলে আসতে।

আমি লিখলাম, আর মেয়ে ফিরে এল! নিজে চিন্তা করতে শিখেছে, পড়লে না?

চিন্তা করুক। মিছিল, মিটিং করার কি দরকার! একেকজন একেক রকম হয়েছে।

রীতা ওঠে নি?

রীতা উঠতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। চল বাজার করে আসি।

তুমি যদি গাড়ি চালানোটা শিখতে! দীপক আফশোস করে বলল।

শিখব। রোববার থেকে। হলিডের টাকা দিয়ে শিখব।

কই আমাকে বল নি তো!

তোমাকে সারপ্রাইজ দেব ভাবছিলাম।

বেশ বেশ। চল। তবে আর ক-মাস পরে তো তুমি একাই বাজারে যেতে পারবে।

হ্যাঁ, আমি একা-একা ঝোলা বয়ে মরি আর কি!

কত করে নিচ্ছে লেসন?

পাঁচ পাউণ্ড একেক লেসন।

এত বেড়ে গেছে?

ফোন বেজে উঠল। দীপক নিচে নেমে ফোন ধরে বলল, মলি ক্যাথি ফোন করেছে।

আসছি।

হ্যালো, ক্যাথি? কি খবর কেমন আছ?···হ্যাঁ, নিশ্চয় চলে এসো।···না, না অসুবিধা আবার কি? রাত্রে থেকে যাবে। শাশা ভাল আছে তো? নিয়ে এসো! খুব···খুব ভাল। চিয়ারস।

মলি দেখল দীপক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

কি, হাসছ কেন?

তোমার তো আজ পোয়া বারো। পোষ্যকন্যা আসছে, আদরের মামাতো ভাই বোন আসছে! তপু-তনির চিঠি এসেছে। 'চিয়ারস' কি ক্যাথির থেকে শিখলে বুঝি?

বা, আজকাল তো অনেকেই বাই বাই-এর বদলে 'চিয়ারস' বলে! ক্যাথি আসলে আমি নিশ্চিন্ত, ওকে কিছু বলতে হয় না। খাটুনির কথা ভাবলে আর লোকজন ডাকতে ইচ্ছা করে না এ দেশে। চল বাজার করে আসি।

বাজার করে ওরা ফিরে দেখে রীতা অমলেট তৈরি করছে নিজের জন্যে। ওদের দেখে বলল, অমলেট খাবে, করে দেব?

না, তুমি খেয়ে নাও। আমরা একটু আরাম করে বসে লাগার

খেয়ে নিই। দীপক, তুমি ফ্রিজে জিনিসগুলো শুধু তুলে দাও, আমি অন্য জিনিসপত্র পরে গুছিয়ে রাখব। আমাকে একটা লাগার দেবে?

বাগানের দরজা খোলা। হাওয়া আসছে। আশি ডিগ্রির ওপর গরম। রীতা অমলেট আর কেক নিয়ে এসে বসার ঘরে বসল।

ভাল ঘুম হয়েছে তো?

খুব মাথা ধরেছে।

ডিসপিরিন খাবে?

খেয়েছি।

জিন আর দেশী সিল্কের সার্ট পরেছে রীতা, চোখের পাতায় নীলাঞ্জন, সুন্দর দেখাচ্ছে। খোলা হাই হিল জুতো।

আমি একটু বেরোব।

এই রোদ্দুরে মাথা ব্যথা নিয়ে বেরোবে?

না, কথা দিয়েছি, যেতেই হবে।

মলি আর কিছু বলল না। ঠাণ্ডা লাগারে অল্প অল্প চুমুক দিতে লাগল। দীপক এসে যোগ দিল। রীতা খাওয়া শেষ করে উঠে গেল।

কি খাবে?

সার্ডিন অন টোস্ট করে দাও।

যাই উঠি। কুঁড়েমি করে লাভ নেই।

ক্যাথি কখন আসবে?

বিকেলে আসবে বলেছে।

আগে আসতে বললে পারতে। তোমার একটু সুবিধা হত।

মলি রান্না ঘরে চলে গেল। স্ন্যাক্স তৈরি করতে।

বিকেল সাতটায় সবাই জড়ো হয়েছে। রীতা এখনো ফেরে নি। ক্যাথি আর মলি খুব গল্প করছে রান্নাঘরে। অতনু

শাশার সঙ্গে বসে খেলা করছে। শাশা মাঝে মাঝে এসে দীপককে নালিশ করছে অতনুর নামে।

ঘরবাড়ি ঝকঝকে, তকতকে। টেবিল পড়ে গেছে। শুধু খাবার দেওয়া বাকি।

ক্যাথির প্রতি মলির খুব দুর্বলতা। ক্যাথি বছর খানেক আগে পা ভেঙে ফিজিওথেরাপি আর অকিউপেশন্যাল থেরাপি নিতে এসেছিল মলির কাছে। সেই থেকে ভাব।

ক্যাথির জন্ম স্কটল্যাণ্ডে। ওর যখন ছ-মাস বয়স, পাঁচজন ছেলেমেয়ে স্ত্রী -রেখে বাবা অন্য পথে হাঁটা দিয়েছে। ক্যাথি কোনোদিনও বাবাকে দেখে নি। জানে না ভদ্রলোক বেঁচে আছে না মারা গেছে। মা ছেলেমেয়ে নিয়ে লণ্ডনে চলে এল। ক্যাথলিক সুতরাং ডিভোর্স নেই। মা খুঁজে পেতে টমকে ঘরে তুলল। এ পক্ষেও তিন ছেলে মেয়ে। টমকে ক্যাথি বাবা বলেই ডেকে এসেছে। যদিও ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বছর পাঁচেক হল।

মা অমানুষের মতো খেটে ঝি গিরি করে টাকা রোজগার করেছে ছেলে মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। ক্যাথলিক বলে সুবিধা হল। ক্যাথি কনভেণ্ট বোর্ডিং স্কুলের বিনে পয়সায় পড়তে লাগল। ওর স্কটিশ অ্যাকসেণ্টে ইংরেজি শুনে ছেলেমেয়েরা ওকে খেপাত। সিস্টার পামেলা বলল, তোমাকে ঠিকমতো ইংরেজি বলতে-শিখতে হবে। কিংস ইংলিশ।

এলোকিউসন ক্লাসের ব্যবস্থা হল। ক্যাথি অপমানে রাগে একদিন স্কুল থেকে পালিয়ে গেল বাড়িতে। সে কি মার, মা থামে তো, টম শুরু করে। তোমাকে এত কষ্ট করে মানুষ করার চেষ্টা করছি আর স্কুল পালানো। ক্যাথিকে মারের চোটে সাতদিন হাসপাতালে কাটাতে হল। সেখান থেকে সোজা কনভেণ্ট স্কুল। ক্যাথি চোখ মুছে, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, দেখাচ্ছি পড়াশুনো।

যত রকমের শাস্তি স্কুলের বইয়ে আছে, সব দিয়েও ওরা

ক্যাথিকে ভদ্র করতে পারল না। মাসে এক উইক-এণ্ড বাড়ি আসতে পারত। ক্যাথি স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে শিখল শপলিফটিং করতে। ধরা পড়ল না। ভাইবোনদের জন্যে টফি, সুইট, নিজের জন্যে সিল্ক স্টকিং, নিকার, ব্রা, লিপস্টিক নিয়ে আসতে লাগল বাড়িতে।

মা একদিন জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় এ-সব পাও ?

বন্ধুরা দিয়েছে।

উদার সব বন্ধুরা তো।

ক্যাথলিক স্কুলে বড়লোক মেয়েরাও তো পড়ে। সরল শিশুর ভাষা ওর চোখে। ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো লালচে চুল, এগারো বছর বয়সেই ও 'নারী' হয়ে গিয়েছে। কে ওকে সন্দেহ করবে শপলিফটিং করছে !

চোদ্দ বছর বয়সে ওর বাচ্চা পেটে এসেছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি থেকে লুকিয়ে ব্যাক স্ট্রিট অ্যাবরশনিস্ট-এর কাছে যাওয়া, ও শিশুর মতো ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিল আর সে কোনোদিনও বড় বয়সের পুরুষমানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবে না। পনেরো বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে নার্সিং-এ ঢুকল। আর ওকে পায় কে ? ও ড্রাগ নিতে শুরু করল। প্রথমে সফট, তারপরে হার্ড ড্রাগ। অ্যাসিড-এর নেশা ছাড়িয়েছিল ওর আর্টিস্ট বন্ধু। ততদিনে নার্সিং চুলোয় গেছে। এখনো ভাবলে ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভীষণ নেশা, কী ভীষণ কষ্ট ছাড়ার !

বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় নেই। টম সাতদিন কাজ করে—সে টাকায় পরের সাতদিন মদ খেয়ে বুম হয়ে থাকে। নেশা ছুটলে ক্যাথির মাকে পিটোয় আরো পয়সার জন্যে। ক্যাথি সেদিন হঠাৎ গিয়ে পড়েছিল বাড়িতে। অনেক সহ্য করেছে ছেলেরা। আর না। ওরা পিটিয়ে টমকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। শাসালো, এ মুখো হলে খুন হয়ে যাবে। টম আর সত্যিসত্যি সে-মুখো হয় নি।

ক্যাথির সঙ্গে দেখা হয়েছে দু-চারবার পিকাডিলি সার্কাস স্টেশনে। দুই সিঁড়িতে দু জন বোম হয়ে বসে আছে—একজন অ্যাসিড নিয়ে, অন্যজন মদ খেয়ে।

বব লণ্ডনে ছবি আঁকতে এসেছিল বার্মিংহামের কাছে উস্টারশার গ্রাম থেকে। ক্যাথির সঙ্গে দেখা সোহোতে। প্রথম দিনই বব প্রোপোজ করে বসল, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

ক্যাথির সঙ্গে সবাই শুতে চায়, একসঙ্গে থেকে ঘরের কাজ করিয়ে নিতে চায়; কেউ তো বলে নি, যে বিয়ে করবে! ক্যাথি ওর নীল চোখে আলো জ্বালিয়ে বলল, করব।

দু সপ্তাহের মধ্যে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। মা রাজি। ছেলে ভদ্রলোক মনে হয়। হোক না লম্বা চুল, নোংরা জিন পরা, খোলা শার্ট। সাড়ে ষোল বছর বয়সে ক্যাথি স্ত্রী হয়ে গেল।

কোথায় থাকব?

বব বলল, চল ক্যারাভানে থাকব।

টানব্রিজ ওয়েলস-এর এক ছোট্ট গ্রামে চাষের মাঠে ওরা ক্যারাভানে ঘর পাতল। ক্যাথির হাতে যাদু আছে। অল্প ক-দিনের মধ্যেই ক্যারাভান সুন্দর স্বপ্নপুরী হয়ে গেল। বব আঁকল, পেন্টিং করল। ওদের বাথরুম নেই, পায়খানা একশ গজ দূরে, জল বয়ে আনতে হয়। এ যেন খেলা ঘর। স্বপ্ন যেন সত্যি হয়ে গেছে। জীবনে এই প্রথম যেন ও বাসা খুঁজে পেয়েছে।

বব মাস দুয়েক পরে একদিন এসে বলল, আমি ওয়ার্টফোর্ডে যাচ্ছি। যাবে?

ওয়াট ফোর্ড কোথায়?

ওখানে কৃষ্ণ মন্দির আছে। ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকব ভাবছি।

সেকি? ক্যারাভান কি হবে?

বিক্রি করে দাও।

এ আমার ঘর, আমার সুখ, আমার প্রেম, বিক্রি করে দেব ?

তবে থাক পড়ে। পরে এসে আবার থাকা যাবে।

না, তুমি যাও। পরের বার আমি যাব।

ঠিক আছে। বব ওর লোটা-কম্বল নিয়ে রওনা দিল।

ও যাবে বলেছে, কিন্তু সত্যিই যে যেতে পারে ক্যাথি ভাবতে পারে নি। ও দু দিন ক্যারাভ্যানে বসে হাউ হাউ করে কাঁদল। খেল না, কারুর সঙ্গে দেখা করল না। ভাবল মরে যাবে। বেঁচে থেকে লাভ কি ? এ যেন বালিতে দুর্গ তৈরি করা। ভ্যালিয়ম-এর ওভারডোজ নিয়ে ঘুমলো দু দিন।

টলতে-টলতে পেচ্ছাব করতে যাবে, এমন সময় অন্য ক্যারাভ্যানের টিনার সঙ্গে দেখা।

তুমি বেঁচে আছ তাহলে ?

আছি তো মনে হচ্ছে। ক্যাথি জোর করে ঠোঁটে হাসি রেখে বলল।

রাত্রে বারবেক্যু পার্টি দিচ্ছি, চলে এস।

আমার শরীর ভাল নেই।

দূত্তোর শরীর ! হাশিশ-এ টান দিলেই শরীর ভাল হয়ে যাবে। তুমি আমার স্যালাড তৈরি করে দেবে।

আচ্ছা। ক্যাথি ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে বলল। ও টিপির ওপরে গিয়ে বসল। দুটো পাশাপাশি ক্যারাভ্যান, অন্য পাশে আস্তাবল। টিনা ঘোড়াদের দেখা শোনা করে। চিঁ হিঁ করে একটা ঘোড়া ডাকছে, শীত করছে বোধহয় ওদের। অন্য পাশে গমের ক্ষেত, উঁচু নিচু জমি দূরে দূরে চলে গেছে যতদূর চোখ যায়। সারা জীবন লণ্ডনের স্লামে থেকেছে, এমন নির্ভেজাল হাওয়া, দূর দিগন্ত সে কোনোদিনও দেখে নি। কত কাছে আকাশ, যেন জড়িয়ে আছে।

ক্যাথির হঠাৎ ভীষণ ভয় করতে লাগল। কিসের ভয় সে জানে

না। পেটের নাড়িভুঁড়ি যেন উপরে উঠে আসবে, বুক ধড়ফড় করছে, ঘাম দিয়ে ওর সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ওর ইচ্ছে করল দৌড়ে ক্যারাভ্যানের ভিতর চলে আসে। কিন্তু ও একটা আঙুলও নাড়াতে পারল না।

জমির মালিক হার্মার টমাস পিছন থেকে ডেকে উঠল, ক্যাথি।

ক্যাথি সাড়া দিতে পারল না।

টমাস ওর কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বলল, কি হয়েছে তোমার ক্যাথি?

ও শুধু মাথা নাড়ল।

এ ঠাণ্ডায় এখানে বসে আছ, হিম পড়ছে, ঘরে চল।

টমাস ওকে হাত দিয়ে উঠিয়ে ক্যারাভ্যানে নিয়ে এল।

কি হয়েছে? বব কোথায়?

বব ওয়াটফোর্ডে চলে গেছে।

আবার সেই কৃষ্ণ টেম্পল? ভাবলাম বিয়ে করে ছেলে একটু সুস্থির হবে।

ফিরে আসবে বলেছে।

তা আসবে। ও বেশিদিন থাকতে পারবে না। আমি ভাড়া নিতে এসেছিলাম।

বব সোশ্যাল সিকিউরিটির টাকা তুলে নিয়ে চলে গেছে।

খুব দায়িত্বজ্ঞান হীন তো!

ক্যাথি কিছু বলল না।

টমাস ক্যাথির থুতনীতে হাত দিয়ে বলল, ভেব না। আমি তো আছি।

ক্যাথি সরে এল। 'আমি তো আছি'র মানে ক্যাথি ভাল করেই জানে। সে বলল, ভাড়ার বদলে বব-এর এই পেন্টিংটা নেবে?

টমাস হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, বাঃ সুন্দর পেন্টিং। ভাড়ার

বলে এটাই তাহলে নিচ্ছি। এত ট্যালেন্টেড বব অথচ পেন্টিং বিক্রি করবে না। ধন্যবাদ। কিছু দরকার হলে জানিও।

জানাব। চিয়ারস।

বাই ফর নাউ।

বারবেক্যু পার্টিতে গিয়ে ক্যাথি ভুলে গেল আত্মহত্যার কথা। বন্ধুবান্ধব জুটল অনেক। পরের দিন হ্যাংওভারে ও চোখ মেলতে পারল না। জোর করে বিছানায় উঠে দেখতে পেল সারা ক্যারাভ্যানে গুটি সাতেক ছেলেমেয়ে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। ওর বিছানায় দুটি।

কনকনে ঠাণ্ডা। ও কোনোরকমে উঠে ছোট গ্যাসে আগুনটা জ্বালাল, কফির জল চাপাল। সবাইকেই উঠিয়ে বলল, কফি তৈরি। ঘরে একটা রুটি, বা বিস্কুট, দুধ কিচ্ছু নেই। কালো কফি চিনি দিয়ে খেতে হবে।

একা থাকলে বন্ধুর অভাব হয় না। ট্রানব্রিজ ওয়েলস-এর মতো জায়গায়। ক্যাথির ক্যারাভ্যান আড্ডার জায়গা হয়ে উঠল। বেকার, বড়লোক, ছোটলোক সবাই হাশিশ-এর টান মারতে চলে আসতে লাগল ক্যাথির ক্যারাভ্যানে।

বব হঠাৎ এসে একদিন হাজির। ক্যাথি প্রথমে চিনতে পারে নি। ন্যাড়া মাথায় টিকি, গেরুয়া বসন, গলায় মালা। চিনতে পেরে ক্যাথি ওকে জড়িয়ে ধরে হেসে লুটোপুটি!

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

পালাও তোমরা। ক্যাথি হাসতে হাসতে চোখ মুছে বলল, আমার স্বামী ফিরে এসেছে।

ওরা নেশা নিয়ে পালাল গাইগুই করতে করতে।

হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

ও বব! কি ভীষণ খুশি হয়েছি তুমি ফিরে এসেছ। কিস মি।

প্লিজ কিস মি।

বব হয়ে কৃষ্ণ ভুলে স্ত্রীকে চুমু খেতে লাগল। রাধা ভেবে কি ?

বব আসে যায়। শাশা জন্মাবার পর বেশ কিছুদিন থাকবার পর আবার উধাও।

ক্যাথি ক্যারাভ্যান বিক্রি করে একদিন লণ্ডনে চলে এল শাশাকে নিয়ে। কোর্টে আরেকটা ডিভোর্সের অ্যাপলিকেশন পড়ল। চারটে বিয়ের একটা বিয়ে এ দেশে ভেঙ্গে যায়। ক্যাথি বব-এর বিয়ে ভাঙ্গা স্ট্যাটিসটিকসে উঠল, সেই সময়ে মলির সঙ্গে দেখা। স্বপ্ন ভাঙ্গা, ঘর ভাঙ্গা ক্যাথি।

মলি ওকে মেয়ের মতো, বন্ধুর মতো জড়িয়ে নিল। তনিকে মেয়ে হিসেবে পায় নি, ক্যাথিকে পেয়েছে!

রীতা ঘরে ঢুকে ঝপ করে সোফায় বসল ক্লান্তির নিশ্বাস ছেড়ে।

উঃ কি গরম! ও ঘরকে উদ্দেশ করে বলল শপিং ব্যাগ পাশে রেখে।

কি খুব বাবার পয়সা ওড়াচ্ছ ? অতনু বলল।

বাবার পয়সা বাবার জন্যে ওড়াচ্ছি। তোমার কি ? তোমার পয়সা তো ওড়াচ্ছি না। শাশা সঙ্গে সঙ্গে রীতার শপিং ব্যাগে হাত ঢোকাল।

লিভ ইট এলোন। ক্যাথি গলা চড়িয়ে বলল।

শাশা হাত তুলে নিয়ে মুখে আঙুল দিয়ে বলল, আমার জন্যে খেলনা এনেছ ?

না।

শাশা এদিকে এস। ক্যাথি আবার বলল।

আমার কাছে এস। আমি খেলনা বানিয়ে দেব, এস। অতনু হাত বাড়িয়ে বলল।

শাশা ঝাঁপিয়ে পড়ল অতনুর কোলে।

নৌকো, এরোপ্লেন, বাক্স। কাগজগুলো ওখানে আছে নিয়ে এস।

দশ মিনিট। ক্যাথি বলল। শোবার সময় হয়েছে।

আমার ঘুম পায় নি।

না পাক।

তুমি খুব কড়া মা। কিন্তু অতনু হেসে বলল এরোপ্লেন বানাতে বানাতে।

বাঃ কী সুন্দর! ক্যাথিও শাশার মতো অবাক হয়ে বলে উঠল।

এরোপ্লেন ঘরে উড়ে রীতার মাথায় বসল। রীতা বিরক্ত হয়ে এরোপ্লেনটা ছুঁড়ে ফেলল।

শাশা কাঁদতে শুরু করল। দীপক বসে বসে টি. ভি.-র থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে সব দেখছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল, আরে তোমাদের সঙ্গে তো আলাপ নেই। রীতা-ক্যাথি-শাশা।

হেলোর বিনিময় হল।

শাশা দীপকের কোলে এসে বসল চোখ মুছে।

অনেক হয়েছে। এবার সবাইকে গুড নাইট কিস করে চল উপরে।

শাশা দীপককে আঁকড়ে ধরল।

থাকুক না একটু। দীপক ওর সিল্কের মতো ব্লণ্ড চুলে হাত বুলিয়ে বলল।

আচ্ছা, পাঁচ মিনিট। রীতা তুমি কোথায় থাক?

পোর্টসমুথে পড়ছি।

কি পড়ছ?

ফার্স্ট ইয়ারে। তুমি কি পড়ছ?

আমি শাশাকে মানুষ করার চেষ্টা করছি। ক্যাথি হেসে বলল।

তুমি বড় মডেস্ট ক্যাথি। অতনু বলল। তুমি নিজে নিজে

যথেষ্ট পড়াশুনা কর। স্কুল-কলেজ তো পরীক্ষার পাশের টেকনিক শেখায়, মানুষ হতে তো শেখায় না?

তুমি আমায় কতটুক জান।

বাঃ, সেই বিকেল থেকে তোমার সঙ্গে গল্প করছি। বুঝতে পারি না বুঝি?

তুমি তাহলে কলেজে পড়ছ কেন? রীতা এবার বলল।

টেকনিক শেখার জন্যে। অতনু উত্তর দিল।

এক্সকিউজ মি। শাশা চল। সবাইকে গুডনাইট কিস কর। ক্যাথি উঠল।

শাশা প্রতিবাদ করে চোখের জল না ফেলে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতেই সবাইকে গালে চুমু দিয়ে গুডনাইট করে মার কোলে শুয়ে উপরে উঠে গেল। অতনু জিভ ভেঙচাল, শাশাও সঙ্গে সঙ্গে একগাল হেসে জিভ ভেঙচাল।

দীপক হেসে বলল, শিশুদের হাসি আর কান্না কত সহজেই না আসে।

আমরা বড় হতে হতে কাঁদতেও ভুলে যাই, হাসতেও ভুলে যাই।

স্পিক ফর ইওরসেলফ্। রীতা রাগ করে বলল।

এতক্ষণ ঘরে ঢুকেছ একবারও তো হাসতে দেখলাম না।

কেন রীতা খুব হাসে। আজকে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে আছে। দীপক তাড়াতাড়ি বললে। ভাবল, কই তনু আর তপু তো এত ঝগড়া করে না। মলি কি করছে? কোথায় সে?

তারপর, অতনু বলল দাদার মতো গলায়, পোর্টসমুথ ভাল লাগছে না শুনলাম। ওদের ক্যাম্পাস তো বেশ সুন্দর।

ক্যাম্পাস সুন্দর হলেই বুঝি হয়ে গেল। রীতা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল।

তোমরা গল্প কর। আমি দেখি মলি কোথায়। দীপক অজুহাত

করে উপরে উঠে গেল।

টি. ভি.-টা বন্ধ কর তো। যত বাজে প্রোগ্রাম। রীতা অতনুকে বলল। অতনু টি. ভি. বন্ধ করে বোনের পাশে এসে বসল।

দীপক শোবার ঘরে গিয়ে দেখে মলি ঘুমোচ্ছে। দীপক মলির পাশে বসে মলির চুলে হাত বুলিয়ে বলল, কি, এ অবেলায় ঘুমুচ্ছ কেন?

মলি চোখ মেলে বলল, একটু ঘুমিয়ে পড়েছি। খুব ক্লান্ত লাগছিল।

তোমার খুব খাটুনি গেছে আজকে।

না। তুমি আর ক্যাথি তো আমাকে অনেক হেল্প করেছ। কটা বাজল?

প্রায় আটটা বাজে।

ইস, আমাকে ডাক নি কেন? খাবার দিয়ে দিই। চল।

দীপক ঝুঁকে মলিকে আগলে বলল, থাকি না আর একটু।

না না, মলি চোখ বড় বড় করে বলল, তোমার মতলব ভাল নয়। বাড়ি ভর্তি লোক, বুড়ো বয়সে তোমার প্রেম।

প্রেমের বয়স আছে বুঝি?

নেই নাকি।

না। রিসার্চ বলে সেক্স-এর বয়স নেই। এক্ষুণি টি. ভি.-তে আলোচনা শুনে এলাম।

মলি জোর করে উঠে বলল, তুমি আর তোমার রিসার্চ। খালি পেটে এখন রিসার্চ হচ্ছে!

ঠিক আছে। কথাটা মনে রেখ, তবেই হল। দীপক হেসে উঠে দাঁড়াল।

মলি চুল আচড়ে, ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে নিল।

তুমি এমনিতেই খুব সুন্দর।

তোমার হয়েছেটা কি? বৌকে কবে সুন্দর বলেছ তো মনে পড়ে না! টি. ভি.-তে বলেছে বুঝি বলতে।

ঠিক তাই। দীপক হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নিচে নেমে দেখে অতনু আর ক্যাথি খুব গল্প করছে। রীতা কোক নিয়ে গল্পের বই পড়ছে।

কিছু ড্রিঙ্ক করবে নাকি তোমরা?

তুমি যদি খাও।

ঠাণ্ডা জার্মান ওয়াইন খাওয়া যাক।

মলি নেমে এসে বলল, আমি খাবার দিচ্ছি। খুব ক্ষিধে পেয়েছে সবার তো!

ভীষণ। রীতা বলল।

তোমরা গল্প কর। আমার দশ মিনিট লাগবে।

আমি হেল্প করব? ক্যাথি উঠতে গেল।

না তোমরা বস। সব তো তৈরি আছে। আমি ডাকব দরকার হলে।

রাত এগারোটা বেজে গেছে। ওরা টি. ভি. বন্ধ করে গল্প করছে।

অতনু, তুমি থেকে যাবে নাকি?

না, আপনাদের অসুবিধা হবে।

কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। তুমি তো সোফাতেই শুতে পারবে। দীপক বলল।

অতনু ক্যাথির দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে। আমাকে একটা স্লিপিং ব্যাগ দিলেই হবে।

রীতা কিছুক্ষণ পরে হাই তুলে নিজের ঘরে চলে গেল।

দীপক মলিকে বলল, আমিও শুতে যাচ্ছি।

চল, আমিও যাচ্ছি। মলি হাই তুলে বলল, তোমরা গল্প কর।

সবাই চলে গেলে, ক্যাথি কফি তৈরি করে এনে জমিয়ে বসল, তুমি বলছিলে এ দেশে উন্নতি কেবল উইণ্ডো ড্রেসিং। আমার তা মনে হয় না। আমার মার সঙ্গে যদি আমি তুলনা করি, আমি অনেক ভাল আছি। মাকে তো আমি দেখেছি কি কষ্ট করতে। মা-দের সময়ে তো 'ডোল মানি' ছিল না! হয় কাজ কর, নয় বেশ্যাবৃত্তি কর।

তুমি ডোল্-এ কত পাও?

যা পাই কোনোরকমে চলে যায়। আমাকে ভিক্ষে করতে হয় না। উপোসও করতে হয় না।

তুমি ওটাকে জাস্ট সোসাইটি বল?

একটুও না। টানব্রিজ ওয়েলস্-এ একজনকে চিনি সে বারোটা ঘর নিয়ে বিরাট বাড়িতে স্বামী নিয়ে একা থাকে। ওর বাড়িতে ক্লিনার ছিলাম আমি।

আমি গৃহ-ছাড়া হবার পর আমাকে একটা কটেজ দিয়েছে কাউন্সিল। সিলিং, দেয়াল ভেঙ্গে পড়ছে, দেওয়াল ড্যাম্পে সবুজ, বাথরুম নেই, টয়লেট বাইরে দিয়ে যেতে হয় বরফে, বৃষ্টিতে। শাশা ব্রঙ্কাইটিস-এ ভুগছে। ক্যাথি সিগারেট ধরিয়ে বলল।

তবে?

তবে কি?

তবে বিপ্লব এ দেশে হবে না কেন?

এ দেশের বিপ্লবে মর্জি নেই বলে। এ দেশের ইতিহাস তো পড়েছ। বৃটেনে বেশিরভাগ পরিবর্তন রক্তহীন ভাবে হয়েছে। ম্যাগী থ্যাচার মার-মার কাট-কাট করছে। বেশির ভাগ লোক এখনো বলছে, আহা, ওকে চান্স দাও, সময় দাও। হয়তো থ্যাচারকেই আমাদের দরকার। মানুষ সজাগ হবে। বড়লোক-দের মাইনে বাড়াও, ট্যাক্স কাট, গরিবদের ট্যাক্স বাড়াও, চাকরি

নিয়ে নাও। জাস্ট সোসাইটি বটে।

হ্যাঁ, এ দেশটার ঝাঁকুনি খাওয়া দরকার। তোমরা কলোনির টাকায় বড়লোক হয়েছ, বড় আমেজী হয়ে গিয়েছ।

বড়লোক কে হয়েছে জানি না। আমি কোনোদিনও টাকা চোখে দেখি নি। আমার মা, দিদিমাও দেখে নি। ক্যাথি আরেকটা সিগারেট ধরাল।

অতনু ক্যাথির হাত ধরে বলল, এত স্মোক করছ কেন?

ক্যাথি ওর চোখে চোখ রেখে মুখ টিপে হেসে বলল, তুমি আমাকে নার্ভাস করে দিয়েছ। দেখ, আমার হাত কাঁপছে!

অতনু ক্যাথির হাত মুঠোয় নিয়ে বললে, আমার কাছে এস।

বেশি কাছে না কিন্তু।

বেশ অল্প কাছে।

একটু পরেই শাশার গলা শুনতে পেল ক্যাথি। ক্যাথি সরে এসে কান খাড়া করে বলল, শাশা কাঁদছে।

কই শুনি নি তো!

হ্যাঁ, ক্যাথি এক লাফে উঠে বলল, নিশ্চয় দুঃস্বপ্ন দেখেছে। বব-এর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকেই ওর এমন হয়েছে। ক্যাথি এক মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এসে বলল, গুডনাইট অতনু।

এখনই। সেকি!

কটা বেজেছে জান! রাত তিনটে!

না ঘুমুলে চলে না?

না।

একবার একটু কাছে এস তাহলে।

ক্যাথি দূরে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।

আমি আসতে পারি ?

একটু কিন্তু।

অতনু ওকে বুকে জড়িয়ে বলল, তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে ?

তোমার আমার পথ আলাদা। ওপর নিচ। অনেক ব্যথা পেয়েছি! এখন কিছুদিন বিশ্রাম।

ওঃ ক্যাথি! অতনু ওকে আরো ঘন করে জড়িয়ে বলল আমার জাতও নেই শ্রেণীও নেই।

উপর থেকে এ কথা বলা সহজ অটনু, ক্যাথি অতনুর শক্ত ট্রাউজারকে অনুভব করে একটু আলগা হয়ে বলল, হয়তো শাশা যখন বড় হবে তখন আর ওপর নিচ ওদের করতে হবে না। ক্যাথি ওকে চুমু খেয়ে বলল, গুডনাইট।

ক্যাথি যেও না। আর একটুখানি থাক।

না, আমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। গুডনাইট বলছি আবার।

গুডনাইট! অতনু অনিচ্ছা নিয়ে বলল।

অতনু শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতে কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল—শাশা যদি দুঃস্বপ্ন না দেখত ভোরের আলো হয়তো অন্য রঙে রাঙা হয়ে নতুন দিন হয়ে আসত!

শাশা প্রাণপনে গলা নামিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছে। গলা নামিয়ে কথা বলার কলকাকলীতে দীপকের ঘুম ভেঙে গেল। ওর মনটা সুন্দর স্মৃতিতে ভরে গেল। তনি ছোট থাকতে ভোরবেলা গুটি গুটি করে বিছানায় উঠে দীপকের পাশে শুয়ে ছোট গলায় বকবক করত। মলি হয়তো ঘুমের মধ্যে বিরক্তি প্রকাশ করত, আঃ। তনি ফিস ফিস করে দীপকের কানে কানে বলত, মার ঘুম ভেঙে যাবে ? হুঁ, তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো। তনি একসময়ে বাবার বুকে ঘুমিয়ে পড়ত। বড় তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে

যায়। 'আমি আর কচি খুকুটি নেই, আমি বড় হয়েছি স্বীকার করতে পার না কেন?' তনির অস্থির গলা। তনির আদুরে শিশুগলা কত বেশি সুন্দর, বাবা, তোমার পাকা চুল তুলে দিই? তুমি বুড়ো হয়ে গেছ? তনির আগত তরুণী কণ্ঠস্বর, তোমাদের সেকেলে মন দিয়ে আমাদের বিচার করবে কেন? না, না আমি ভারতীয় নই, আমি বাঙালী নই। আমার জন্ম নিউজিল্যাণ্ডে, মানুষ করেছ এ দেশে, কি করে আশা কর আমি কলকাতার বাঙালী মেয়ে হব? তনির শিশু গলা কোথায়? হ্যাঁ, ভেসে আসছে, বাবা আমি যখন বড় হব না, তোমাকে আমি সোনার কেল্লাতে নিয়ে যাব! খুব বড় একটা সুইমিং পুল থাকবে যেখানে···সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লা দেখে এসে তনি বলেছিল।

দীপক নেমে এসে দেখে ক্যাথি শাশার খাবার জোগাড় করে দিয়েছে। শাশা নিজে নিজেই চামচ দিয়ে কর্ণফ্লেকস খাচ্ছে আর অনবরত বকে চলেছে। ট্রানজিস্টারে পপ-সঙ্গীত হচ্ছে।

সুপ্রভাত ক্যাথি। সুপ্রভাত শাশা।

সুপ্রভাত।

অতনু কোথায়?

চলে গেছে বোধহয়।

সে কি, এত সকালে কারুর সঙ্গে দেখা না করে চলে গেল।

আঃ শাশা। ঠিকমতো খেতে পার না, ফেলছ কেন টেবিলে? কবে যে বড় হবে জানি না।

না, শাশা, দীপক দু হাতে শাশার মুখ তুলে ওর গালে চুমু খেয়ে বলল, তাড়াতাড়ি বড় হয়ো না। দীপক হেসে ফেলে হাওয়া হালকা করে বলল, ক্যাথি, শাশা যখন বড় হবে, তখন কেবলই মনে হবে তোমার ওর শিশুকালের কথা।

ক্যাথি একটু পরে বলল, তনি না থাকাতে তোমার খুব খারাপ

লাগে, না ?

একটু ভাবনা হয় বৈকি ! প্যারিসের মতো শহর—

প্যারিস তো আমার মনে হয় না কিছু বিপজ্জনক জায়গা। তনি যথেষ্ট বুদ্ধি রেখে চলে। নাও চা নাও। ক্যাথি দীপককে কাপ এগিয়ে দিল।

তোমরা দু জনেই বড় বেশি ছেলেমেয়ের জন্যে ভাব। ওরা এখন বড় হয়েছে তো !

সেই কবে থেকে শুনে আসছে দীপক 'বড় হয়েছে' ওদের ছেলেমেয়েরা।

তোমার মা তোমার জন্যে ভাবে না ?

ভাবে বৈকি ? ডিভোর্স যখন করতে গেলাম মার এক কথা, তোমার জীবন যেন আমার মতো না হয়। ছোট যখন ছিলাম, মার ভাবনার সময় কোথায় ছিল ?

এখনো তোমার মা কাজ করে ?

হ্যাঁ, বাড়িতে তিনজন গেস্ট রাখে, চলে যায়। দুটো ভাই এখনো স্কুলে আছে।

আগের মতো আর খাটতে পারে না। তবু পাঁচজনকে বিশেষ করে গেস্টদের সন্তুষ্ট রাখা কি চারটিখানি কথা !

হুঁ, দীপক বলল ঘাড় নেড়ে।

কটা বেজেছে ?

দশটা প্রায় বাজে। দীপক ঘড়ি দেখে বলল।

যাই, মলিকে চা দিয়ে শাশাকে নিয়ে পার্কে ঘুরে আসি।

আমি দেবখন।

বা, তুমি তো রোজই আছ। আমি আজকের সুযোগটা ছাড়ব কেন ?

মলির ভাগ্য ভাল।

মলি ভাল বলেই ওর ভাগ্য ভাল।

মলি বুঝি একাই ভাল।

ক্যাথি হেসে দীপকের গালে চুমু খেয়ে বলল, তুমি তোমার মতো করে ভাল। খুশি ?

দীপক হেসে কাগজের খোঁজে গেল। ফিরে এসে ক্যাথিকে বলল, আমি শাশাকে নিয়ে পার্কে যাচ্ছি। আমিই বা এ সুযোগ ছাড়ব কেন ?

একটু অপেক্ষা কর। আমিও আসছি। মলিকে বলে।

পার্কে শিশু আর মা-বাবাদের ভিড়। কেউ বা একা একা কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। ছোট্ট লেকে হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে, রুটির টুকরো ছিঁড়ে দিচ্ছে কেউ কেউ।

পার্কের ভেতরে শিশুদের পার্ক। অ্যাডভেনচার প্লে গ্রাউণ্ড। শাশা কি খুশি! ক্যাথি মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলা করছে, দোলনা চড়ছে। দীপকও একটু পরে জড়সড় ভাব ঝেড়ে ফেলে যোগ দিল খেলায়।

হঠাৎ খেয়াল হল, ঝলমলে আকাশ মেঘে মেঘে কালো হয়ে উঠছে। দীপক তাড়া দিল, চল বাড়ি ফিরতে হবে।

ওরা ফিরতে ফিরতেই ঝরঝর করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

উঃ কি তোমাদের দেশ! কোন বিশ্বাস নেই, একটু আগে রোদ, আবার বৃষ্টি।

কি মজা বল তো! ক্যাথি ভিজতে ভিজতে বলল।

মলি ওদের দেখে দীপককে বলল, তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। এই বৃষ্টিতে শাশাকে ভিজিয়ে এনেছ ?

শাশা মলিকে জড়িয়ে বলল, বিকেলে পার্কে যাবে আমাকে নিয়ে ?

আগে জামা কাপড় ছাড় তো!

শাশাকে নিয়ে ক্যাথি উপরে চলে গেল। তুমিও কাপড় জামা

ছেড়ে এস। আমি খাবার তৈরি করছি। দেখ তো, রিতা উঠল কি না! অতনু নোট রেখে গেছে।

কি লিখেছে?

এই ধন্যবাদ জানিয়ে। স্কটল্যাণ্ডে যাচ্ছে আজকে। যাও তো তুমি আগে।

দীপক হঠাৎ মলিকে চুমু খেল।

আরে কি ব্যাপার?

অমার মনটা আজকে খুব ভাল লাগছে। দীপক বলল উপরে যেতে যেতে।

আমার কার্ডিগানটা নিয়ে এস। শীত করছে।

বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা। কে বলবে গ্রীষ্মকাল। রবিবারটা নষ্ট। কোথায় সবাই মিলে বেরোবে! মলি সসেজ গ্রীলে দিয়ে দিল।

কি উঠেছ তুমি? ভাল ঘুম হয়েছে তো রিতা?

উঃ! বাচ্চা মেয়েটা যা চেঁচায় না!

আমি তো কিছু শুনতে পাই নি। ওরা যে কখন বেরিয়েছে তাও ভাল করে জানি না। তুমি একটু টেবিলটা ঠিক কর, আমি খাবার তৈরি করছি।

অতনু কোথায়?

ও চলে গেছে।

আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে গেল। কাল তো কথা বলার সুযোগও পেলাম না।

ও স্কটল্যাণ্ডে যাচ্ছে আজকে! তাই বোধহয় তাড়া! বাগানের দরজাটা একটু বন্ধ কর তো, কি হাওয়া আসছে।

ক্যাথি ক-দিন থাকবে?

ও আজ রাত্রে চলে যাবে।

রিতা আবার ট্রানজিস্টার চালিয়ে দিল। ক্যাপিটেল রেডিও!

পপ মিউজিক।

মলি চেঁচানো পপ-মিউজিক দু কানে শুনতে পারে না। তনিতপুর সঙ্গে ঝগড়া লেগেই ছিল। শুনতে হয় নিজের ঘরে গিয়ে শোন! কি যে তোমরা সারাক্ষণ কানে লাগিয়ে থাক! ওরাও নেই, বকাঝকাও নেই। বকাঝকার মধ্যে যে এত আনন্দ ছিল, ওরা না চলে গেলে কি মলি কোনোদিনও বুঝতে পারত!

ক্যাথি নেমে এসে ডিমের পোচ করতে মন দিল।

দীপক সানন্দে 'সানডে টাইমস' পড়ছে। শাশা দীপকের কোলে বসে ছবির বইয়ের পাতা উল্‌টে-পাল্‌টে নিজের মনে গল্প বানিয়ে চলেছে। দুষ্টুমি কোরো না, ড্যাডি রাগ করে চলে যাবে। তুমি যখন ভাল হবে ড্যাডি ফিরে আসবে। আইসক্রিম কিনে দেবে। ড্যাডি দুষ্টু, ড্যাডি কাজে গেছে।

ক্যাথি শুনে বলল, মানুষ করলাম আমি, আর মেয়ে ড্যাডি ড্যাডি করে পাগল।

একেই বলে মেয়ে। মলি হেসে বলল।

সত্যি! ক্যাথি হেসে অনুযোগ করে বলল।

তোমরা জেনারালাইজ করছ। রিতা ট্রানজিস্টার থেকে মুখ তুলে বলল, মেয়ে মানেই বাবার ভক্ত হবে তার কোনো মানে নেই।

ওর কথাই নয়, ওর গলার স্বরে মলি রিতাকে একটু দেখে নিয়ে সসেজ আর টমাটো প্লেটে রাখতে লাগল।

তুমি বুঝি বাবার ভক্ত নও!

তুমি বাবার ভক্ত?

প্রশ্ন করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় বুঝি?

বল না! রিতা জানতে চাইল।

বাবা যে কি বস্তু তা জানার সৌভাগ্যই হয় নি আমার। বলব কি?

এস, খেতে এস! টোস্ট ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রবিবার সকাল-দুপুরের খাওয়া একসঙ্গে হয়।

রাত্রে কি খাওয়াবে ওদের ?

এই খাওয়াটা সারা যাক্ তো। পরে চিন্তা করব। তুমি না হয় আজকে রান্না কর।

কে আমি ?

হ্যাঁ, তুমি। ক্যাথি বলে উঠল, মেয়েদের বিশ্রাম আজকে।

উম্যানস লিব-এর পাল্লায় পড়েছি আজকে দেখছি। বাড়িতে চারটি মেয়ে, আমি একা। অতনুটা যদি থাকত।

অতনুকে দিয়েই তাহলে রান্না করাতাম। ক্যাথি সসেজ কামড়ে বলল।

হ্যাঁ, রিতা বলে উঠল, অতনু রান্না করবে তবেই হয়েছে! এম এস পি!

এম এস পি-টা কি ?

মেল শোভিনিস্ট পিগ। ক্যাথি হাসতে হাসতে বলল। পুরুষ মানুষের খ্যাতিকে রক্ষা করার একটা চান্স দিচ্ছি তোমাকে আমরা। রান্না করে দেখিয়ে দাও।

অন্য অনেক ভাবে পুরুষ মানুষের খ্যাতি রক্ষা করতে পারি, যদি চাও।

তুমি একটা আস্ত এম এস পি। ক্যাথি ছদ্মরাগে বলল।

কিচ্ছু ভেব না, আমরা খেয়েদেয়ে উঠে সিট ইন স্ট্রাইক করছি। দেখা যাবে কে রান্না করে!

অত হুমকি দিও না। যখন সত্যি সত্যি রান্না করে ফেলব তখন দেখবে মজা!

বেশ তাই আমরা দেখব। রিতাও এবার যোগ দিল।

আমি শাশাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছি একটু পরে।

আমি যাব না। শাশা প্রতিবাদ করল।

সে কি তুমিও শত্রুদলে যোগ দিয়েছ!

শাশা শাসিয়ে বলল, তুমি রান্না করবে!

তবে তো আমার কিছু বলার নেই। দীপক হাত তুলে বলল।

বৃষ্টি পড়েই চলেছে। ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি। এক পলক রোদ উঠেই আবার অন্ধকার। এপ্রিল মাসের মতো রিতা রেকর্ড শুনতে উপরে চলে গেছে। দীপক কাগজ পড়ছে। শাশা সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মলি আর ক্যাথি গল্প করছে। টি. ভি.-ও চলছে, আস্তে করে, শিশুদের প্রোগ্রাম। শাশা যে আর দেখছে না সে কথা যেন সবাই ভুলে গেছে। টি. ভি. তো একটা ফার্নিচার, দেখলেও খোলা থাকে, না দেখলেও খোলা থাকে।

তুমি যে আবার কলেজে ঢুকবে ঠিক করেছিলে, কি হল?

আগের বছর তো গ্রাণ্ট পেলাম না, দেরি করে অ্যাপলাই করেছিলাম। এ বছর আর করব না ভাবছি, ম্যাগী থ্যাচার তো চায় না আমরা পড়াশুনো করি।

অ্যাপলাই করে তো দেখ। কলেজ তো তোমাকে জায়গা দিয়েছিল।

আমার পড়াশুনো হবে না মলি। আমার কেবল সংসার পাততে ইচ্ছে করে। আমার স্বামী দরকার, শাশার বাবার দরকার!

তোমার এত অল্প বয়স ক্যাথি, তুমি এখনই সিকিউরিটি খুঁজে বেড়াচ্ছ!

প্রেম খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভালবাসার বাসা। যাদের আমি ভালবাসি, তারা আমার দেহটা ব্যবহার করে পালিয়ে যায়। যারা আমাকে ভালবাসে তারা আমাকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে রাখতে চায় যে সার্জারী ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। অথচ আমি এত ভালবাসতে চাই মলি। অতনু—ক্যাথির নাক ফুলে উঠল। ক্যাথি চুপ করে গেল।

অতনুকে তোমার এত ভাল লেগেছে? মলি একটু অবাক হয়ে বলে।

ভীষণ ভাল লেগেছে। ও আমার আয়নার মতো যেন। ও খেলার জন্যে খেলা করবে না। ও এত সিরিয়াস খেলা করবে যে খেলা যখন ফুরিয়ে যাবে, আমার পায়ের তলার ফ্লোরও সরে যাবে। তাই আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

মলি বসে বসে একটু ভাবল, একদিনের দেখায় এত জানাজানি, এত ভালবাসাবাসি হয়ে গেল? এ দেশ বলেই কি সম্ভব?

আমি ভাবছি ফটোগ্রাফী শিখব!

মলি কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। সে ভাবল ক্যাথি যেন স্থির জলের পুকুর। ভালবাসার পুরুষদের প্রতিবিম্ব নিয়ে সে নদী হয়ে যেতে চায়। কলেজে পড়ার ঝোঁক হয়েছিল, যখন কলেজী বয়ফ্রেণ্ড হয়েছিল, টেডি গার্ল হয়ে গেল যখন টেডি বয়ফ্রেণ্ড ছিল। এখন অতনুর ছায়ায় সেও ফটোগ্রাফী শিখবে!

অতনু যদি তোমার না হয় ফটোগ্রাফী শিখে কি করবে?

ক্যাথি হেসে ফেলল।

অতনু যদি আমার বন্ধু হয় তোমার আপত্তি হবে?

আমার হবে না। ওর মা-বাবার হবে। খুব হবে।

আর ওর বোনের হবে।

তা হতে পারে।

ভাল লাগা একটা অদ্ভুত জিনিস! সমস্ত শরীরে যেন মোমবাতির শিখার মতো জ্বলে ওঠে।

অসাবধান হলে আগুন জ্বলে সব পুড়ে যেতে পারে কিন্তু।

সাবধান হলেও সলতে একদিন তো শেষ হয়েই যাবে। ক্যাথি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি একটু আগে সিকিউরিটির কথা বলছিলে। বলছিলে এত অল্প বয়সে আমি স্বামী খুঁজে খুঁজে মরছি কেন?

খোঁজা বন্ধ কর, তোমাকেই কেউ খুঁজে নেবে দু দিন আগে বা দু দিন পরে।

যদি বিশ্বাস করতে পারতাম! যদি বিশ্বাস করার মতো সাহস থাকত আমার। শাশাই আমাকে এখন বাঁচিয়ে রেখেছে। জান মলি, কোনোদিন আমি কাউকে বলি নি। ক্যাথি আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, শাশা জন্মাবার পর বড় কাঁদত, দিনরাত কাঁদত। বব কোনোদিন আছে, কোনোদিন নেই। একদিন আমি ওকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। মনে হত শাশা আমাকে জব্দ করার জন্যে দিনরাত কাঁদে। তারপরে ওকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলাম কেউ যদি অ্যাডপ্ট করে। ওকে আমি সহ্য করতে পারতাম না।

মলি আড়চোখে দেখল দীপক কাগজ বুকে করে ঘুমুচ্ছে। ভুলে যাওয়া ঢেউয়ের ধাক্কা ওর বুকে আছড়ে পড়ল।

এখনো যখন সে-সব দিনের কথা ভাবি আমার বুক কেঁপে ওঠে। শাশা ছাড়া আমি বেঁচে থাকতে পারতাম না। ক্যাথি নীরবে কাঁদতে লাগল।

মলি ক্যাথির হাত হাতে নিয়ে বলল, তুমি ভীষণ একা, না?

ক্যাথি শুধু ঘাড় নাড়ল।

মলির চোখ জলে ভরে উঠল। সব মানুষই কি একা একা চলন্ত-দ্বীপে থাকে। দ্বীপে দ্বীপে মিলে কখনো দেশ হয়ে যায়— আবার দ্বীপ সরে গিয়ে একা-একা হা হুতাশ করে। কোনো দ্বীপ বুঝি বা জঙ্গলে ঘেরা, একেবারে স্থির সবুজ অন্ধকার।

ক্যাথি হাত ছাড়িয়ে উঠতে উঠতে বলল, কফি করে আনছি। শাশাকে উঠিয়ে দাও তো, রাতে নইলে ঘুমুতে চাইবে না। বোকার মতো কাঁদি কেবল!

কি মোমবাতি-দর্শন তোমাদের শেষ হল? দীপক চোখ মেলে বলল ক্যাথি চলে যাবার পর।

তুমি আমাদের কথা শুনছিলে কেন?

বাঃ, তোমরা আমার পাশে বসে গুজগুজ করছ, আমি কি

করব ? বৃষ্টি থেমেছে, চল একটু পার্কে ঘুরে আসি শাশাকে নিয়ে।

মাঠে খেলতে পারবে না তো !

না হয় একটু হেঁটেই আসব। চল কফি খেয়ে চল। শাশা ওঠ তো দেখি। শাশাকে আমার বাংলা শেখাতে হবে।

নিজের ছেলেমেয়েকে শিখিয়েছ। এবার পরের মেয়েকে শেখাবে।

বল নিজের বৌকেই শেখাতে পারলাম না।

কেন আমি তো আজকাল পড়তে পারি। দাও কাগজটা দাও। একটু উল্‌টে-পাল্‌টে দেখি।

পড়, সঞ্জয় গান্ধীর উপর একটা ভাল লেখা আছে।

দেখি।

ক্যাথি কফি নিয়ে আসল। শাশার দুধ আর পটেটো-চিপস।

তোমরা বরং ঘুরে এস। আমি রান্না করছি। দেখ রিতা যাবে কিনা।

রিতা কি কফি খাবে ?

না ওকে কোক দিয়ে এস বরং। মলি বলল, দেখ ও তোমার সঙ্গে যাবে কিনা। আমার তো ড্রাইভিং লেসন আছে। আমি টুক করে এটা ততক্ষণে পড়ে নিচ্ছি।

ফোন বেজে উঠল !

মলি, তোমার ফোন। সাবিত্রী ফোন করছে। দীপক বলল।

দীপক শুনতে লাগল এক তরফা, হুঁ—হুঁ।—মুশকিল তো—জি পি-র কাছে যাও—হ্যাঁ, সোশ্যাল ওয়ার্কারের কাছেও যেতে পার—ও কি দীপকের কথা শুনবে ?—মনে হয় না—বলবখন দীপককে—আচ্ছা রুমা যদি রাজি হয়।—ঠিক আছে।—জানিও।

মলি ফোন ছেড়ে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, বুঝি না, এ দেশের ছেলেমেয়েদের।

কি হয়েছে কি ? তুমি আমার নাম জড়াচ্ছ কেন ওদের মধ্যে ! কি ব্যাপার !

মাথাটা গরম হয়ে গেছে। পরে এসে বলব। তুমি রান্না কর।

রিতা যাবে না। ওর ফোন আসবে। ক্যাথি নিচে নেমে এসে বলল।

ক্যাথি-শাশা পার্কে বেড়িয়ে ফিরে এল। মলি গেল ড্রাইভিং লেসন নিতে। রিতা ফোনে কথা বলছে চাপা গলায়। ওরা সবাই মিলে রান্নাঘরে গেল। দীপক রান্না করছে।

শাশা, কি খাবে ? দীপক জিজ্ঞাসা করল।

চীজ আর স্যালাড দেব। আইসক্রিম আছে। স্ট্র-বারী আছে ! দাও, আমি নিয়ে নিচ্ছি।

মলি ফিরে এসে রান্নাঘরে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, উঃ, তুমি ড্রাইভ কর কি করে ? ক্লাচ, গিয়ার, গ্যাস, স্টিয়ারিং। হাত চলে তো পা চলে না, ডান পা চলে তো বাঁ পা চলে না। আয়না দেখ। এত মনে রাখ কি করে ?

অভ্যাস হয়ে যাবে। দীপক বলল।

ক্যাথি হাসতে লাগল।

ভাবলাম গাড়ি চালিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। ঘণ্টা, আরো গরম হয়ে গেছে।

ক্যাথি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, বস। চা করে দেব ?

না। ড্রাই-মার্টিনী দাও, অনেক বরফ দিয়ে।

মলি কিচেন-টেবিলে চেয়ার টেনে বসে বলল, বাব্বা !

দীপক নিজেই কাটাকুটি জোগাড় করে নিয়েছে। মাংস হচ্ছে, তরকারি বসাবে।

রুমাকে নিয়ে সাবিত্রী বেচারা খুব মুশকিলে পড়েছে।

কি হয়েছে ?

রুমা স্কুলে ইচ্ছেমতো যায়। সাবিত্রীর তো জান চিরকাল 'রেপ'-এর ভয়। রুমাকে করাটী ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছিল, এখন সে করাটী মাস্টারের প্রেমে পড়েছে। মাস্টার আবার হাফ-জাপানী হাফ-ইংরেজ। ওর চেয়ে পনেরো বছরের বড়। মেয়ে যখন ইচ্ছে বাড়ি ফেরে। সাবিত্রী কিছু বলতে গেলে মারধোর করে।

মারধোর করে? দীপক ভুরু কুঁচকে বলল।

কি বলছিল যেন! ওকে নাকি একদিন ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। আরেকদিন নাকি কিচেনের ছুরি তুলে শাসিয়েছে।

সাবিত্রী বলছে রুমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। রাণা থাকলে দেখানো যেত।

না।

না?

স্বামী সেক্রেটারিকে নিয়ে কানাডায় পালিয়ে যাবার পর থেকে সাবিত্রী রুমাকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে রেখেছে। এখন মেয়েকে 'না' বললে তো রুখে দাঁড়াবেই। সাবিত্রী তো মা নয় ওর, সাবিত্রী ওর স্লেভ, ওর দাসী। এখন মা হতে চাইলে ও মানবে কেন?

বলছ কি তুমি? ঐটুকু মেয়ে একটা বত্রিশ বছরের পুরুষ-মানুষকে বিয়ে করবে?

বিয়ে করবে বলেছে?

হ্যাঁ।

রুমা বাবা খুঁজছে। দীপক বলল।

তুমি দেখি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে কথা বলছ। তোমার মেয়ে যদি এ-কাণ্ড করে বসে? মলি উত্তেজিত হয়ে বলল।

করতে হয়তো পারে। দীপক একটু ভেবে বলল, আমি নিশ্চয় ভাবব না যে ও পাগল হয়ে গেছে।

তোমার কি মনে হয় ক্যাথি? মলি সাপোর্ট খুঁজল।

আমি দীপকের মতেই সায় দেব। যতটুকু শুনলাম। আমার যখন পনেরো বছর বয়স, স্কুল আমাকে জোর করে পরীক্ষা দেওয়াবে। মক্ ও লেভেল। তুমুল কাণ্ড। আমি বই ছিঁড়ে দাপাদাপি শুরু করেছিলাম। এক হেড শ্রিঙ্কার দেখতে আসল। মাদার-এর ইচ্ছে ছিল, আমাকে পাগলা গারদে বা লুনিবিনে ঢুকিয়ে দেয়। হেড শ্রিঙ্কার আসতেই আমি খুব লক্ষী মেয়ে হয়ে গেলাম। হেড শ্রিঙ্কার ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে মাদারের সঙ্গে গুজগুজ করে চলে গেল।

জান দীপক, মাদার আর সিস্টার আমাকে যখন গায়ের জোরে পরীক্ষার হলে নিয়ে যেতে চাইছিল, তখন আমার হাতের কাছে যদি ছুরি থাকত আমি শাসাতাম না, কেবল রুমার মতো আমি ছুরি বসিয়ে দিতাম। তাই বলে আমি কি পাগল?

এখন দুঃখ হয় পরীক্ষা দিই নি বলে। কিন্তু অনেক দিনের অনেক কারণে রাগ জমা হচ্ছিল আমার মধ্যে। আমি হয়তো পরীক্ষা দিতামও, কিন্তু যেই মাদার আমার হাত ধরে টানল, অল হেল ব্রোক লুজ।

ক্যাথির সবুজ চোখ দপ দপ করে উঠল। সে আবার বলে চুপ করে গেল, আর যাই কর কোনোদিনও কাউকে হেড-শ্রিঙ্কারের কাছে পাঠিও না। সেই রাত থেকে আমি ড্রাগের স্বাদ পেয়েছি। রাতে কি সুন্দর ঘুম। দিনে কি সুন্দর ক্লান্তি ডায়জিপম খেয়ে।

দীপক ক্যাথির মাথায় একটু হাত বুলিয়ে বলল হালকা ভাবে, এখনো তোমার মনে অনেক রাগ ক্যাথি!

মামী কাঁদে না। শাশা ক্যাথির চোখে হাত দিয়ে বলল। তারপরে দীপককে এক চড় মেরে বলল, মামীকে তুমি বকবে না।

ওরা সবাই হেসে ফেলল। ক্যাথি শাশাকে বলল, দীপক আমাকে বকে নি। বসে খাও তো! গায়ে হাত তুলবে না কখনো।

ক্যাথির দম এখনো ফুরোয় নি। সে মলির দিকে তাকিয়ে বলল, বড়রা সবসময় বলে আজকালকার ছেলেমেয়েরা কি খারাপ। আরে বাবা, আমরা কি হঠাৎ অন্য প্ল্যানেট থেকে উড়ে এসে তোমাদের সুখ-শান্তির পৃথিবী তোলপাড় করছি! তোমরা আমাদের জন্ম দিয়েছ, আমাদের মানুষ করেছ। আমরা যদি খারাপ হই, তোমাদের দায়িত্ব তো আরো অনেক বেশি! নাকি পুরো তরুণ দলকে পাগলা গারদে বন্ধ করে রাখতে চাও?

তুমি এত রাগ করছ কেন ক্যাথি? মলি এবারে একটু অবাক হয়ে বলল।

কি জানি, ক্যাথি গলা নামিয়ে নরম করে বলল, রুমাকে ওর মা বোঝে না। কিন্তু তুমি তো বুঝবে?

মলি ভেবে ভেবে বলল, আমরা মা-বাবা হয়ে ফেলে যেন মহাপাপ করে বসেছি। আমরা জন্ম দিয়েছি বলে চিরকাল বুঝে আসব, ক্ষমা করব। ছেলেমেয়েদের তো বোঝার, ভালবাসার কোনো দায়িত্ব নেই। ওরা যেন ছেলেমেয়ে হয়ে আমাদের মাথা কিনে রেখেছে।

ক্যাথি হঠাৎ উঠে মলিকে পেছন থেকে জড়িয়ে বলল, আই অ্যাম সরি। তোমাদের ভেবে আমি একটা কথাও বলি নি। যদি বলে থাকি, মাফ কর।

ভীষণ ড্রামা দেখছি। রিতা দীপককে বলল।

বন্ধুতে বন্ধুতে একটু ড্রামা তো হবেই। কি আরেকটা ড্রাই মার্টিনী হবে নাকি?

দাও। মলি হেসে বলল। ক্যাথিকে ধরে আমি একদিন খুব মনের সুখে মার লাগাব।

শাশা আছে আমার পক্ষে, ক্যাথি চোখ মুছতে মুছতে হেসে মনে করিয়ে দিল, ভুলে যেও না সেটা।

ইস, দীপক যা নোংরা আর বাসন করে না রান্না করতে গিয়ে! সারারাত এখন বাসন মাজতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে।

আমি মেজে দেবখন। ক্যাথি বলল।

ক্যাথি আছে, ভাবনা কি? দীপক তরকারি নাড়তে নাড়তে বলল।

পরের শুক্রবার দীপক বাড়ি ফিরে দেখে মলি চোখ মুখ ফুলিয়ে বসে আছে। একদিকে টি. ভি. চলছে, আর মলি অনবরত ম্যাগাজিন-এর পাতা উল্‌টে-পাল্‌টে যাচ্ছে।

দীপক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কি হয়েছে? মলি, কি হয়েছে?

খেয়ে নাও আগে। পরে বলব।

না আগে বল। দীপক ওর পাশের চেয়ারে বসে বলল, আজ দুপুরে পুরো লান্‌চ খেয়েছি। ক্ষিধে নেই। কি ব্যাপার? রিতা চলে গেছে?

হ্যাঁ। মলি মুখ বিকৃত করে বলল।

রিতার কিছু হয়েছে?

একটা 'লাগার' দাও আমাকে।

দীপক দুটো 'লাগার' নিয়ে এসে বসল।

আমি একটা অন্যায় করেছি। অন্যায় করে তার ফল ভোগ করছি।

হুঁ! দীপক ঠাণ্ডা লাগারে চুমুক দিয়ে বলল। আজ খুব গরম পড়েছে। বাগানের দরজা খোলা সত্ত্বেও একটু হাওয়া নেই। গাছের একটা পাতা, একটা ফুলও নড়ছে না। প্রায় সাতটা বাজে, রোদের তাপ এখনো গন্‌গনে।

রিতা পোস্ট করার জন্যে চিঠি রেখে গেছে, মলি গ্লাসে চোখ রেখে বলল, ওর মাকে লেখা চিঠিটা খোলা ছিল। আমি পড়ে ফেলেছি।

আচ্ছা!

ও এমনভাবে চিঠি লিখেছে যেন আমি সবসময় গজগজ করি, বাড়ির কত কাজ বলে কেউ আমাকে সাহায্য করে না। আমাকে যেন সন্তুষ্ট করতে ভীষণ কষ্ট। আমাকে নাকি লান্চ করে দিতে চেয়েছিল।

দিয়েছিল নাকি?

বাঃ মনে নেই। ও অমলেট তৈরি করছিল আগের শনিবার। আমরা ফিরে আসলে জিগ্যেস করল, অমলেট খাবে নাকি?

ও তাই! তুমি বোধহয় ভুল বুঝেছ চিঠি পড়ে।

আমি জানতাম তুমি বলবে এই কথা। আমি নিয়ে আসছি, পড় তুমি।

দীপক ভুরু কুঁচকে কিছু বলল না।

মলি উপর থেকে চিঠি নিয়ে এসে দীপককে দিয়ে বলল, পড়। আমি একা একা সাপের ছোবল খাব কেন?

দীপক চিঠি পড়ে মলিকে ফেরত দিল।

ছেলেমানুষ—

ছেলেমানুষ? প্রায় কুড়ি বছর বয়স হল, ছেলেমানুষ, কি বুঝলে চিঠি পড়ে?

দীপক একটু ভেবে নিয়ে বলল, চিঠি পড়ে অন্যায় করেছ। কিন্তু মানুষকে বুঝতে তো পারলে! তুমি সবসময় রিতা এত মিষ্টি, রিতা এত সুন্দর, কেউ রিতার দোষ দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি ওর পক্ষে যেতে!

জান। মলি রাগের সুরে বলল, ওর বোধহয় নিন্দা করাটাই স্বভাব! মা-বাবার সম্বন্ধে আমাকে যা তা বলে। অতনুর কথা তো ছেড়েই দাও। দুনিয়ার ও কাউকে ভাল দেখে না। আমি ওকে সবসময় বুঝিয়েছি, কেন মা-বাবারা কি কথা বলে। ওকে ভালবাসে বলেই বলে। হয়তো সবসময় ঠিক বলে না। আমার ধারণা ছিল রিতা আমাকে ভালবাসে। আমি ওকে এত স্নেহ করতাম।

ছিঃ, ভাব তো মামীমা, মামা আমার সম্বন্ধে কি ভাববে? যেন আমি ওকে ঝিয়ের মতো খাটিয়ে মেরেছি, সে জন্যে আমার কাছে আসে না। লান্‌চ করে দিতে চেয়েছে! লান্‌চ!

কি বলবে ও মাকে? মা হয়তো বলে দিদির কাছে উইক-এণ্ড কাটাও, ছুটি কাটাও। রিতা তো বলতে পারে না, বয়-ফ্রেণ্ডের সঙ্গে উইক-এণ্ড কাটাচ্ছে বলে তোমার কাছে আসে না! মন খারাপ কোরো না। চিঠি পড়ে মনে হল ওর মনটা ভিস্যাস। এত সুন্দর দেখতে মেয়েটা।

আত্মীয়স্বর্জনের জন্যে আমরা যা করার বেশিরভাগ সময়েই ভালবেসেই করি। অথচ—আমি কখনো তো রিতাকে ডেকে বলি না, এটা কর সেটা কর। কাছে থাকলে টেবিল লাগায়, ভুলেও বাসন মাজে না। নোখ খারাপ হয়ে যাবে। না মাজল, আমি আশাও করি না, কেবল বাসন তুলে তুলে রাখে। এই তো! আমার ওপর ওর এত রাগ কেন? কেন? কি আমি করেছি?

বড়লোকের মেয়ে। কোনোদিন দিতে শেখে নি। দুনিয়ার লোক ওদের কাছে বড় ছোট। দীপক গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, জান, আমি যত চারিদিকে দেখি, মনে হয়, আমাদের ভাগ্য ভাল যে তনি-তপুর মতো ছেলেমেয়ে আমরা পেয়েছি। ওরা কখনো কারুর প্রতি ঈর্ষা, নিন্দা করে না। আমার কেবল ভয়, ওরা দুনিয়ার সবাইকেই ভাল দেখে। দীপক দাঁড়িয়ে উঠে বলল, তুমি বস। আমি খাবার তৈরি করে আনছি। তোমার রিতা, আমার তপন। দেশে গেলে এবার আর আমরা নেমন্তন্ন পাব না।

তুমি শুধু গরম করে আন। মলি ডেকে বলল শুকনো গলায়। স্যালাড আছে ফ্রীজে।

দীপক ফিরে এসে দেখে, মলি নীরবে কাঁদছে। ও ট্রে-টা টেবিলে রেখে ওর পাশে বসে বলল, কি তুমি রিতার কথা ভেবে চোখের জল নষ্ট করছ?

মলি মাথা নেড়ে বলল, না। তপু-তনি যদি ফিরে না আসে?

দীপক মলির হাত ধরে বলল, এটা তো ওদের বাড়ি, ওরা না এসে কোথায় যাবে? যাবে হয়তো, ফের ফিরে আসবে। আমরা ফিরে যাই না?

তুমি যাও। আমার তো যাবার জায়গা কোথাও নেই।

আঃ, দীপক 'আঃ' টাকে বড় করে হেসে বলল, নিজের জন্যে দুঃখ হচ্ছে তোমার?

মলি কিছু না বলে, খাবার প্লেট দীপককে এগিয়ে দিল। পরশুর রান্না মাংস, আর গ্রীক রুটি পিতা! আর স্যালাড।

সেই রাতে দীপক মলিকে সান্ত্বনা না দিতে পেরে কোনো একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ও কিছুদিন আগে ঘা খেয়েছে জামাইয়ের কাছ থেকে। ও জানে ঘায়ের জ্বালা। কিছুতেই নিবতে চায় না। হয়তো বিদেশে থাকে বলে, ছোট জিনিস অনেক বড় হয়ে যায়। দেশে তো আত্মীয়-স্বজনের ঝগড়া-ঝাঁটি সবসময় লেগেই থাকে। কিছুদিন পরে সব চুকে গিয়ে আবার ঘন ঘন যাতায়াত শুরু হয়।

মলির ঘুম আসতে সেদিন অনেক দেরি হল। কেন রিতা এমন করে চিঠি লিখল? ও কি রিতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে নিজের অজান্তে। মনে তো পড়ে না। নাকি, ক্যাথিকে নিয়ে ও বেশি মাতামাতি করেছে। সেজন্যেই কি রিতা ধারে কাছে আসে নি। নাকি অতনু, ক্যাথি আর শাশাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল বলে ওর হিংসে হয়েছে? ক্যাথির যে রিতাকে অপছন্দ হয় নি তা নয়, ঈর্ষাও জড়ানো আছে, মলি বুঝেছে। ক্যাথির ঈর্ষার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু রিতার? রিতাকে স্নেহ ভালবাসা মৌসুমীর মতো ঘিরে থাকে বলে কি সে অন্য কাউকে সহ্য করতে পারে না? নাকি সে নিজের মাকে সহ্য করতে পারে না বলেই কোনো মাকে সহ্য

করতে পারে না? ক্যাথি? মলির মনটা নরম হয়ে গেল। তারপরেই শক্ত হয়ে গেল শরীর। কে জানে, ক্যাথিও কি মলিকে অসন্তুষ্ট, অসুখী গজগজে মেয়েছেলে বলে দেখে? মলি দীপকের দিকে ফিরে দেখল, ও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ওর খুব ইচ্ছা করতে লাগল, ওকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমাকে তোমার কী রকম মানুষ মনে হয়?

আমি আমাকে এক চোখে দেখি, নিজের কিছু কিছু দোষ দেখি, কিন্তু আমি—মলি মনে মনে বলল, আমি তো, এত খারাপ নই—নাকি আমি এতই খারাপ রিতা আমাকে যে চোখে দেখেছে! সবাই কি আমাকে এত খারাপ দেখে? তবে ওরা আমার কাছে আসে কেন? আমি চাই না কাউকে। আমাকে যদি কেউ না চায়।

মলি বালিশে মুখ গুঁজে ছোট্ট মেয়ের মতো কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল শেষ কথা বলে—তনিকে সকালে উঠে চিঠি লিখব। না লিখুকগে ও আমাকে! বাবাকেও চিঠি লিখব। বাবা! কত মেয়েরা তো পায়ে হেঁটে বর্মা দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছে, কিন্তু আমার মার কেন মরে যেতে হল। আমার মা কেন?

বিকেলের আকাশ স্তব্ধ। ধোঁয়াটে মেঘ আর গোলাপী মেঘ আলাদা ভাবে আস্তে আস্তে ভাসতে ভাসতে ঘোলাটে নীল হয়ে যাচ্ছে আকাশের সঙ্গে মিশে।

লুইসা বাগানে কাজ করতে করতে খেয়াল করে নি প্রায় সাড়ে-নয়টা বাজে। রাত একটু পরেই নেমে আসবে। অনেক খেলা হয়েছে, এবার ঘরে ফেরা দরকার। বাগানের ঘরে যন্ত্রপাতি রেখে, হাতের গ্লাভস খুলে, সে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

গরমকাল হলে হবে কি, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে ক-দিন হল। লুইসা ভাবল আগুন জ্বালাবে নাকি? থাকগে, ইলেকট্রিসিটির রেট বড় বেশি বেড়ে গেছে।

তুমি এ দেশের মেয়ে, রাণা একেক সময় বিরক্ত হয়ে বলত, তোমার এত শীত করে কি করে ?

কি করব, ভগবান হিসেবে ভুল করে আমাকে বিলেতে জন্ম দিয়েছে। তাই তো গরম দেশের লোককে বিয়ে করেছি।

আমার কাছে বস গরম করে দিচ্ছি।

না, আগে সেণ্ট্রাল হিটিং তো চালাই। তুমি কি করে ঠাণ্ডায় বসে থাক জানি না।

পরে বুঝেছিল। কিছু দিন ঘর করার পরে। রাণার কাছে পয়সা খরচ করে আরাম করা মানেই বিলাসিতা। বিলাসিতা মানেই অন্যায়।

আজ কেউ বলার নেই তবু সে আগুন জ্বালাতে পারল না। পয়সার খুব টানাটানি। একটা লোকাম নিয়েছে দু মাসের জন্যে। তবু ভরসা।

ওর ছটফটে শূন্যতা চলে গিয়ে শান্তি নেমে এসেছে। ওর দেহের পুরুষ-পিপাসা চলে গিয়ে আত্মস্থ হয়েছে আকাঙ্ক্ষা। রাণা থাকতে মনে হত যৌনতা একটা বিরাট বোঝা। রাণা চলে যেতেই ফের হ্যাংলামিপনা ফিরে এসেছিল। যেন কোনো আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারলেই ওর শোকের তাপ নিভে যাবে। ফ্যাণ্টাসীতে ও একে একে দীপক, রিচার্ড, সাদি বা পথে-দেখা পছন্দ-হওয়া পুরুষ মানুষকে ভালবেসেছে। আমি ভালবাসতে চাই—আমাকে নাও, আমাকে উজাড় করে নাও।

ওর নিজের পিপাসায় ও নিজেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে জন্যেই দীপক, রিচার্ডের হাত মেলে দেয়া সাহায্য রূঢ় নম্রতায় ফিরিয়ে দিয়েছে। ও মধ্য বয়সে পৌঁচেছে। হরমোন-এর পরিবর্তন হতে শুরু করেছে দেহের ভিতরে। তবু কেন যৌনপিপাসা যায় না ? কতদিন ভেবেছে, ফোন করি জনকে ইয়র্কে। অথবা পলকে।

না, না, লুইসা নিজেকে সাবধান করেছে, নিজের সর্বনাশে

আর কাউকে জড়িও না।

কতদিন ভেবেছে, ভিক্ষা চেয়ে ক্ষমা চেয়ে রাণাকে চিঠি দেবে, ফোন তুলে ভেবেছে টিকিট বুক করবে কলকাতার জন্যে। সে জানে রাণার মুখোমুখি হলে সে লুইসার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। 'ঝাঁপিয়ে পড়বে' শব্দটা যেন ওর কব্জি আটকে রেখেছে। না, না, লুইসা চিৎকার করে নিজেকে বলেছে, এ প্রেম ভালবাসা নয়, এ প্রেম ক্যান্সারের মতো, ভেতরটা খেয়ে খেয়ে ঘায়ে ঘায়ে দগদগে করে দেয়। এর রূপ্ ছিল না, যন্ত্রণায় বিকৃত আনন্দ ছিল। যেতে দাও, রাণা চ'লে গেছে, যেতে দাও। রাণা হয়তো একদিন শান্তি খুঁজে পাবে। পাবে কি?

ভালবেসে ফেলে প্রচণ্ড ভুল করেছি। রাণা বলত, আর জীবনে কোনো মেয়ের সঙ্গে কোনোদিনও জড়িয়ে পড়ব না।

কিন্তু তুমি যে সেক্স ছাড়া থাকতে পারবে না। লুইসা হয়তো বলত।

জড়িয়ে না পড়েও তো সেক্স পাওয়া যায়।

তা বটে। মেয়েদের পক্ষে যদি তা সম্ভব হত লুইসা নিজেকে জিগ্যেস করেছে।

স্মৃতির ধার আস্তে আস্তে ভোঁতা হয়ে এসেছে। রাগের বদলে ফিরে এসেছে উপেক্ষা। দুঃখের বদলে স্বস্তি। মনে হচ্ছে, বাড়ি যদি বিক্রি না করতে হত, তবে যেন সে অনায়াসেই একা একা এ বাড়িতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারত।

বাড়ির আবহাওয়ায় এখন আর টেনশন নেই। বাইরে গেলে লুইসা ঘরে ফিরে আসে না উদ্বেগ আর আশায়—রাণা হয়তো কখন ফিরে চুপটি করে বসে আছে, কখন সে ফিরে আসবে!

ট্রানজিস্টার চালিয়ে লুইসা শেরী নিয়ে বসল। এল বি সি-তে ফোন ইন প্রোগ্রাম হচ্ছে। লুইসা ভাবল উঠে মলিকে ফোন করবে· আসতে বলবে এই উইক-এণ্ডে। শহর থেকে সবুজ

পরিবেশ ভালই লাগবে ওদের। রিচার্ড আর ক্ল্যারাকে ডাকলেও হয়। ইচ্ছে করছে বাড়িটা মুখর হয়ে উঠুক।

লুইসা উঠতে যাবে এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

সিক্স ফাইভ থ্রি?

হ্যালো, লুইসা?

ইয়েস?

লুইসা, আমি পল বলছি।

হ্যালো পল! লুইসা খুশি হয়ে বলল, কোথায় তুমি? কেমন আছ?

আমি লণ্ডনে। আর ভাল আছি। কি করছ তুমি?

কিছু না। শেরী নিয়ে বসেছিলাম। কবে ফিরলে তুমি?

মাস খানেক হল। ইয়র্কে গিয়ে তোমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাস্তায়।

ও। লুইসা মনে মনে বলল, পল জানে তাহলে। তাই ফোন করেছে!

ডুবাইয়ে আবার ফিরে যাচ্ছ?

না। ও পালা চুকিয়ে এসেছি। এখানে লরি কিনে নিজে ব্যবসা খুলব ভাবছি।

এস একদিন।

কবে?

এই শনিবার আসতে পারি?

এস।

সাতবছর তোমার সঙ্গে দেখা নেই। এই ছ-টা নাগাদ চলে আসব, আচ্ছা?

আচ্ছা।

ঠিকানা দাও।

লুইসা ঠিকানা দিল। বলে দিল কী ভাবে আসতে হবে।

সেই পল। পলের বিয়ে তখন ভাঙে ভাঙে অবস্থা। ইয়র্কে বেড়াতে এসেছিল এক বন্ধুর কাছে শোক ভোলার জন্যে। এক পার্টিতে লুইসার সঙ্গে আলাপ। ছ-মাস ভীষণ প্রেম। ডিভোর্সের পর পল লুইসাকে বিয়ে করবে সব ঠিক ঠাক।

পলের স্ত্রী মার্লীন বেঁকে বসল। যদি আবার বিয়ে কর নিজের মেয়েকে কোনোদিন আর দেখতে পাবে না। স্ত্রী ওভারডোজ নিয়ে বসল। পল বলল, ফিরে আসছি। হাসপাতালে মার্লীন আর মেয়েকে দেখে। পল লুইসার সঙ্গে দেখা করতে এল।

লুইসা পলকে দেখেই বুঝল ওদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। মার্লীন আর মেয়ে জিতেছে। এবার বিদায় নেবার পালা। পল লুইসার বুকে সারারাত থেকে থেকে কাঁদল। মার্লীনের আত্মহত্যা, মেয়ের অভিশাপ নিয়ে সে নতুন করে সংসার গড়তে পারবে না। ক্ষমা কর। ক্ষমা কর আমাকে।

সব পুরুষমানুষই যেন ছোট্ট খোকা! লুইসা পলের মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে বিদায় দিল ওর জীবন থেকে। পলের একজন মিসট্রেস দরকার ছিল নতুন করে পুরনো বিয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্যে। লুইসা সেই মেয়েমানুষ। পুনর্মিলনের সেতু।

সেই পল। কি ভালই সে বেসেছিল পলকে। পলের কথা ভাবলেই ওর বুক কেঁপে উঠত। না ছুঁয়ে পাশে এসে দাঁড়ালেও ওর শরীরের ভেতরটা যেন মোমের মতো গলে যেত। দু দিন দেখা না হলে ওর বুকটা হাহাকার করে উঠত।

বিচিত্র দেহের কেমিস্ট্রি লুইসা আর পল। লুইসা আর রাণা। যেন দুটো ভিন্ন দেহ। রাণার কথা ভেবে, রাণা পাশাপাশি বসে হাতে হাত রেখেও ওর বুকে কোনো ঝিলিক দিত না। কিন্তু রাণার সঙ্গে সঙ্গমে ওর গভীর সুখ আর আনন্দ ছিল, যা ছিল না পলের সঙ্গে। কেন এমন হয়?

পলের কথা ভেবে ভেবে ওর ক-টা দিন কেটে গেল। পল কি ওকে জড়িয়ে ধরবে, চুমু খাবে, ভালবাসবে ? কই বুক তো কাঁপছে না ! কেবল ভাল লাগছে পলের সঙ্গর কথা ভাবতে।

মধ্য বয়সে হয়তো ওর প্যাশন চলে গেছে। লুইসা ভাবল। ঘর গুছলো, ফুল তুলে ঘর সাজাল।

পল আসতেই ওকে বসতে না বলে বলল, চল, তোমাকে স্টক বিলারিকি আর ব্যাসিলডন দেখিয়ে আনি। গাড়িতে বসে তুমি আমাকে ডুবাইয়ের গল্প বল। হাত-পা নিয়ে যে ফিরে এসেছ এই যথেষ্ট। তোমায় কখন ফিরতে হবে ?

অনেক সময় আছে।

যেন ওদের প্রায়ই দেখা হয়। ওরা পুরনো বন্ধুর মতো গল্প করতে করতে সময় কাটাল। বহুদিন পরে লুইসা প্রাণখুলে হাসল, ঠাট্টা করল।

পল বলল, চল খেয়ে নিই। কোথায় যাবে ?

ফাইভ বেলস্-এ চল। বার-রেস্টুরেণ্ট আছে।

রাউণ্ড এবাউট-এর মোড়েই ফাইভ বেলস্। পাব আর রেস্তোরাঁ। লোকে বলতেই বলে, ফাইভ বেলস্ রাউণ্ড এবাউট। পাঁচ দিকে পাঁচটা রাস্তা চলে গেছে।

ডুবাই-অর্জিত টাকা দিয়ে কেনা আলফা রোমিও নিয়ে পল পাব-এর পেছনে পার্ক করল।

ওরা মুখোমুখি বসে ওয়াইন-এর অর্ডার দিল। পল টেবিলের তলায় পা ছড়িয়ে দিয়ে ভাল করে বসল। ডুবাইয়ে বানানো টাকা নিয়ে পল এখন আত্মবিশ্বাসে ডগমগ করছে।

সুন্দর ওয়েট্রেসের দিয়ে-যাওয়া মেনুর দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, লুইসা কি খাবে বল ?

ডোভার সোল।

অ্যাপিটাইজার ?

মেলন। তুমি?

গ্রণ ককটেল। টি বোন স্টেক।

ওয়েট্রেস অর্ডার নিয়ে গেল। পল ভাল করে চারদিকে দেখে ওয়াইনে চুমুক দিয়ে লুইসার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল লুইসা ওকে দেখছে।

কি দেখছ?

এতক্ষণ গাড়িতে তোমার প্রোফাইল দেখেছি। বেশ সমৃদ্ধ চেহারা হয়েছে তোমার। বল, তোমার ব্যবসার কথা বল।

পল একটু ঝুঁকে ওকে বলতে লাগল, একটা কনটেনার লরি কেনার ইচ্ছা আছে। ইণ্টার-কন্টিনেণ্ট-ড্রাইভে অনেক পয়সা আছে। কিন্তু যে কনটেনারটা দেখেছি, ষাট হাজার পাউণ্ড চাইছে—

পল কথা বলে যেতে লাগল, আর অন্য মন নিয়ে ভাবতে লাগল, লুইসা এত বয়সে এখনো কি করে যৌবন ধরে রেখেছে, নাকি জামা কাপড়ের কারসাজি? ও কি আমাকে ভালবাসতে দেবে? নিশ্চয় দেবে, নাহলে আসতে বলবে কেন? কিন্তু বাড়িতে বসতে দিল না যে! খাবার পরে পৌঁছে দেবার সময় দেখা যাবে!

লুইসা খেতে খেতে ভাবল, পল দাড়িগোঁফ গজিয়ে মধ্যবয়সী হয়ে গেছে—চুলে পাক ধরে নি দেখছি, না কি চুলে কলপ দেয়? পলের বয়স হবার খুব ভয় ছিল, এখনো কি আছে? কই, ওকে দেখে, এত কাছাকাছি বসেও কোনো রক্ত-চাঞ্চল্য হচ্ছে না তো! আমার দেহের কেমিস্ট্রি কি বদলে গেছে, নাকি আমি বুড়ি হয়ে গেছি?

আমার কথা তো খুব শুনলে, তোমার কথা বল। পল ব্রকলী মুখে পুরে দিল।

কই বললে না তো মার্লীন কেমন আছে?

ভাল।

তোমার মেয়ে—

জুলিয়ান! ডুবাইয়ে যাবার আগে ওকে প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। পড়াশুনা খুব ভাল করছে। আমার লেখাপড়া শেখা হয় নি, দেখি মেয়ে কি করে।

কত বয়স হল ওর?

বারো।

আর ছেলেমেয়ে নেই তোমার?

না। এক মেয়েকে মানুষ করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। ব্যবসা যদি না চলে, ওকে স্কুলে রাখার জন্যে আমাদের সাউথ আফ্রিকায় চলে যেতে হবে।

সাউথ আফ্রিকা? লুইসা ভ্রূ তুলে বলল।

বৃটেনের যা অবস্থা দেখছি—

তাই বলে সাউথ আফ্রিকা!

জাতিবিদ্বেষের কথা বলছ? কেন বৃটেনে নেই!

বৃটেনের সমস্যা আলাদা। এখানে তো অ্যাপারথাইড নেই।

তা নেই। পল ঝগড়ার মধ্যে যেতে চাইল না। ও ভুলে গিয়েছিল রাণার কথা। এ তর্কের মধ্যে গেলে লুইসা হয়তো ওকে বাড়িতেও ডাকবে না।

পল বলল, রেস-রায়ট হচ্ছে, দেখছ না। অ্যাপারথাইডের দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমরা যত বাইরে থেকে যাব, দেখবে ওরাও তত বদলে যাবে।

তুমি যদি ওদের মতো হয়ে যাও।

ওদের মতো হলে কি ডুবাইয়ে পাঁচ বছর টিঁকে থাকতে পারতাম। অনেক আমার কথা হয়েছে। তোমার কি প্ল্যান? কলকাতায় যাচ্ছ?

না। তুমি দেখছি আমার সব খবরই জান।

মিষ্টি নেবে না?

না। আমি মিষ্টি খাই না। লুইসা বলল। তুমি নাও।

তাহলে চল। তোমার ওখানে কফি খাওয়া যাবে আরাম করে।

বেশ। লুইসা চকিতে পলকে দেখে নিয়ে বলল।

লুইসা সোজা রান্নাঘরে ঢুকে ইলেকট্রিক কেটল বসাল। পল ওকে জড়িয়ে ধরে গালে ঠোঁটে চুমু খেতে লাগল। লুইসা যেন তৈরি ছিল না। লুইসা কোনোরকমে চুমু ফিরিয়ে বলল, দাঁড়াও, কফিটা করে নিই।

থাক কফি এখন। পল লুইসার পুরো শরীরটাকে জড়িয়ে বসার ঘরে নিয়ে এল।

কিছুক্ষণ পরে লুইসা পলের সরু খালি বুকে মাথা রেখে বলল, কেমন আছ তুমি? কথা বল।

ভীষণ ভাল। তোমার কাছে। পল কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না। মেয়েরা ভালবাসার সময়ে কথা বলতে চায় কেন? সারা সন্ধ্যা তো কথা হল।

জামা কাপড় পরে লুইসা কফি আর ব্রাণ্ডি এনে দিল।

তোমার যাবার সময় হয়েছে না?

হ্যাঁ। তোমাকে ফোন করব। কিছু দরকার হলে বলবে আমাকে?

আমার তো কিছু দরকার নেই। আরেক কাপ কফি দেব?

না।

ড্রিঙ্ক-ড্রাইভিং পুলিশ আজকাল খুব কড়াকড়ি করেছে। স্পিড দিও না।

সাউথ আফ্রিকা যেতে পারি বলে তোমার খুব খারাপ লেগেছে, না?

লেগেছে বৈকি!

তুমি তো জান আমার কোনো প্রেজুডিস নেই। পল আসলে কালো শাদা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কালো মেয়ের দেহ স্ট্রিপ টিজ ক্লাবে দেখেছে, বিছানায় কেমন হবে ভেবেছে, কিন্তু পয়সা খরচ করে কালো মেয়ের কাছে যায় নি। গেলে সাউথ আফ্রিকায় টাকা রোজগার করতে যাবে। কালোদের জন্যে চিন্তা করার সময় কোথায়?

চিয়ারস।

চিয়ারস।

আলফা রোমিও হুশ করে বেরিয়ে গেল। বৃষ্টি পড়ছে।

পল চলে গেলে লুইসা বসার ঘর পরিষ্কার করে রান্নাঘরের সিঙ্কে সব জমিয়ে রাখল। কালকে দেখা যাবে। কাল রবিবার।

লুইসা ফোনের রিসিভার তুলে ডায়েল করল, কে, মলি? আমি লুইসা বলছি।

এতদিন পরে মনে পড়েছে তাহলে। কেমন আছ বল।

ভাল আছি। কালকে ফ্রি থাকলে এস না! দুপুরবেলা এসে খাবে।

দাঁড়াও দীপককে জিজ্ঞেস করি।

একটু পরে মলি ফিরে এসে বলল, ঠিক আছে আসব। কখন?

এই একটা নাগাদ। ক্ল্যারা আর রিচার্ডকে ডাকব ভাবছি। তোমাদের আপত্তি নেই তো?

না। ভালই তো। ভাল করে আলাপ হবে। একবারই ওদের দেখেছি। খুব বাগান করছ নাকি আজকাল?

কি বাগান করব। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। উইম্বলডন এবার নষ্ট হল।

সত্যি। সারা শীত অপেক্ষা করে কি যে 'সামার'! ঠাণ্ডা আর বৃষ্টি। আমি তো আজকে আগুন জ্বালিয়েছি। আচ্ছা কাল দেখা হবে।

চিয়ারস।

বাই—ই।

লুইসা আবার ডায়েল করল।

রিচার্ড? আমি লুইসা বলছি।

আরে? কি খবর বল? কেমন আছ?

ভাল। তোমাদের ঘুম ভাঙালাম না তো!

না না। সবে তো দশটা বেজেছে। আমি এ উইক-এণ্ডে অন কল আছি।

ও। কালকে দুপুরে ফ্রি আছ?

আছি। কিন্তু আমার শাশুড়ী এসেছে ক-দিনের জন্যে। তুমি আসবে নাকি?

না। আমি ভাবছিলাম তোমরা যদি আস। কিন্তু শাশুড়ী—

রিচার্ড মাথা চুলকে বলল, কিছু যদি মনে না কর—

ঠিক আছে। আরেকদিন এস। আমাদের দুই বন্ধুকে বলেছি আসতে।

রাণার খবর পেয়েছ?

হ্যাঁ। লুইসা মিথ্যা কথা বলল। পরে একদিন দেখা হবে।

লুইসা—

বল রিচার্ড—

তোমার কোনো দরকার হলে জানাবে তো?

নিশ্চয়। বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেলে তখন তোমাদের সাহায্য দরকার হবে। ডাকব তখন।

মনে থাকে যেন। গুড়নাইট।

গুডনাইট।

লুইসা বাথটবে গরম আর ঠাণ্ডা জল ছেড়ে দিল। অর্ধেক ভর্তি হলে এলিয়ে দিল ওর নগ্ন দেহ। আঃ কি আরাম। পলের যৌনতা যেন অযথা নোংরা ফেলে রেখে গেছে ওর দেহে। পরিষ্কার আর হালকা লাগবে স্নান সেরে।

ফোন বেজে চলেছে। জলে শুয়ে লুইসার মনে হল, বাজুক। তারপরেই হড়বড় করে বাথটব থেকে নেমে কার্পেটে জল ছড়াতে ছড়াতে শোবার ঘরে ফোন ধরতে গেল।

হ্যালো, লুইসা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল।

কি ব্যপার কি তোমার? কারুর কোল থেকে তোমাকে টেনে তুললাম নাকি?

কে? যুঁই? ও যুঁই! লুইসা খুশিতে বলে উঠল।

চলে এস এখানে। নিউ ইয়র্কে এসো, আমরা এসে নিয়ে যাব, অথবা বস্টনে! বস্টনেই সুবিধা হবে।

কি বলছ তুমি আবোল তাবোল।

উঁহুঁ। কোনো অজুহাত নয়।

যাব বললেই যাওয়া হয়।

হয়। তুমি তো এখন স্বাধীন। বাড়ি বিক্রি, পয়সা কড়ি যা চিন্তা করছ—ওসব তোমার পুরনো জীবনের শেকল। লেকা স্কাইট্রেনে চলে এস।

সত্যি বলছ? লোভ লাগছে। কিন্তু—

তোমরা ইংরেজরা বড় বেশি চিন্তা কর। একটু খামখেয়ালী হতে শেখ। কবে তোমার লোকাম শেষ?

পরের সপ্তাহে।

পরের শনি বা রবিবার প্লেন ধর তবে। শুক্রবার ফোন করে জেনে নেব। তখন সব কথা হবে। এখন ছেড়ে দিচ্ছি।

যুঁই ?

কি বলছ ?

তোমার আর ফ্র্যাঙ্ক-এর কোনো অসুবিধা হবে না তো ?

আ। নিয়ইউর্কে দেখা হবে। তোমার সঙ্গে বাজে বকার সময় নেই আর।

লুইসা তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে ভাবল, সে সত্যিই যাবে। দু সপ্তাহ ছুটি তার। সে ছেলেমানুষের মতো খুশিতে আলমারীর ভেতর থেকে সুটকেশ বের করে জামা-কাপড় গুছোতে বসল। যেন সে কাল ভোরে উঠেই চলে যাচ্ছে।

রাত বারোটা পর্যন্ত সে লিস্ট করল, কি কি কাজ, কাকে কাকে বলে যেতে হবে স্টক ছাড়ার আগে। সেই লিস্টে রাণার নাম নেই।

যুঁইয়ের সঙ্গে আলাপ এক হাসপাতালে। যুঁই শিশুদের ওয়ার্ডে হাউস অফিসর, লুইসা ওয়ার্ড-সিস্টার। খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল ওদের। যুঁই বয়সে অনেক ছোট ছিল। কিন্তু বন্ধুত্ব হতে আটকায় নি।

বছর দেড়েক পরেই আমেরিকান বিয়ে করে আটলান্টিক পাড়ি দিল যুঁই। সেই যুঁইয়ের সঙ্গে ওর কত বছর পরে দেখা হবে। বছরে দু-একটা চিঠির আদান-প্রদান। রাণা ওকে যেতে দেয় নি আমেরিকাতে একলা। যেতে চাইলেই বলেছে, একসঙ্গে যাব।

লেকার প্লেনে কিউ দেবার জন্যে শুক্রবার রাতেই স্লিপিং ব্যাগ, আর ছোট সুটকেস নিয়ে সে গ্যাটউইক এয়ারপোর্টে হাজির হল। ছাত্র বয়সের মতো। জেনে নিল ভোররাতে কোথায় উঠে কিউ দিতে হবে। নিরিবিলি গদি মোড়া বেঞ্চি দেখে সে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে ঘুমুবার চেষ্টা করতে লাগল।

সাধারণ ইংরেজদের মতোই লুইসাও আমেরিকানদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। একটা কৌতুক আর হিংসে মেশানো কৌতূহল আছে। যুঁই যদি না ডাকত, হয়তো ওর আমেরিকা যাবার কথা মনেই হত না। যাক, এই বৃষ্টি চপচপে ঠাণ্ডা সামারের হাত থেকে তো বাঁচা যাবে। ওর সমস্ত দেহমন সূর্যের জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে।

কেনেডি এয়ারপোর্টে যুঁই আর ফ্র্যাঙ্ক ওকে নিতে এসেছে। আজ রাতে নিউইয়র্কে থেকে কাল ভোরে ওরা ভারমণ্ট-এর দিকে রওনা দেবে। সবুজ পাহাড়।

এই নিউইয়র্ক। এল স্কাইলাইন। হাডসন নদী। ওরা গিয়ে উঠল ফ্র্যাঙ্কের বন্ধুর ফ্ল্যাটে। বন্ধু গ্রীষ্মের ছুটিতে ইয়োরোপে গেছে।

যুঁই বলল, আমি পাহাড়ী জংলী। নিউইয়র্কের কিছু জানি না। কোথায় যেতে চাও সন্ধ্যাবেলা?

গ্রীনিচ ভিলেজের নাম শুনেছি।

চল। ফ্র্যাঙ্ক বলল। শাওয়ার নিয়ে, জামাকাপড় ছেড়ে যাওয়া যাক।

কি সাজগোজ করতে হবে নাকি? লুইসা জানতে চাইল।

তোমার ইচ্ছে করলে করতে পার। এ দেশে ওসবের বালাই নেই। আমি তো এই জিন পরেই যাব।

লুইসা দেখল যুঁইকে। এক ঘষাটে পুরনো জিন পরে আছে, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি, লম্বা চুল কোনোরকমে বিনুনী করা। মুখে কোনোরকম মেক-আপ, লিপস্টিকও নেই। ঝকঝকে কালো মুখে, কালো চোখের তারা খুশিতে বুদ্ধিতে নাচছে। যুঁইয়ের অল্প বয়স। যুঁইকে লুইসা সুন্দরী দেখে, দেশে যদিও ওর কালো কুৎসিৎ বলে সুনাম ছিল। লুইসার কাছে যুঁই যা পরে তাতেই সুন্দর। কিন্তু লুইসা মধ্যবয়সী, ওকে সাজতে হয়। না সাজলে নিজেকে হ্যাংলা

কাঙাল বুড়ি-বুড়ি লাগে।

দু জনের চোখাচোখি হতেই ওরা হেসে ফেলল।

কি ভাবছ, যুঁই হাসতে হাসতে বলল, কি করে মেয়েটা এই জিন পরে গ্রীনিচ ভিলেজে যাবে?

সে রকম কিছুটা। লুইসা হেসে স্বীকার করল।

আর কি ভাবছ?

তুমি বদলে গেছ।

কী রকম, পোশাক বাদ দিয়ে।

পোশাক বাদ দেয়া যাবে না। লুইসা মাথা নেড়ে বলল, পোশাক, মেক-আপ একদিক থেকে দেখতে গেলে অনেক কিছু ঢাকে, আবার নিজের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেও। যেমন হাসপাতালে সাদা অ্যাপ্রণ পরে তোমার শাড়ি পরা দেহ ঢেকে রাখতে; কিন্তু বলতে, আমি ডাক্তার, আমাকে সম্মান করে চল। আমার কথা মেনে চলতে হবে। তুমি যেন, লুইসা বলল, ঠিক শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না, যেন তুমি নিজের আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছ। অথবা, লুইসা যুঁইকে এক দৃষ্টে দেখে বলল, খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছ—সে জন্যে আর সাজগোজের দরকার নেই। ওসব তো বাহুল্য।

ফ্র্যাঙ্ক ভেজা চুলে ঘরে ঢুকে বলল, যেতে হলে কিন্তু ওঠা দরকার।

আমার স্বামীটা একটা বেরসিক। যুঁই বলল ফ্রাঙ্কের হাত জড়িয়ে, বেশ লাগছিল তোমার বিশ্লেষণ। ওকে কাজে পাঠিয়ে দিয়ে, ভারমণ্টে বসে গল্প করা যাবে। যাই, আমি স্নান করে আসি। তোমরা গল্প কর।

তুমি রাই নেবে? ফ্র্যাঙ্ক জানতে চাইল।

দাও। তোমাদের রাই কখনো খাই নি। খুব কড়া শুনেছি। অল্প দাও, অনেক বরফ।

ফ্র্যাঙ্ক অল্প কথার মানুষ। সে রাইয়ের গ্লাস হাতে নিয়ে,

টেবিলের উপর পা তুলে টি. ভি. চালিয়ে দিল।

কি কী রকম লাগছে ?

গন্ধটা বড় কড়া ! ও, আমি তোমাদের জন্যে স্কচ নিয়ে এসেছি।

ফ্যাঙ্ক শুনতে পেল না। মন দিয়ে টি. ভি. দেখছে। অল্প অল্প করে চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে।

বাব্বা, লুইসা মনে মনে বলল, এর সঙ্গে দু সপ্তাহ কাটাতে হবে নাকি। সন্ধ্যা কাটলে হয়। ইকনমিকস-এর প্রফেসর ছিল না ভদ্রলোক ! তাই এত গম্ভীর নাকি ! নাকি লুইসা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে বলে রাগার মতো বিরক্ত হয়ে আছে। মহা মুস্কিল তো !

সে চারিদিকে এতক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখল। স্পিট লেভেল ফ্ল্যাট। ধবধবে সাদা দেয়াল, সাদা সোফা, সাদা নরম কার্পেট, চারিদিকে প্লাণ্ট সবুজে সবুজ হয়ে আছে। এক পুরো দেয়াল অয়েল পেণ্ট দিয়ে আঁকা বিরাট বাঁশের ঝাড়। রুচি আছে বন্ধুর।

তোমার বন্ধু খুব প্রকৃতি ভালবাসে মনে হচ্ছে। লুইসা কথা না বলে থাকতে পারল না।

ও, হ্যাঁ। বার্ণাড ঘরে ফিরে শহুরে অভিশাপকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। ইলিউশন। যুঁইয়ের ভাষায় মায়া।

তুমিও তো নিউইয়র্ক ইউনির্ভাসিটিতে পড়াতে, তাই না ?

হ্যাঁ। ইলিউশন বা মায়া সহ্য হল না। তাই সত্যিকারের জঙ্গলে চলে গিয়েছি।

শহুরে জীবন মিস কর না ?

একটুও না। আসলেই হাঁফ ধরে যায়। এই পাঁচ বছর পরে আসলাম।

আমার জন্যে আসতে হল তো !

ঠিক আছে। যুঁইও নিউইয়র্ক দেখে নি। ওরও একটু দেখা হবে। কিন্তু কাল ভোরবেলা রওনা দেব, ট্রাফিক শুরু হবার আগে।

তোমাকে টি. ভি. দেখতে দিচ্ছি না।

ও তো আছেই। তুমি বরং যুঁইকে তাড়া দাও।

যুঁইকে তাড়া দিতে হবে না। যুঁই তোয়ালে দিয়ে চুল মুছতে মুছতে বলল। ইস যা গরম না, ঘেমে উঠেছি চান করে। যাও তুমি। তোয়ালে, সাবান সব রাখা আছে।

গ্রীনিচ ভিলেজে রবিবারেও সে কি ভিড় গাড়ি, মানুষের। ভিলেজ নাম বটে, কিন্তু গ্রামের ছায়াও নেই। চওড়া ফুটপাতে চেয়ার টেবিল পড়ে গেছে। অনেকটা প্যারিসের মতো। লণ্ডনে বড় একটা দেখা যায় না এ দৃশ্য। লুইসা, যুঁই দু জনেরই খুব ভাল লেগে গেল। যুঁই বলল, আমি ভাবতাম গ্রীনিচ বুঝি লণ্ডনের সোহোর মতো। এ একেবারে আলাদা।

অনেক তরুণবয়সী ছেলেরা খালি গায়েই বেরিয়ে পড়েছে। ওরা একজনকে দেখল সার্ট ছাড়া জ্যাকেট চাপিয়েছে, মাঝখানে টাই ঝুলছে। আরেকটা নিগ্রো ছেলে রোলার স্কেট করে রাস্তায় ধাঁ করে চলে গেল। ওদের সামনে চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে বিয়ারের বোতল নিয়ে ফুটপাতে বসে পড়ল। একটু পরেই পুলিশ এসে উঠিয়ে দিল ওদের। পুলিশ চলে যেতেই ওরা ঘুরে ফিরে আবার সেই একই জায়গায় এসে বসল।

যুঁই আর লুইসা হেসে লুটোপুটি।

চেয়ারে উঠে বসলেই পারে। যুঁই বলল।

বা, অর্ডার দিতে হবে না! পয়সা কোথায় অত।

ফ্র্যাঙ্ক গম্ভীর মেজাজে রাই খেয়ে চলেছে। আর ওরা ডাক্রি। লুইসার যেন ঝপ করে বয়স ঝরে গেছে। সে কৌতুকে কৌতূহলে চারিদিক দেখতে লাগল, আর দুই সখীর মতো হাসিতে টিপ্পনীতে সরগরম করে তুলল। ফ্র্যাঙ্ক অনেকক্ষণ পরে নোখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, তোমরা যে সবাইকে নিয়ে হাসাহাসি করছ, তোমাদের দেখে

কারা হাসছে দেখ।

হাসুক না, যুঁই হেসে বলল, মজা করার জন্যেই তো গ্রীনিচ ভিলেজে আসে।

খাবে না?

উঃ। খাওয়া তো আছেই।

কাল ভোর পাঁচটার সময় বেরবো কিন্তু। এখন রাত এগারোটা বেজেছে।

বলেছি না, আমার স্বামীটা বেরসিক। যুঁই ছদ্ম বিরক্তিতে বলল, চল চল।

তীব্র স্বরে পোঁ পোঁ করতে করতে পুলিশের দুটো গাড়ি শাঁ করে বেরিয়ে গেল। ওরা দেখল কিছু লোক ছুটছে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে।

এই না হলে নিউইয়র্ক। লুইসা চোখ বড় বড় করে বলল, নিশ্চয়ই কেউ কাউকে গুলি মেরেছে। চল দেখি গিয়ে।

যুঁই এক কথায় রাজি। ফ্র্যাঙ্ক বাধা দিল, লুইসা তোমার ফ্যান্টাসী ভেঙে যাবে দেখে ফেললে। চল খেতে খেতে ভাবা যাবে আর কি কি গ্রীনিচ ভিলেজে হতে পারে।

দোকানপাট খোলা। জমজমাট, ওরা একটা ছোট্ট আর্জেন্টিনা রেস্টুরেন্টে ঢুকল।

প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ঘুম হয় নি। আজ রাতেও ঘুমোবার সময় হবে না। লুইসার কিন্তু নিজেকে একটুও ক্লান্ত লাগল না।

গ্রীন মাউন্টেনস। সবুজ পাহাড় আর পাহাড়। ভারমণ্ট। লোকে আসে লেকে সেলিং করতে, পাহাড়ে উঠতে। লুইসা দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সাত ঘণ্টার রাস্তা। মাঝখানে নেমে ওরা পিৎজা খেল। কি বিরাট পিৎজা। লুইসা এত কি করে খাবে ভেবেও সবটাই খেয়ে ফেলল। লণ্ডনে ছোট

প্লেটে পিৎজা আসে আর এত সুস্বাদুও নয়।

লুইসা ভাবল গ্যারাজে, রেস্টুরেণ্টে, দোকানে আমেরিকানদের ব্যবহার খুব ভদ্র। আজকে কেমন আছ তুমি। ভালভাবে যেন দিন যায়। ইংলণ্ডে বিশেষ করে লণ্ডনে, লুইসা নাক সিঁটকে ভাবল, দোকানে রেস্টুরেণ্টে কারুর মুখে হাসি নেই, যেন সার্ভ করে ধন্য করে দিচ্ছে কাস্টমারদের।

খুব ঘুমিয়ে নিলে তুমি ?

পেছনের গ্যাড়ির সিটে শুয়ে শুয়েই লুইসা বলল, আর কত দূর ?

এই এসে গেল বলে। তুমি ঘুমিয়ে কাটালে, আমেরিকা দেখতে পেলে না।

আমি তো তোমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি, আমেরিকা দেখতে তো আসি নি। লুইসা আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল।

গাড়ির গতি কমে এসেছে, ঝাঁকুনি দিচ্ছে। লুইসা সজাগ হয়ে উঠে বসল। পাহাড়ে গাড়ি উঠছে। চারিদিকে কেবল জঙ্গল। গাড়ি উঠছে, তো উঠছেই। পাহাড়ের গায়ে শুধু দুটো বাড়ি চোখে পড়ল। সাত হাজার ফিট পাহাড়ের চূড়ায় যুঁইদের বাড়ি। লগ হাউস। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি বাড়ি। পাঁচ ছ-টা সিঁড়ি বেয়ে ওরা উঠল। দরজায় তালাচাবি কিছু নেই, ঠেললেই খুলে যায়। আশে পাশে বাড়ি নেই, লোক নেই জন নেই, শুধু জঙ্গল। বিরাট বসার প্লাস রান্নাঘরের সামনের দেয়াল প্রায় পুরোটা কাঁচ দিয়ে ঢাকা। পর্দা নেই। আকাশ যেন পর্দার মতো ঝুলছে। লুইসা এগিয়ে গিয়ে দেখল, পাহাড় নেমে গিয়ে অনেক দূরে রাস্তার সমান হয়ে মিশে গেছে।

কি ভাল লাগছে বাড়িটা ? ফ্র্যাঙ্কই কথা বলল।

অপূর্ব।

কোথা থেকে চারটা ধবধবে সাদা বিড়াল ফ্র্যাঙ্কের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দরজা ঠেলে অ্যালসেসিয়ান কুকুর জিম এসে ল্যাজ

নাড়তে লাগল।

ওরা সবাই কিন্তু এ বাড়িরই বসিন্দা।

তাতো দেখতেই পাচ্ছি।

তুমি এখন কিছু খাবে ?

না।

তুমি এস, তোমার ঘর দেখিয়ে দিই। তুমি একটু শুয়ে নাও। আমি ডেকে দেবখন পরে।

লুইসার ঘরটা বেশ ছোট্ট—দু দিকে কাচের জানালা, পর্দা নেই। বুঝল ওরা পর্দা ব্যবহার করে না। লুইসার অস্বস্তি বোধ হল। পর্দা ছাড়া ঘর ও ভাবতেই পারে না। মনে হয় চারিদিকে চোখ। আর এত ঝলমলে আলোতে ঘুমোবেই বা কি করে? লুইসা নিজেকে বলল, গজ গজ কোরো না, শুতে হয় শুয়ে নাও। ও বাথরুম সেরে চোখে কালো স্টকিং বেঁধে একদম ঘুমিয়ে পড়ল।

এই উঠ, তুমি কি এ দেশে ঘুমুতে এসেছ। যুঁই চা করে নিয়ে এসে বলল।

অনেক ঘুমিয়েছি ?

প্রায় তিনঘণ্টা।

গুড লর্ড! ডাক নি কেন আগে? লুইসা চা হাতে নিয়ে বলল। তুমি ঘুমিয়েছ ?

না। ওদের সব খেতে দিলাম।

ওরা কারা ?

চল দেখাচ্ছি। দুটো ছাগল, দুটো ভেড়া আছে। বাগান থেকে সব্জি তুললাম রাতে খাবার জন্যে।

তোমার জন্ম গ্রামে নাকি ?

না, কলকাতায়। যুঁই লুইসার মুখ দেখে হেসে বলল, এখানে এসে সব শিখেছি।

তুমি ডাক্তারি আর কর নি ?

না। লণ্ডন ছেড়ে আর কব্বি নি।

কি করে তোমার সময় কাটে?

দেখতেই পাবে।

তুমি এ দেশে এসে আর কাজ কর নি কোনো?

প্রথম দিকে বছর দুয়েক করেছি। টফির দোকানে টফি বানাতাম। পয়সার দরকার ছিল।

টফির দোকানে টফি বানাতে! লুইসা চোখ ঘষে বলল, আমি একই যুঁইয়ের-সঙ্গে কথা বলছি তো!

হ্যাঁগো হ্যাঁ। ওঠ। আগে রান্না সেরে নিই, না হলে চল হেঁটে আসি।

চল। তোমরা পর্দা ব্যবহার কর না কেন? লুইসা না বলে থাকতে পারল না।

দরকার কি? যুঁই সহজভাবে বলল, এখানে তো মানুষজন আসে না। কেউ নেই আশেপাশে।

লুইসার ঘামে জামা ভিজে গেছে। সে নতুন জামা কাপড় নিয়ে বাথরুমে গেল, শাওয়ার নিতে। দূত্তোর! বাথরুমে পর্যন্ত পর্দা নেই। মরুক গে! যার দেখার দেখবে। শরীর তো সকলেরই আছে!

লুইসা ঠাণ্ডা হয়ে চুপ করে বসার ঘরে বসল। সূর্যাস্ত। কত রঙের বাহার। যুঁই রান্না করছে। রান্না ঘরটা কাঠের গুঁড়ি পেতে বেদীর মতো করে তোলা। যেন ছোটখাটো একটা স্টেজ।

ফ্র্যাঙ্ক কোথায়?

ও কাজে গেছে। একটু পরেই আসবে।

ও কি করে আজকাল।

লগ হাউস তৈরি করে বিক্রি করে, আর নয় কনট্রাক্ট নিয়ে বাড়ি তৈরি করে দেয়।

বাড়ি তৈরি করতে শিখল কোথায়?

বাড়ি তৈরি করতে করতে। এ বাড়িটা ওর প্রথম হাতে খড়ি।

সত্যি! তোমার এখানে একা একা থাকতে খারাপ লাগে না?

অভ্যাস হয়ে গেছে।

কি রান্না করছ এত?

ডিমের একটা মেক্সিকান ডিশ। জিগ্যেস করে বস না কোথা থেকে শিখেছি। রান্নাতে হাতেখড়িও আমার এখানে এসে হয়েছে।

আমি কিছু করব?

আজ তোমার ছুটি। কাল থেকে কাজ কোরো।

বেশ।

একটা রেকর্ড দাও না যদি চাও তো।

না এখন থাক। একটু আকাশ দেখে নিই। বাঁ পাশের দেয়ালে কাচের স্লাইডিং ডোর, অর্ধেক খোলা, ফুর ফুর করে হাওয়া দিচ্ছে।

ফ্যাঙ্কের পেছন পেছন জিম ঢুকল।

হাই! ফ্র্যাঙ্ক বলল।

হাই! লুইসা ফিরিয়ে দিল।

রাই খাবে নাকি?

স্কচ খাবে নাকি? লুইসা জিগ্যেস করল।

দাও।

লুইসা ঘর থেকে স্কচের বোতল নিয়ে এল।

আমাকেও একটু দিও। যুঁই বলল, আমার রান্না হয়ে এসেছে। ফ্র্যাঙ্ক তুমি এখন খাবে, না, আমরা একটু হেঁটে আসব?

তোমরা হেঁটে এস। দেরি কোরো না। ক্ষিদে পেয়েছে। আমি ততক্ষণে শাওয়ার নিয়ে নেব।

আচ্ছা।

লুইসা ভাবল আমেরিকানরা ক-বার শাওয়ার নেয়! ছোট-

বেলায় মনে আছে, সপ্তাহে একদিন স্নানের ব্যবস্থা ছিল। স্নান তো নয় যেন বিশেষ ঘটনা। নার্সিংয়ে ঢুকে হেলথ সার্ভিসের পয়সায় রোজ গরম জলে গা ডুবিয়ে স্নান করার অভ্যাস হয়েছে। মা বাবা তো এখনো সপ্তাহে একদিন স্নান করে। তাও বোধহয় কমিয়ে দিয়েছে। যত বুড়ো হচ্ছে, তত পয়সা খরচের ভয়।

খাওয়া দাওয়ার পর ফ্র্যাঙ্ক বিরাট ঘরের কোণায় সরে বসে টি. ভি.-তে আমেরিকান ফুটবল দেখতে লাগল। ওরা দু জনে ব্রাণ্ডি, সিগারেট, কফি নিয়ে গল্প করতে বসল। ঘণ্টাখানেক পরে ফ্র্যাঙ্ক শুতে চলে এল। জানালায় কালো আকাশ তারার প্রদীপ জ্বালিয়ে অভিসারে যাবে বলে যেন অপেক্ষা করছে।

ওদের হাসাহাসি থেমে গলার স্বর নেমে এসেছে।

তুমি শুতে যাবে না? ফ্র্যাঙ্ক হয়তো তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

দূর! অপেক্ষা কিসের জন্যে করবে। স্বামী তো আছে, বন্ধু তো দু দিনের জন্যে এসেছে।

রাণা হলে দেখাতো দু দিনের জন্যে বন্ধু আসা। লুইসা মনে মনে ভাবল।

তুমি কেমন আছ বলো?

তোমাকে তো লিখেছি সব।

সে তো ঘটনার কথা। যুঁই মনে করিয়ে দিল। কেন রাণা গেল, কেন ওকে যেতে দিলে সে তো লেখ নি।

ওঃ যুঁই, লুইসা আকাশের তারা গুনতে গুনতে বলল, ঘটনা বলা সহজ, কেন ঘটনা ঘটে সে যে বড় জটিল। তুমি তো জান।

লুইসা চুপ করে থেকে আবার বলল, লেকার প্লেনে ওঠার পর থেকে আমার ভেতরে ভেতরে আনন্দের গান হচ্ছে। তোমাকে এতদিন পরে দেখব। দেখা হল, নিজের বেদনার কথা তখন

আর একটুও ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

কেমন আছ তুমি। তা তো বলবে অন্তত।

ভাল আছি যুঁই। খুব খারাপ সময় গেছে। আজকাল নিজেকে হালকা মনে হয়। মনে হয় যেন একটা ভীষণ বোঝা নেমে গেছে। তুমি হয়তো বুঝবে না, ভালবাসা একটা ধারালো ভারি পাথরের মতো আমার বুকে বসেছিল।

রাণাকে পাথর বলছ?

না। আমার, আমাদের ভালবাসাকে বলছি। আমার কথা আজকে থাক, তুমি কেমন আছ বল?

কেমন দেখছ?

দু জনেই তারা গুনতে বসল।

কই, বললে না তো!

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাকে একা দেখলে হয়তো দ্বিধা করতাম না বলতে। কিন্তু তুমি আর ফ্র্যাঙ্ক ঠিক—

আমাদের মেলাতে পারছ না। যুঁই হেসে সাহায্য করল লুইসাকে।

লুইসা মুখ ফিরিয়ে যুঁইকে দেখে সিগারেট ধরিয়ে বলল, তুমি ডাক্তারি ছেড়ে এক নির্জন পাহাড়ের চূড়ায়, গ্রামের মেয়ের মতো ঘরকন্না করছ আর ফ্র্যাঙ্ক প্রফেসারী ছেড়ে লগ হাউস বানাচ্ছে। তোমরা—ইউ হ্যাভ অপটেড আউট, হ্যাভণ্ট্ ইউ? লুইসা জানতে চাইল।

তুমি তো জানতে চাইছ না, যুঁই বলল, তুমি তো স্টেটমেণ্ট অফ ফ্যাক্ট বলছ। আমরা জীবন থেকে তো পালিয়ে আসি নি, আমরা অন্য জীবনের খোঁজে এসেছি।

তুমি কি অসুখী ছিলে?

হ্যাঁ। কালো কুৎসিৎ বলে বিয়ে হবে না—বাবা ডাক্তারীতে ভর্তি করে দিল। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ডিগ্রি যথেষ্ট

নয়, বিলেতের এফ. আর. সি. এস. দরকার। কম্পিটিশন, চাকরি খোঁজ, পরীক্ষা দাও, প্রমাণ কর তুমি সাদাদের সমান নয়, তাদের চেয়ে ভাল। আর ফ্র্যাঙ্ক—ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। ইউনির্ভাসিটি পলিটিকস, পেপার পাবলিশ কর, কনফারেন্সে যাও, ক্লাস নাও, প্রমাণ কর তুমি কত বিদ্বান, কত বুদ্ধিমান। জীবন যেন কেবল প্রমাণ করা। বাঁচার জন্যে নয়। শুধু কম্পিটিশন।

যুঁই লুইসাকে সিগারেট দিয়ে নিজে ধরিয়ে ব্র্যাণ্ডির গ্লাস তুলে নিল। লুইসা বোঝার চেষ্টা করল আকাশের দিকে তাকিয়ে। প্রমাণ করা তো মজ্জাগত। ওরা যে এ ধরনের জীবনযাপন করতে পারে, নতুন সব কিছু শিখে, সেও তো নিজেকে প্রমাণ করা! কম্পিটিশন? 'কম্পিট' করতেও তো ওরা জন্ম থেকে শিখেছে। ওকে বাতিল করে শান্তি পেতে পারে, কতদিন ওরা সুস্থির থাকতে পারবে? ছাগল, ভেড়া, মুরগী, কুকুব, বেড়ালকে দেখে, আর সব্জি তৈরি করে?

কি ভাবছ?

তুমি যা বললে তাই বোঝার চেষ্টা করছি। কনভিন্স হতে পারছি না পুরোপুরি। যখন তোমার শান্ত মন চঞ্চল হয়ে উঠবে, তখন?

এ দেশের এনট্রেন্স পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তারি করতে নিচে নেমে যাব। যুঁই উপত্যকার দিকে হাত দেখিয়ে বলল।

হুঁ। আমি একটু কফি করি। ভীষণ স্মোক করছি।

তোমার সঙ্গে আমিও করছি। ছেড়ে দিয়েছিলাম।

আবার ধরালাম তো!

না, তুমি চলে গেলে আবার ছেড়ে দেব।

কফি নিয়ে ওরা আবার বসল। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। জিম বোধহয় দুঃস্বপ্ন দেখেছে। কুঁ কুঁ করে কেঁদে লেজ

ঝাপটে উঠল।

তুমি দেশে যাও নি ফিরে?

না।

ইচ্ছে করে না?

করে। ভীষণ করে। প্রথম কথা পয়সা নেই, দ্বিতীয়ত ভয় করে।

ভয় করে?

ভয় করে যদি ফিরে না আসতে ইচ্ছে করে।

মা বাবা কি বলে?

প্রথমে ভেবেছিল বোধহয় যাক মেয়ের বিয়ে তো হয়েছে। ভেবেছিল, আমেরিকান যখন নিশ্চয় খুব বড়লোক। মা এসেছিল। সাতদিন থেকেই পালিয়ে গেছে।

সেকি?

এই জঙ্গলে মানুষ থাকে! পার্টি নেই, আমেরিকান সোসাইটির কোনো জাঁকজমক নেই, থাকি গরীবের মতো, ফ্রাঙ্ক শ্রমিকের কাজ করে, আমি টফি বানাচ্ছি, আমাদের দুজনকে বদ্ধ পাগল ভেবে পালিয়েছে। বেচারাদের টাকাই নষ্ট।

তোমার বাবা কি করে?

রেলওয়ের ডাক্তার। চাকুরে মানুষ। কারসাজি করে বাড়তি কালো টাকা কত ভদ্রলোক করে বা করে কিনা জানি না। ভাবতে ইচ্ছে করে, আমার বাবা সৎ। মা-বাবাকে কতটুকুই বা আমরা জানি!

জান যুঁই, তুমিই প্রথম ভারতীয় যার মুখে শুনলাম বাবা সৎ নাও হতে পারে। এবং তুমি ওদের কতটুকুই বা জান।

তাই বুঝি!

তোমার এখানে বন্ধু হয় নি?

বন্ধু! যুঁই আকাশের দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে আনমনে

কফির কাপে চুমুক দিল।

না, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয় নি। রেবেকার সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছিল, ওরা ওয়েস্ট কোস্টে চলে গেছে।

রেবেকা এই পাহাড়ে থাকত ?

না, ব্যাটেলব রোতে থাকত। এ অঞ্চলের বড় শহর। ওদের পুরনো বইয়ের দোকান ছিল। বই ঘাঁটতে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ। ওকে দেখলে তোমার আরো মজা লাগত। কড়া নিরামিষাশী, অ্যান্টি পলিউশন অ্যাণ্ড অ্যাবরসনিস্ট, অ্যান্টি কনট্রা-সেপটিভ, অ্যান্টি—

কটা বাচ্চা ওদের ?

দুটো। ও রিদম মেথড প্র্যাকটিস করত। রোমান ক্যাথলিক।

তুমিও তাই কর নাকি ?

না। অত চার্ট কে রাখবে রোজ টেমপারেচর নিয়ে, ভ্যাজাইনাতে আঙুল ঢুকিয়ে !

তবে, বাচ্চা চাও না !

যুঁই উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ পরে বলল, বাচ্চা চাই, যদি ইম্যাকিউলেট কনসেপসন হত !

ওরা দুজনেই হেসে উঠল। লুইসা আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না।

আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। তারা নিবু নিবু, সুখের ক্লান্তিতে না অপেক্ষার ক্লান্তিতে কে জানে ! ওদের এবার ঘুমোবার সময়। জন্তু জানোয়ারদের ঘুম ভাঙ্গার সময় হয়ে এল। একটা মোরগ কোঁকর কোঁ করে ডেকে উঠল।

যাও। শুতে যাও। আমি একটুখানি গড়িয়ে নিই।

কখন ওঠ তুমি ?

পাঁচটায়।

পাঁচটা ? কি কর তুমি ?

আধঘণ্টা খানেক ধ্যান করি। তারপর ওদের খেতে দিয়ে ফ্র্যাঙ্কের চা খাবার তৈরি করে দিই।

ধন্য তুমি। আমাকে ডেক না কিন্তু।

ভয় নেই তোমার। তুমি ঘুমোও।

বাথরুম সেরে ঘরে এসে জামা কাপড় ছেড়ে লুইসা বিছানায় শুল। চোখে একফোঁটাও ঘুম নেই। ঘুরে ফিরে ওদের এত বলা কথা ওর মাথায় কিলবিল করতে লাগল। সূর্যের আলো ঝকঝক করে ওর গায়ে এসে পড়ল। সাড়া পেল ফ্র্যাঙ্ক উঠেছে, কুকুর বেড়ালকে আদর করছে। রেডিওতে খবর বলছে, গান হচ্ছে। লুইসার ইচ্ছা করল, খাটের তলায় অন্ধকারে শুয়ে থাকে। ও রাগ করে চোখে বালিশ চাপা দিয়ে কোনো এক সময়ে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। ভাবতে ভাবতে যুঁইয়ের মা তো পালিয়ে যাবেই!

ঘেমে ভিজে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ক-টা বেজেছে? কোনো সাড়া-শব্দ নেই। হাত ঘড়িতে দেখল, দুটো। ও কি ঘড়ি মিলিয়ে নিয়েছিল। হ্যাঁ।

রাতের শোবার ফিনফিনে জামা পরেই ও বেরিয়ে এল। সোজা ঢুকল বাথরুমে। স্নান-টান করে, পরল কটন কাফতান। তাও যুঁইয়ের পাত্তা নেই। গেছে কোথায় মেয়েটা এই চড়া রোদে! কুকুর বেড়াল সব দেখি হাওয়া।

চা তো খাওয়া যাক। ও ইলেকট্রিক কেটল অন করে দিল।

কি ঘুম ভাঙল তাহলে!

লুইসা চমকে উঠল। কোথায় যুঁই?

রান্নাঘরের দেয়াল ঘেঁষে মই উঠে গেছে উপরে। কাল সে দেখেও নি। যুঁই উপর থেকে নামতে নামতে বলল, কি আমাকে খুঁজে পাচ্ছ না?

উপরে ঘর আছে বুঝি?

হ্যাঁ। আমার ধ্যানের ঘর। ফ্র্যাঙ্ক বানিয়ে দিয়েছে।

ও।

আজ ভোরবেলা তো সময় পাও নি! কি খাবে বল?

স্যাণ্ডুইউচ করি। তোমার জন্যে করব তো।

না। আমি সন্ধ্যাবেলা একবার খাই। একটু চা দিতে পার।

খালি পেটে চা খাবে? একটা কিছু খাও।

আচ্ছা একটু চীজ দাও। ঘরে তৈরি করেছি, ছাগলের দুধ দিয়ে।

তোমাকে যত দেখছি, ততই তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি। ফ্র্যাঙ্কও খায় না।

খুব খায়। দুপুরে এসে খেয়ে গেছে।

কখন ফিরবে?

আজকে ও গলফ খেলে ফিরবে। দেরী হবে একটু। তোমার ইচ্ছে করলে চল ব্যাটেলব রো দেখিয়ে আনব। ফ্র্যাঙ্ক গাড়ি রেখে গেছে আমাদের জন্যে।

ও গেল কি করে?

ওর বন্ধু জন ওকে ভ্যানে তুলে নিয়ে গেছে। পৌঁছে দেবে। ওর পার্টনার।

তুমি ধর্মে কবে থেকে মন দিয়েছ? লুইসা জানতে চাইল। লুইসার মা বাবা রোমান-ক্যাথলিক, ধর্মীয় শাসনের কড়া ডোজ নিয়ে ও বড় হয়েছে। রবিবার চার্চে যেতেই হবে, কমিনিউন নিতেই হবে, কনফেশনে যেতেই হবে। ষোল বছরে বাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে চার্চ ছেড়েছে। পাখা মেলার জন্যে প্রথম জঞ্জাল চুকিয়ে দিয়েছে। এখন কেউ জিগ্যেস করলে, ও বলে, আমার ধর্ম নেই।

যুঁইয়ের তীব্র কালো চোখে হালকা মেঘ খেলা করে গেল। সে বলল, ধ্যান করি শান্তি আর শক্তির জন্যে। ওকে যদি ধর্ম বল, তবে বলতে পার এ-পাহাড়ে কিছুদিন বাস করার পর ধার্মিক হয়েছি।

চল ওঠা যাক।

চল।

ওরা নিচে নামতেই যুঁই বলল, কি হবে শহরে গিয়ে? না কি যাবে?

না, চল হেঁটে আসি। শহর তো আছেই। এমন পাহাড় তো ইংলণ্ডে নেই।

চল, বেটি আর বব-এর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

কাঁচা রাস্তা নেমে গেছে এঁকে-বেঁকে। দু-ধারে ঘন জঙ্গল। বার্চ গাছে ভরা। পাইন ছড়ানো।

বেটী বব, ওরা কারা?

বব ওয়াশিংটনে টেলিভিশন প্রডিউসার ছিল, বেটী ছিল ফ্রিলান্স কপি রাইটার। ছেড়েছুড়ে এখানে চলে এসেছে। লগ হাউস বানাচ্ছে নিজের হাতে। ফ্রাঙ্ক-এর কাছে পরামর্শ নিতে আসে। ওদের লগ কেটে দিয়েছে। চল যেতে যেতে দেখবে লগ কাটা হচ্ছে।

একটু পরেই ওদের কাছে যন্ত্র চলার শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঐ যে! ফ্র্যাঙ্ক আর জন আগে নিজেরাই লগ তৈরি করত। এখন লোক রেখে দিয়েছে। ইউনিভার্সিটি, কলেজ ছুটি। ছাত্ররা কাজ করতে আসে।

যুঁই একটু এগিয়ে গেল। গাছের ছায়ায় একটি অল্প বয়সী নিগ্রো ছেলে আধশোওয়া, খালি গায়ে কফি খাচ্ছে।

হাই ডন!

হাই! কফি খাবে নাকি?

থাকলে দাও।

ওরা এসে ছায়া দেখে পাথরের গায়ে বসল। ডন ফ্লাস্ক থেকে ওদের কফি দিল।

আমার বন্ধু লুইসা, ডন। ইংলণ্ড থেকে বেড়াতে এসেছে।

হাই লুইসা।

হেলো ডন।

তোমাদের দেশে একবার যাব।

গুড ওল্ড ইংলণ্ড।

তুমি কি এখানে থাক?

না। আমি হারলেম-এর ছেলে। হার্ভাডে পড়ছি। ভারমণ্টে বিশুদ্ধ বায়ু আর ছুটিতে দু-চার পয়সা রোজগারের লোভে এসেছি।

লুইসা ওকে সিগারেট দিতে চাইল। ডন মাথা নেড়ে বলল, না। স্মোক করি না।

তুমি কি পড়ছ?

ল। হার্ভাড আমাকে নম্র, ভদ্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষী করার চেষ্টা করছে।

তুমি কি হবে?

ডন গলার হার নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, ভদ্র, তরুণ রাগী আইনজীবী হব। তুমি আজ বিকেলে কি করছ লুইসা? লুইসা একটু অবাক হয়ে কিছু বলতে যাবে, ডাক এল, ডন। ইওর টাইম ইজ আপ।

হিংসে! ডন উঠতে উঠতে বলল, তরুণীদের সঙ্গে একা একা গল্প করছি সহ্য হচ্ছে না। ডন ওর ছ-ফুট সুন্দর দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কই বললে না তো?

লুইসা এবার হেসে উঠল, বিহ্বলতাকে ঢেকে, যাও কাজে যাও। মার বয়সী মহিলার সঙ্গে ডেট হচ্ছে?

তোমার বয়স জানার আমার কি দরকার। ডন যেতে যেতে বলল, তোমার দেশের গল্প শুনব বলে তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে চেয়েছিলাম! বেশ, তোলা থাকল ইংলণ্ডের জন্যে।

যুঁই বলল. চল। যথেষ্ট হয়েছে। ওরা নিচে নামতে লাগল আবার।

তোমার সঙ্গে, যুঁই একটু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ছেলেরা এমন ব্যবহার করে না কি !

কি ব্যবহার ? লুইসা বুঝতে না পেরে বলল।

একরত্তি ছেলের আস্পর্ধা কত ! ডেট করতে চায় !

ও, তাই বলছ। লুইসা হাঁপ ছেড়ে হেসে বলল, ও তো ফাজলামী করছিল।

ফাজলামী করবে কেন তোমার সঙ্গে ?

করলই বা। লুইসা আড় চোখে যুঁইকে দেখে নিয়ে বলল, হি মেড মাই ডে ! এ মধ্য বয়সে আমার দিকে কে তাকাবে ? লুইসা হেসে হালকা করে বলল, আমার বয়সী, আর আমার চেয়ে যারা বয়সে বড় তারা তন্বী তরুণী ছাড়া মেয়েমানুষকে চোখে দেখে না। মাঝে মধ্যে তরুণ ছেলেরা আমাদের মতো মধ্যবয়সীদের পছন্দ করে কথা বললে ভালই তো লাগে। তুমি বুঝবে না তুমি তো এখনো তরুণী।

তুমি যেতে ওর সঙ্গে বেড়াতে ?

মাথা খারাপ ! লুইসা হেসে ফেলে বলল, রাণাকে সামলাতেই আমার প্রাণ বেরিয়ে গেছে। আবার দুধের ছেলেদের দিকে তাকাই কখনো ! লুইসা একটু দুষ্টু হেসে যোগ করল, বেশ লোভ হচ্ছিল কিন্তু !

ওরা বাকী রাস্তাটা চুপচাপ নেমে গেল। লুইসা একটু অস্বস্তি বোধ করল। যুঁই কি ধ্যান করতে করতে বেরসিক ক্ষুদ্রমনা হয়ে গেছে ?

এসে গেছি প্রায়। প্রায় আধঘণ্টা খানেক হাঁটার পর যুঁই বলল। সামনেই ঝরণার জল গড়িয়ে যাচ্ছে সুতোর জাল বুনে বুনে। পাঁচ হাত দূরেই জালি দেওয়া একটা ঘর। বেটী নেংটো হয়ে গা পুঁচছে। বব ওদের দেখে ডেকে বলল, এস, এস যুঁই। বেটী ভ্রূক্ষেপ না করে ভাল করে গা মুছে বাথরোব পরে নিল।

হাই বব। হাই বেটী। আমার বন্ধু লুইসা। এস ভেতরে এস। কফির জল বসিয়েছি।

একটা ছোট্ট স্টোভে কেটলি বসানো। একটু পরেই শিস দিয়ে উঠল।

ব্ল্যাক না হোয়াইট?

ব্ল্যাক, লুইসা বলল।

আমি এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাব। যুঁই বলল।

যা গরম পড়েছে না আজকে! বেটী বেঞ্চিতে বসে বলল। তিনবার স্নান করেছি।

বাড়ির কতদূর?

চল, কফি খেয়ে দেখাব।

আর কতদিন লাগবে মনে হচ্ছে।

মাস দুয়েক! শরৎকাল আসার আগেই শেষ করতে হবে। তুমি কতদিন আছ লুইসা?

সপ্তাহ দুয়েক!

সে কি! 'ফল' দেখে যাও। গাছের পাতার যা রঙের বাহার হয় না!

হ্যাঁ, যুঁই বলছিল। লোভ হচ্ছে শুনে। খুব সুন্দর জায়গাটা বেছেছ তোমরা!

আজকে একটা হরিণ এসেছিল। বেটী বলল। পিটারের সে কি কান্না হরিণ যখন পালিয়ে গেল।

পিটার কোথায়?

ঘুমুচ্ছে। সারা দুপুর আজকে দুষ্টুমী করেছে।

ওর বয়স কত?

আড়াই বছর। বেটী হেসে বলল, ওর একটা ভাই বা বোন দরকার শিগগিরি।

হচ্ছে নাকি?

বেটী পেটে একবার হাত বুলিয়ে বলল, হচ্ছে মনে হচ্ছে।

বব বেটীর কপালে আলগোছে চুমু খেয়ে বলল, ঠিক যেন হয়।

এবারে সব ঠিক হবে। এ তো ওয়াশিংটন নয়। বিষাক্ত হাওয়া।

লুইসা সিগারেট বার করতে গিয়ে আবার রেখে দিল বিষাক্ত হাওয়ার কথা শুনে।

বব দেখে বলল, এখানে তো খোলামেলা, খেতে পার একটা।

না থাক।

গ্যাসোলীন আর স্মোকে শহরের বাতাস বিষাক্ত। ইংলণ্ডে আজকাল অ্যান্টি-স্মোকিং ক্যাম্পেন হচ্ছে শুনছি। বেটী জানতে চাইল।

হ্যাঁ, অনেকেই ছাড়ছে। বিশেষ করে ডাক্তাররা। আমিও ছেড়ে দিয়েছিলাম। আবার ধরেছি!

চল বাড়ি দেখাই। বব বলল, আরো ঘণ্টা তিনেক কাজ করা যাবে। বেটী তুমি আসবে না কি?

না। পিটার যদি ওঠে। তোমরা যাও। আমি রান্না করে রাখছি। তোমরা খেয়ে যাবে নাকি?

নো। থ্যাঙ্কস। অনেক বেলায় খেয়েছি আমরা। যুঁই তাড়াতাড়ি বলল।

ফিরে যাওয়ার পথ ওপরে ওঠার। পথ যেন আর শেষ হয় না। পাহাড়ে তাড়াতাড়ি হাওয়া বদল হয়। চড়া রোদ নেমে গেছে। ওরা পাথরে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। কোথাও জনমানুষের শব্দ নেই। লগ কাটার যন্ত্র থেমে গেছে। সবুজ পাতার রঙ ঘন হয়ে আসছে।

কেমন লাগছে তোমার?

ভাল। মনে হচ্ছে মন্ত্রবলে অন্য এক জগতে পৌঁছে গেছি।

বব-বেটীকে ভাল লেগেছে?

লেগেছে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি না আমি আমেরিকানদের। ওয়াট মেকস দেম টিক্ ?

জিগ্যেস করলে না কেন ?

তুমি বুঝতে পার ওদের ?

কে কাকে কতটুকু বুঝতে পারে ?

ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে পাঁচ বছর ঘর করছি। যখন মনে হয় ওর সব জানি, ও হঠাৎ আমাকে অবাক করে দেয়। কিন্তু তুমি আমেরিকানদের কথা জানতে চাইছ। মূলত মানুষ কি খুব আলাদা ? তুমিও তো ভারতীয় স্বামীর সঙ্গে ঘর করেছ ?

লুইসা দাঁত দিয়ে ঘাসের ডগা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, মূলত মানুষের তফাৎ নেই। রঙের তফাৎ, কালচারের তফাৎ, প্রকাশের তফাৎ। সব মানুষের চাওয়া তো এক—সুখ, শান্তি, ঘর, ভালবাসা। একজনের চাওয়া আর পাওয়ার ধরন একেক রকম এই যা।

যুঁই বলল, চল। ওঠা যাক। সন্ধ্যা নেমে আসছে। ফ্র্যাঙ্কের আসার সময় হয়ে যাবে। নীলিমাদের ঘরে ঢোকাতে হবে। চল। ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল। লুইসা বলল, এখন বুঝছি বয়েস হয়েছে। পা ধরে আসছে।

সে তোমার অভ্যাস নেই বলে। যুঁই ওকে সান্ত্বনা দিল। তোমায় ভয় করে বয়েস হচ্ছে বলে।

একাকীত্বের ভয় করে। সঙ্গীহীন হয়ে থাকার ভয়।

ভারমণ্টে বলে এস !

লুইসা হাসল।

না, সত্যি বলছি।

আমেরিকায় আমি থাকতে পারব না। আমার শ্যাওলা পড়া বৃদ্ধ ইংলণ্ড বেঁচে থাক।

ওরা বাড়ির কাছাকাছি আসতে লুইসা একটু থেমে বলল, যুঁই !

হুঁ!

ডনকে নিয়ে তুমি এত রাগ করলে কেন তখন?

যুঁই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে ছাগল দুটোর খুঁটির দড়ি খুলতে খুলতে বলল, তুমি দু দিনের জন্যে এসেছ, যদি ডন-এর সঙ্গে চলে যেতে একটা সন্ধ্যা তোমার সঙ্গ পেতাম না।

ও যুঁই, লুইসা যুঁইকে জড়িয়ে বলল। নীলিমা ব্যাপারটা পছন্দ না করে লুইসাকে এক গুঁতো দিল। লুইসা থাইয়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, হিংসুটে কোথাকার।

আমার মতোই। যুঁই হেসে বলল। যাও, তুমি উপরে যাও। আমি ওদের খাবার দিয়ে আসছি।

লুইসা ঘরে ঢুকে কার্পেটে সটান শুয়ে পড়ল। ওর ঝিম ধরে আসল।

যুঁই ঘরে ঢুকে বলল, ওঠ, আমার সঙ্গে যোগাসন কর। শিখিয়ে দিচ্ছি, সব ক্লান্তি চলে যাবে।

এই বুড়ো বয়সে আমাকে আর টানাটানি করছ কেন?

বয়স-বয়স কোরো না তো! বয়স তো মনের।

বয়স শরীরেরও। হোক আমার মতো বয়েস বুঝবে তখন।

ওঠ তো। যুঁই লুইসার হাত ধরে বলল, বয়সের জন্যে দুঃখ করে করে বৃদ্ধা হয়ে যাবে। দেখ আমাকে। আগে আমার দেখাদেখি একটু ফ্রি হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ করে নাও।

যোগাসনের মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক এসে উপস্থিত। লুইসা চেষ্টা করছিল ঘাড়ে ভর করে পা তুলে দিতে। ও ফ্র্যাঙ্ককে দেখে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসল।

ডোণ্ট মাইণ্ড মি। ফ্র্যাঙ্ক বলল রান্নাঘরে উঠতে উঠতে।

ও দেখেও না। কর তো।

মাথা খারাপ। ফ্র্যাঙ্ক আমাকে উদ্ধার করেছে। মাথায় রক্ত নেমে মাথার কলকব্জাগুলো ভাসতে থাকুক আর কি!

ফ্র্যাঙ্ক হেসে বলল, বুরবন নেবে না কি ?

দাও। অনেক বরফ দিয়ে।

যুঁই শবাসন করতে করতে বলল, কালকে একবার বব-এর ওখানে যেও। ও তোমার কাছে প্লাম্বিং বসানোর পরামর্শ চায়। ফোন করবে বলেছে।

ফ্র্যাঙ্ক গ্লাস নিয়ে টি. ভি. খুলে ওর আরামী সোফার এক কোণায় পা টেবিলে তুলে দিয়ে বসল।

ডেট্রয়টের কনভেনসন দেখাচ্ছে। রোণাল্ড রেগান বক্তৃতা দিচ্ছে, বেলুন উড়ছে—

আমেরিকার রাজনীতির তামাশা দেখ লুইসা। ফ্র্যাঙ্ক ডেকে বলল।

লুইসা হাঁ করে দেখতে লাগল। ইংলণ্ডে এমন তামাশা দেখা যায় না। যেন মেলা বসেছে। ফান! কার্নিভ্যাল।

কে এবার প্রেসিডেণ্ট হবে মনে হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক ? চীনা বাদাম ফেরীওয়ালা, না ফিল্মস্টার মাস্তান, যুঁই পদ্মাসনে বসতে বসতে বলল।

কেউ উত্তর দিল না। টি. ভি.-তে চীৎকার করে উঠল হাততালি দিয়ে।

ঝপ করে যেন অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশে একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না।

কি খাওয়া দাওয়া হবে না আজকে ?

এক্ষুণি পিৎজা করে দিচ্ছি। এস লুইসা।

ফোন আসল। টি. ভি.-র গলা নামিয়ে ফ্র্যাঙ্ক ফোনে কথা বলতে লাগল। ব্যবসার কথা।

কে ফোন করল ? ফ্র্যাঙ্ক রিসিভার নামিয়ে রাখার পর যুঁই রান্নঘর থেকে জানতে চাইল।

জন। একটা নতুন কনট্রাক্ট এসেছে। নেব কি না ডিসকাস করছিলাম।

এখন নতুন কাজ নিলে শীতের আগে শেষ করতে পারবে? যে বাড়িটা করছ এখনো তো আরো মাস দু-তিন লাগবে!

হুঁ। আরো খাটতে হবে এই যা। এ-বছরে কলকাতায় যেতে হলে তো টাকা লাগবে।

হুঁ। যুঁই আর কিছু বলল না। ও যেন দেশের মনে ডুবে গেল।

এ কি তুমি নুনের বদলে দেখি চিনি দিতে যাচ্ছ। লুইসা যুঁইয়ের কবজি ধরে বলল।

সত্যি! যুঁই লজ্জা পেয়ে হেসে বলল। ফ্র্যাঙ্ককে যা দিই ও তাই খায়, চিনি দিলেও খেয়ে নিত।

ভাল স্বামী পেয়েছ তুমি!

ওরা খেতে বসে। ফ্রাঙ্ক যুঁইকে তিনবার ওঠাল। লুইসার রাগ হতে লাগল, কেন অর্ডার না দিয়ে নিজে নিয়ে আসতে পারে না! রাণা কিন্তু এ রকম ছিল না। অর্ডার করত না। লুইসা মনে মনে বলল।

এক গ্লাস দুধ দাও। ফ্র্যাঙ্ক খাওয়া শেষ করে বলল। যুঁই উঠতে যাবে খাওয়া ছেড়ে, লুইসা বলল, আমি আনছি। তুমি বস।

ফ্রাঙ্ক দুধ নিয়ে আবার টি. ভি.-র চেয়ারে বসল।

তুমি টি. ভি. দেখ?

না। আমার ভাল লাগে না টি. ভি.।

কি কর সন্ধ্যাবেলা তাহলে?

একটু আধটু পড়ি। সেলাই করি। জামা কাপড় তো আমি বাড়িতে তৈরি করি। সন্ধ্যাবেলা ছাড়া তো বসার সময় পাই না।

দু জনে গল্প করতে বসল। কিছুক্ষণ পরে ফ্র্যাঙ্ক টি. ভি. বন্ধ করে গুডনাইট বলে চলে গেল। কুকুর, বেড়াল ওরা পিছু পিছু দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এল।

লুইসা বলল, তুমি শুতে যাও। আমাকে জেটল্যাগে ধরেছে। ঘুম পাচ্ছে।

আচ্ছা, কালকে আপেল বাগানে নিয়ে যাব।

দিন গড়িয়ে চলল ঝরণার মতো সুতো বুনে বুনে। গল্পে, হাসিতে, কথায়। চাঁদ ভরে-ভরে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে গেল। ওরা আলো নিভিয়ে চাঁদের আলোয় শুকনো বন্যায় গল্প করতে লাগল অনেক রাত পর্যন্ত। কালকে লুইসা চলে যাবে। খুব আস্তে আস্তে রেকর্ড প্লেয়ার চলছে, সাইগলের গান—খেলা ভাঙ্গার খেলা, খেলবি আয় আয়—

তোমার খারাপ লাগছে না তো শুনতে?

না। লুইসা বলল, তোমাদের বাঙালী গান শোনা আমার অভ্যাস আছে। ঘুম পেয়ে যায় কিছুক্ষণ শুনলে পরে। অ্যা অ্যা অ্যা—লুইসা নকল করে ভেংচি কাটল।

যুঁই হেসে বলল, তোমরা বেরসিক মানুষ। বাংলা গানের মর্ম বুঝবে কি? ফ্র্যাঙ্ক শুনলেই টি. ভি. চালিয়ে দেয়।

যুঁই অনেকক্ষণ পরে বলল, এই পূর্ণিমার চাঁদ দেখলে আমার খুব দেশের কথা মনে পড়ে। একই চাঁদ, কতদূরে দেশ!

দেশের জন্যে তোমার খুব মন কেমন করে, না? লুইসা নরম করে বলল।

যুঁই সরাসরি উত্তর না দিয়ে আনমনে বলল, সে জন্যে বোধহয় আমি ফ্রাঙ্ককে ক্ষমা করতে পারি না। ও আমাকে বিয়ে না করলে এতদিনে আমি দেশে ফিরে যেতাম।

তুমিও তো ওকে বিয়ে করেছ।

তা করেছি।

আর তা ছাড়া কত ভারতীয় তো স্ব-ইচ্ছায় বৃটেনেই থেকে যায়। তুমিও হয়তো থেকে যেতে।

কে জানে! হয়তো যেতাম। বাবা ভাইবোনদের কথা খুব মনে পড়ে।

মার কথা ?

মা ? মা এক আজব চিজ। রেলের ডাক্তার যে বড়লোক হল না, মা বাবাকে কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারে নি। কোয়ার্টার যতই ভাল হোক না কেন, মাসীদের মতো তো নয়। মা জীবনে কি চেয়েছে কে জানে! সুখ শান্তি ঘর ভালবাসার কথা বলছিলে না একদিন তুমি ? মার তো সব হতে পারত, তবু মার মন ভরে নি।

মার মতো হবে না বলে কি তুমি ইহলোকের ধন মান খ্যাতি পরিত্যাগ করেছ ?

যুঁই মুখ ফিরিয়ে একটুক্ষণ ভেবে বলল, হতে পারে। আগে এ-ভাবে ভেবে দেখি নি। যুঁই একটু হেসে বলল, মার মুখ যদি দেখতে যখন আমাদের ঘরে প্রথম ঢুকল। সব সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ঝরঝরে কার্পেট, সোফা, ফ্রীজ। এই নাকি ধনী আমেরিকা ? বেচারা মা! যুঁই আবার একটু পরে বলল, অন্য ভাইবোন হয়তো মাকে দেবে, দেখাবে আমি যা পারি নি।

তুমি চাও না বল।

ঐ একই কথা।

তুমি কি সুখী যুঁই ?

সুখী ? যুঁই উত্তর না দিয়ে উঠে বলল, চল একটু হেঁটে আসি। অনেক সময় রাত্তিরে হরিণ দেখা যায়। বনের সোনার হরিণ!

কি বলছ ?

বাংলায় কথা বলছি।

চল।

ওরা উঠে বেরোতেই জিম ওদের পিছু পিছু আসল।

তোমাকে পাহারা দিচ্ছে।

হ্যাঁ। যুঁই মাথা নেড়ে সায় দিল।

উঁচু গাছের ছায়া পাথর ছড়ানো কাঁচা রাস্তায় পড়েছে। ওদের পায়ের শব্দে পাথরগুলো কচমচ করে উঠল।

তোমার বিয়ে কেন ভেঙে গেল লুইসা ?

এত স্তব্ধ সজাগ আলো-ছায়ায় মেশানো স্বপ্নের জগতে 'ভাঙা' শব্দটা যেন মানালো না। তারা-ছড়ানো আকাশ যেন দূরে সরে গেল। মানুষের বুদ্ধিহীন ভাঙাভাঙির গল্প শুনে-শুনে যেন ওরা ক্লান্ত হয়ে গেছে। বৃদ্ধের মতো চোখের জ্যোতি নিভে গেছে।

এত সুন্দর রাতে, লুইসা আস্তে আস্তে বলল, নিজের জীবনের ছবি মনে হয় অন্য এক জগতের। তারপর একটু চুপ করে থেকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, কেন ভাঙল ? আমাদের সম্পর্কটা ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের মতো। কোনো পক্ষই হার মানতে রাজি নয়। তিনটে অলটারনেটিভ ছিল—আত্মত্যাগ, ব্রেকডাউন আর ভাঙা।

তুমি এখনো রাণাকে ভালবাস ?

কিছুদিন আগে জিগ্যেস করলে বলতাম, ঐ মানুষকে আবার ভালবাসা। কিন্তু সে কথা রাগের কথা হত। এখন জানি ওকে আমি ভালবাসি না। ভালবাসা অনেক আগেই মরে গিয়েছিল। ভালবাসার মৃতদেহ নিয়ে বাস করছিলাম, আগলে রেখেছিলাম ভালবাসা মনে করে। বিয়েটা, লুইসা একটা পাথর তুলে নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, অনেক ক্ষেত্রে বিষয়-সম্পত্তি হয়ে যায়। যেমন হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার বন্ধু আমার পেসেন্ট। ওরা মানুষ তো নয় যেন বস্তু।

যুঁই দাঁড়িয়ে পড়ে সপ্তর্ষীতে কাল্পনিক লাইন দিতে দিতে বলল, জান তুমি অন্য নার্সদের মতো নও!

কী রকম ? লুইসা একটু এগিয়ে থেকে বলল।

নার্সদের কাছে জীবন খুব কাট অ্যাণ্ড ড্রাই। ওরা ভাবের জগৎ নিয়ে ভাবে না বড় একটা।

কিন্তু তুমিও তো আর ডাক্তারদের মতো নও।

না। বোধহয় কোনোদিন ছিলামও না।

আফশোষ হয় না ডাক্তারি শিক্ষাকে কাজে লাগালে না বলে।

এ দেশে কাজে লাগানো মানে অনেক অনেক পয়সা করা। দেশে পাশ করে ডাক্তারি করতে গিয়েছিলাম গ্রামে সরকারি চাকরি নিয়ে। আদর্শ নিয়ে মানুষের ভাল করছি ভেবে।

কি হল সে ভাল করার!

গ্রামের প্রাইমারি হেলথ সেণ্টার অনেকটা তোমাদের কটেজ হাসপাতালের মতো, দেখে প্রাণ আঁৎকে উঠল। মন শক্ত করে বললাম, এর চেহারা আমি পালটাব। কনট্রাকটাররা দু হাতে পেসেণ্টদের খাবারের টাকা লুটছে। পলিটিকাল দাদাদের কথা শুনে আমায় হাসপাতাল চালাতে হবে। কনট্রাকটার পার্টির-দাদার বন্ধু। অন্য সব কথা তো ছেড়েই দাও—স্টারিলাইজ করার ব্যবস্থা নেই, বিনা আলোয় রাত্তিরে অপারেশন করতে হবে। পেসেণ্টরা বাথরুম ব্যবহার করে না, হাসপাতালের সামনে নালায় পায়খানা করতে বসে, সেই নালা পুকুরে গিয়ে পড়েছে। সেখানে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, স্নান সব কিছু হচ্ছে।

সে কি! কি বলছ তুমি?

আমাদের দেশে ডাক্তারি তো বিলাসিতা। আগে দরকার স্যানিটেশন। দু মুঠো পেট পুরে খাওয়ার। যুঁই চকচকে কালো চোখে স্থির রেখে বলতে লাগল, পাশ্চাত্য দেশ দারিদ্র্য দূর করেছে, অর্থাৎ আমাদের দেশীয় দারিদ্র্য দূর করেছে। পাবলিক হেলথ এসে এপিডেমিক দূর করেছে।

অসুখ তো দূর করে নি। দুঃখও নয়। লুইসা বলল।

না করে নি। তথাকথিত অ্যাফ্লুয়েন্সের অসুখ আর অ-সুখ। তাই বোধহয় আমরা পালিয়ে এসেছি ভারমণ্টে। ফ্র্যাঙ্ক, বব এরা এখন দারুণ অ্যাণ্টি-ইনটেলেকচুয়েল! যুঁই আচমকা হাসতে লাগল।

হাসছ কেন?

পাহাড় কি গম্ভীর, নিশ্চল, পাহাড় বেয়ে ঝরণার জল চঞ্চল, ঘন ঘন গতি পালটায়। যুঁই চুপ করে গেল।

চল, অনেক দূরে এসে পড়েছি!

ভয় করছে?

কেমন যেন গা-টা ছম ছম করে উঠল।

চল, ফেরা যাক।

জিমও লেজ নেড়ে পিছু নিল।

লুইসা কফি করে নিয়ে এল।

তুমি কি করবে ফিরে গিয়ে?

বাড়িটা বিক্রি করতে হবে। যা স্লাম্প, কি দাম পাব জানি না। উগাণ্ডায় একটা চাকরির দরখাস্ত করে এসেছি। দেখা যাক কি হয়।

ইদি আমিন-এর দেশে যাবে? দেশ ছেড়েই যখন যাবে, ভারমণ্টে আস না কেন?

আফ্রিকা যাওয়া ছোটবেলার স্বপ্ন। দেখে আসি কী রকম আজব দেশ।

আবার কবে আসবে?

আসব। আবার আসব। যখন ক্লান্ত হয়ে যাব, তোমার কাছে বিশ্রাম নিতে আসব।

এর পরেরবার যখন আসবে, একসঙ্গে নায়গ্রা ফলস যাব।

তুমি দেখেছ?

না। ফ্র্যাঙ্ক নিয়ে যাবে না। কমার্শিয়াল হয়ে গিয়েছে বলে।

লুইসা চুপ করে গেল।

এবার বোধযয় একটু গড়িয়ে নেওয়া দরকার। তোমাকে তো আবার বসটন এয়ারপোর্টে কতক্ষণ লাইন দিতে হবে তার ঠিক আছে।

হ্যাঁ, শুতে যাই। আমি গেলে তুমি একটু ঘুমিয়ে বাঁচবে।

যুঁই উত্তর দিল না।

লুইসা কফির কাপ রান্নাঘরে রেখে শুতে চলে গেল। এখনো নক্ষত্র জগৎ সজাগ হয়ে জানালায় ঝলমল করছে। দূর দিগন্তে পাহাড়ের কালো চূড়া ঘুমুচ্ছে। লুইসা ছটফট করে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

বসটন। লণ্ডন। লেইকা এয়ারওয়েজ বেঁচে থাক। স্কাই ট্রেন—আকাশ—রেলগাড়ি।

তেরো

এক মধ্যরাত্রে তপু আর সুজান এসে হাজির। টেলিভিশনে থ্রীলার দেখে দীপক আর মলি উপরে শুতে গেছে। নিচে বসার ঘরে খুটখাট শব্দ। ফিসফাস কথা। মলি বাথরুম থেকে বেরিয়ে দীপককে বলল, দেখ তো কি ব্যাপার?

দীপক সিঁড়ির আলো জ্বালিয়ে নামতে গিয়ে দেখে তপু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে বলছে, তোমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম বুঝি?

মলি ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে দৌড়ে নিচে নেমে দু হাত বাড়িয়ে তপুকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে দেখল পাশে ছোট্ট একটি মেয়ে জিন পরে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে টি শার্ট।

মা, এ হল সুজান। বাংলায় যোগ করে দিল, তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না তো ও এ ক-দিন থাকলে?

হ্যালো সুজান!

অসুবিধা আবার কি! তনির ঘর তো খালি পড়েই আছে। দীপক বলল।

মলি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, তোমরা এখন কিছু খাবে?

না, মা আমরা ডোভার-এ নেমে খেয়ে নিয়েছি। ভীষণ ক্লান্ত।

দরকার শুধু বিছানার। আমি চা করে নিয়েছি। খেয়েই শুয়ে পড়ব। তোমরা যাও।

আমি সুজানের ঘর তো দেখিয়ে দিই। এস সুজান। মলি বলল।

সুজান ওর বোঁচকা কাঁধে করে মলির পিছনে পিছনে উঠল, চায়ের কাপ হাতে করে। মলি ওকে তোয়ালে বার করে দিল, বাথরুম কোথায় দেখাল। তনির বিছানা তৈরি করাই আছে। তনির দুই দেয়ালে বড় বড় পোস্টার, একটা আইনস্টাইনের অন্যটা জেন ফণ্ডার।

মলি সুজানকে বলল, আর কিছু দরকার হলে ডেকো। আমার ঘুম খুব পাতলা। ডাকতেও হবে না, পায়ের শব্দ পেলেই ঘুম ভেঙে যাবে।

অর্থাৎ আমার কান পাহারা দেবে। তপুর ঘরে যাবার চেষ্টা কোরো না। সুজান হাসি চেপে বলল, বালিশে একবার মাথা পড়লেই আমি অজ্ঞান। আর কিছু দরকার হবে না। অনেক কষ্ট দিলাম এত রাত্তিরে এসে।

কষ্ট আবার কি। আমরা তো কেবল শুতে যাচ্ছিলাম। গুড-নাইট সুজান।

গুড নাইট মিসেস বোস।

মলি তপুর ঘরে গিয়ে দেখল ও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। মলি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। খোলা জানালা দিয়ে অল্প অল্প হাওয়া আসছে। ও জানালাটা টেনে আধবোজা করে দিল। গরম কাল হলে হবে কি, ভোরবেলা অনেক সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে। মলি আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল। এতই ক্লান্ত ছেলে, এতদিন পরে বাড়ি ফিরে মার সঙ্গে একটু কথা বলতেও ইচ্ছে করল না।

মলি শোবার ঘরে এসে দেখল দীপক নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। মলি ড্রেসিং গাউন খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল অন্য পাশে। সবাই ঘুমুচ্ছে, ওর চোখে ঘুম এল না। থেকে থেকে হুশ্ করে গাড়ি যাচ্ছে স্পিড দিয়ে। কোথা থেকে ফিরছে ওরা, কোথায় যাচ্ছে ?

কি বলে তপু সুজানকে নিয়ে এল এ-বাড়িতে ? এ দেশে মানুষ হয়েছে বলেই কি এত সাহস হল ওর ? কই, ওদের তো এত বাঙালী চেনা আছে, তাদের ছেলে-মেয়েরা তো বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে এসে বলে না কটা দিন থাকবে ! বাইরে বান্ধবী নিয়ে বেড়ানো এক কথা আর ঘরে এনে তোলা অন্য জিনিস। তা ছাড়া তপু তো অন্য ধরনের ছেলে। ওদের বাঙালী, ভারতীয় বন্ধুরা চিরকাল বলে এসেছে, কি অদ্ভুৎ ভাল তোমার ছেলে। ওসব দিকে নজর নেই। তুমি দেশ থেকে মনের মতো বৌ নিয়ে আসবে। ডাক্তারি পাশ করলে।

তপু তো ওকে সব কথা বলে কিন্তু সুজানের কথা বলে নি কেন ? এই তো ইস্টারের ছুটিতে দু দিন এসে থেকে গেল, কই বলে নি তো কিছু। দুম করে জানিয়ে দিল, সুজানের সঙ্গে ইয়োরোপে যাচ্ছি, সঙ্গে নিয়ে আসব। ছেলে তো এখনো বাবা, মা-র টাকায় পড়ছে, এত আস্পর্ধা হল কোথা থেকে ? যত এ দেশের বদগুণ নেয়া হয়েছে। স্বাধীনতা—অর্থাৎ যা ইচ্ছা তাই করা। নিজে রোজগার করুক, তখন যা ইচ্ছা তাই করুক।

মলি তো ছেলেকে বেঁধে রাখে নি যে গরু ছাড়ার মতো যা ইচ্ছে তাই করবে। সে নিজেই তো একদিন তপুকে বলেছিল, কেমন ছেলে রে তুই। পার্টিতে যাস না, ডিসকো খাস না। বান্ধবী নেই—

তপু মাকে থামিয়ে হেসে বলেছিল, খুব ভাবনা দেখছি তোমার ! না, আমি স্কিৎজোফ্রেনিক নই, হোমোসেক্সুয়েলও নেই। বান্ধবী ? কেন তুমি তো আমার বান্ধবী !

মার সঙ্গে ফাজলামি হচ্ছে !

একটু করলামই বা ! তুমি আমার মা, তুমি আমার একটু বন্ধুও তো ! তপু বলেছিল ঠাট্টার স্বরেই। কিন্তু মলির বুক কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। আমার ছেলে !

সে শুধু মা নয়, সখীও বটে। অনেক সময়ে তুমি তো আমার বান্ধবী কথাটা ঘুরে ফিরে মনে এসেছে। কোনো সময়ে অচেনা লোক হয়তো জিগ্যেস করেছে, একি তোমার ছোট ভাই। মলির বুক একরকমের অস্বস্তিকর খুশিতে ভরে উঠেছে। দীপককে বলেছে ভাইয়ের কথা, কিন্তু ছেলের বলা বান্ধবীর কথাটা বলবে বলবে করেও বলতে পারে নি। দীপকের উত্তর, খুব খুশি ? তোমাকে অল্প বয়স দেখায় বলে ?

কোনো মধ্যবয়সী খুশি হবে না অল্প বয়সী দেখায় বললে ?

সে তো গেল অন্য কথা। তপুর মতো ভাল ছেলে হাওয়া হয়ে গেল ইয়োরোপে বান্ধবী নিয়ে, দল বেঁধে গেলে তাও এক কথা ছিল। শুধু জানিয়ে। অনুমতির দরকার নেই ? চিঠির উত্তর যাবে তার ঠিকানা দেওয়া নেই। নিয়ে এসে হাজির—অসুবিধা হবে না তো ? এ দেশে থেকে ওরা উদার হতে পারে, তাই বলে মা-বাবার ভালমানুষীর সুযোগ নেবে ছেলে ! কোনো নৈতিকতা নেই, চক্ষুলজ্জা নেই ! হতচ্ছাড়ী মেয়ে প্যারিসে কি করে বেড়াচ্ছে কে জানে ! এত সাবধানে, এত যত্নে, এত আত্মত্যাগে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করা কি যা-খুশি তাই করে বেড়াবার জন্যে ! ছেলে যদি ফেল করে বসে ?

যত ভাবতে লাগল, ততই মলি উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। বিছানায় ছটফট করে থাকতে না পেরে সে দীপককে খোঁচা দিয়ে জাগাল !

কি করে যে তুমি ঘুমুচ্ছ তা তো জানি না।

দীপক ধড়মড় করে বিছানায় বসে বলল, কি হয়েছে ?

কি হয়েছে! মলি রাগত ভাবে চাপা গলায় বলল, তুমি বলছ কি হয়েছে! মাঝরাতে তোমার ছেলে একটা মেয়েকে ধরে বাড়িতে তুলল, তুমি জিগ্যেস করছ কি হয়েছে?

দীপক রাগ করে পিছন ফিরে শুতে শুতে বলল, কি করতে বল আমাকে? এই রাতে মেয়েটাকে ঘাড় ধরে বার করে দেব, না দু জনকেই দেব? ঘুমোও। কাল সকালে কাজে যেতে হবে। যত বাজে চিন্তা! জীবনে এই প্রথম শুনলাম তোমার ছেলে। কাজ আছে কাল! দীপক ধমকের সুরে বলল।

কাজ! কাজই তোমার সর্বস্ব! আমি কেউ নই। আমার যেন কাজ নেই! মলি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল।

দীপকের একটা দুর্বলতা আছে, সে মেয়েদের কান্না সহ্য করতে পারে না। সে পাশ ফিরে মলিকে বুকে জড়িয়ে বলল, কেন তুমি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ ময়লা। তপু ডিসেম্বরে বাইশ বছরে পড়বে। ও ডাক্তার হবে তিন বছর পরে। সুজানকে কেন মেয়েছেলে বলছ। তপুর পছন্দর ওপর তোমার এতটুকু বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই?

এ দেশের মেয়েদের কোনো বিশ্বাস আছে?

কেন বাজে কথা বলছ জেনে শুনে? তনির এত বন্ধুকে দেখেছ, তাদের কোনো অংশে খারাপ দেখেছ তনির চেয়ে? এরা অন্যভাবে মানুষ, এ দেশের আবহাওয়া অন্যরকম। আমাদের ছেলেমেয়েরাও অন্যরকম হয়ে গেছে। তাই বলে কি ওরা আমাদের দেশের দেশী ছেলেমেয়েদের চেয়ে কোনো অংশে খারাপ!

মলি দীপকের গেঞ্জিতে চোখ মুছে বলল, আমি এ দেশের পারমেসিভ সোসাইটিতে বিশ্বাস করি না!

ময়লা, দীপক মলির চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, আমার তোমার বিশ্বাস, পছন্দর উপর ভরসা করে ছেলেমেয়েরা আর চলবে না। দেখ না, ঐটুকু মেয়ে কোন সাহসে প্যারিসে চলে গেল চাকরি নিয়ে!

ঐটুকু কি, উনিশ বছর বয়স ! কুড়িতে পড়বে !

মেয়ের বেলায় উনিশে বড় ! দীপক হেসে ফেলল।

তপু এখন ছাত্র। মেয়েটা যদি ওকে বিয়ে করতে বাধ্য করে ?

দীপক উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ পরে বলল, মলি ভাবছিল দীপক হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে, ছেলেমেয়েরা বড় হয় চলে যাবার জন্যে—দে গ্রো আপ টু গো অ্যাওয়ে, আমরা যতদিন বেঁচে থাকব, যেখানেই থাকুক না কেন, এটা ওদের বাড়ি থাকবে। ওদের তাড়িয়ে দিও না। ওদের-বন্ধুদের ভালবাসতে শুরু কর, মনে অনেক শান্তি পাবে। দীপক যেন নিজেকেই বলল।

আস্তে আস্তে ঘুম নেমে এল দু জনের চোখে। মলি ঘুম ভেঙে দেখল দীপক চলে গেছে। ঘড়িতে সকাল দশটা। ও তাড়াতাড়ি টেলিফোন করে বলে দিল হাসপাতালে, ওর শরীর খারাপ আজকে, কাজে যাবে না।

ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে মুখ ধুয়ে নিচে নেমে দেখল, তপু ডিম আর সসেজ ভাজছে।

সর, আমি ভাজছি।

না, মা, তুমি বস, তোমাকে ব্রেকফাস্ট করে দিচ্ছি।

আমি আবার সকালে কবে খাই ?

আজকে তো খাও। আমার জন্যে।

সুজান কোথায় ?

ঘুমুচ্ছে। তুমি আজকে কাজে গেলে না যে !

দেরী হয়ে গেল উঠতে। তোমার বাবা উঠিয়ে দিয়ে যায় নি !

ভাল করেছ। তুমি তো কখনো সিক-লিভ নাও না !

চুপচাপ। টেবিলে প্লেট, কাঁটা, ছুরি পড়ল।

মা, কাল অত রাতে এসে তোমাদের খুব জ্বালিয়েছি, তাই না ?

জ্বালানো আবার কি, আমরা তো জেগেই ছিলাম।

আ, তপু গুছিয়ে বসে বলল, নিজের বাড়িতে বসে খাওয়ার

মতো আরাম নেই। এই ক-সপ্তাহ যা গেছে না! এক ইউথ হস্টেল থেকে আরেক ইউথ হস্টেলে। কোনো কোনো রাত তো গাড়িতেই ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। পয়সা বেঁচেছে!

খুব কষ্ট হয়েছে তোর?

না। কষ্টরা আনন্দ দিয়েছে। কষ্ট করা তো ভাল। এখন বাড়ির আরামে মনে হচ্ছে কি কষ্টই না গেছে! তপু সসেজ মুখে পুরে খেতে খেতে বলল, কি দেখছ তুমি?

কতদিন পরে তোকে দেখছি তপু!

তপু চেয়ার ছেড়ে উঠে হেসে মার কাঁধে হাত রেখে বলল, বেশ দেখ তবে দশদিনের জন্যে।

শুধু দশদিন।

দশ দিনে কত মিনিট, কত সেকেণ্ড হয় জান তুমি?

মলি আধখাওয়া প্লেট সরিয়ে বলল, কই চা দিলি না তো!

তপু চা ঢালতে ঢালতে বলল, কই তুমি খেলে না যে।

সকালে আমার খেতে ইচ্ছে করে না।

তপু মার সামনে চায়ের কাপ রেখে চেয়ার টেনে বলল, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ, মা?

না, রাগ করব কেন? তুমি এখন বড় হয়েছ—মলি কথা শেষ করল না।

মা, তপু হাত বাড়িয়েও গুটিয়ে নিল, বলল, মা আমার দিকে তাকাও।

মলি তাকাতেই তপু হেসে ফেলে বলল, বাপরে কি রাগ, বড় হয়েছি বলে এত রাগ!

মলি এবার সত্যিই রেগে গিয়ে বলল, মার সঙ্গে কথা বলছ মনে থাকে যেন।

তুমি কি ভাবছ সুজানের সঙ্গে কথা বলছি? তপু চেয়ার আরো কাছে টেনে মার দু হাত হাতে নিয়ে বলল, মা, এত রাগ করে না।

ব্লাড়প্রেসারের যন্ত্রটাও হস্টেলে রেখে এসেছি আবার!

আসতে পারি? সুজান খোলা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল। মলি হাত সরিয়ে নিল।

এস। তপু উঠে বলল, বস। ব্রেকফাস্ট করে দিচ্ছি। মার সঙ্গে ঝগড়া করছিলাম এতক্ষণ!

মলি উঠে বলল, না, তোমরা বস। আমি করছি। ভাল ঘুম হয়েছে তো সুজান?

ভীষণ ভাল। বিছানা যে এত আরামের ভুলেই গিয়েছিলাম।

মলি ডিম আর সসেজ ভাজতে ভাজতে বলল, তোমার বাড়ি কোথায়?

নিউজিল্যাণ্ডে।

এত দূর দেশ থেকে—

মা, তুমি তো ওদের জান না। সুজান বল মাকে তোমাদের পাগলা দেশের কথা।

মানে, আমাদের পাগলামীর কথা? সুজান হাই তুলে হেসে বলল, ঐটুকু আমাদের দ্বীপ, একবার ঘাযাবর না হয়ে সেটল্ করতে পারি না আমরা। দু-চার, পাঁচ বছর ঘুরে ঘুরে যার যখন ঘরে ফেরার মন হয় ফিরি।

বিয়ে কর কবে তোমরা?

দেশে ফিরে। সুজান তপুকে চোখ টিপে বলল, অথবা, দু-চারজন আর ঘরে ফেরে না। থেকে যায় বিদেশে!

মলি প্লেট ধরে সুজানকে দিয়ে বলল, তোমরা গল্প কর। আমি স্নান সেরে নিই।

মা, তপু বলল—চল কোথাও ঘুরে আসি। বাবা ফেরার আগে বাড়ি ফিরলেই হবে।

তোমরা বরং যাও। আমি—

উঁহুঁ, তুমিও চল। কুঁড়েমী করা চলবে না।

সুজান আবার হাই তুলে, এক্সকিউজ মি বলে বলল, আমি নড়ছি না আজকে বাড়ি থেকে। আমার পা বিশ্রাম চাইছে। তোমরা ঘুরে এস।

মলি উপরে চলে যেতে সুজান বলল, তোমার মা আমাকে বিশেষ পছন্দ করছে না। কাল রাত্রে খুব ভয় যদি তোমার বিছানায় ঢুকে পড়ি।

তপু হো হো করে হেসে উঠল।

মাকে বলতে হবে, ভয় নেই, আমি সাতদিন সন্ন্যাসী হয়ে থাকব।

সুজান চায়ে চুমুক দিয়ে দুষ্টু হেসে বলল, তোমার মা যৌনতাকে খুব ভয় পায় তাই না?

বিয়ের আগে ওটা ভীষণ বিশ্রী জিনিস। তপু গম্ভীর ভাবে বলল। এই, তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না!

ওহো, ভীষণ বিশ্রী জিনিস। সুজান হাত গুটিয়ে বলল।

তপু উঠে আলগাভাবে সুজানকে চুমু খেয়ে বলল, মনে থাকে যেন, মা-বাবার সামনে ভুলেও আমার ধারে কাছে আসবে না।

পরেও আসব না।

দেখব কেমন করে দূরে থাক। তপু সুজানকে জড়িয়ে বলল।

আমি তো যাবাবর। দু দিন পরে হাওয়া হয়ে যাব। প্রেমে পড় আর যাই কর।

হা, তপু ওকে আরো কাছে টেনে বলল, প্রেমে পড়ার যেন মেয়ের অভাব! তপু সুজানের কানে চুমু খেয়ে সরে বসে বলল, তুমি সত্যি চলে যাবে?

হ্যাঁ টোপু, সুজান আস্তে আস্তে বলল, জন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে দেশে, তুমি তো জান। আমার তো জড়িয়ে পড়ার সাধ্য নেই।

জনকে আমার কথা লিখেছ ?

লিখেছি।

তপু চায়ে চুমুক দিল।

সুজান ন্যাপকিনে মুখ মুছে বলল, জন লিখেছে, আমেরিকায় পালিয়ে যেতে।

রাগ করে নি ?

রাগ করবে কোন মুখে ? ও নিজেও তো প্রেম করেছিল এ দেশে যখন এসেছিল।

আমেরিকায়ও তো ছেলের অভাব নেই। জড়িয়ে পড়তে পার, ক্যানাডায় বা সাউথ আমেরিকায়।

তোমার হিংসে হবে ?

হবে।

কেন ? আমি জন-এর বাগদত্তা, তোমার তো নই।

লজিক দিয়ে কি অনুভূতি বোঝা যায় ?

যায় না। সুজান স্বীকার করল। হেসে বলল, ভারতবর্ষে ছ মাস কাটিয়েছি, ইংলণ্ডে এসে প্রেমে পড়তে হল ভারতীয়ের। লজিক কোথায় ?

ভারতবর্ষে কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব কর নি ?

বন্ধুত্ব করেছি, প্রেম করি নি। জন আমার শরীর-মন ভরে ছিল তখন !

এখন সরে গেছে তাহলে ?

না। জন আমার স্বামী হবে একদিন, আমার ছেলেমেয়ের বাবা হবে, এটুকুই জানি।

আমি তোমাকে সবসময়ে বুঝতে পারি না। মনটাকে যদি দেহের মতো ডাইসেক্ট করা যেত।

হোয়াট এ হরিফাইং বোরিং আইডিয়া ! সুজান বলে উঠল।

মলি উপর থেকে হাঁক দিয়ে বলল, আমি তৈরি তপু!

যাচ্ছি মা!

যেন আগেকার দিনের মতো। মলি আর তপু। কাল রাত্রের কাছে পাওয়া স্বামীকে ভুলে গেল মলি। সারা লণ্ডনের পৃথিবীর ভীড়ে মা আর ছেলে দু জনে একা। কত রকমের মুখ, কত রকমের রং, সাদা, গোলাপী, অলিভ, বাদামী, হলুদ, কালো, মিশমিশে কালো—কত রকমের পোশাকে মোড়া মানুষ। গত ক-বছর ধরে কসমপলিটান লণ্ডনে আরবীদের ভিড় আরেকটা দৃশ্য। কোনো কোনো দোকানে আরবী ভাষায় লেখা পড়ে গেছে। যার অর্থ, তার রাজত্ব! বিদেশীদের ভিড়ে ইংরেজদের চেনা মুস্কিল।

মলি ভালবাসে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ভিড়ে হারিয়ে যেতে। দীপক ভিড় পছন্দ করে না। কিছুতেই মলিকে নিয়ে আসবে না।

লর্ডস-এর কাছে এসে মলি বলল, চল, তুই একটা শার্ট পছন্দ করবি।

আমার শার্ট লাগবে না মা। অনেক আছে।

চল না। মলি জোর করে তপুর জন্যে একটা ডোরাকাটা শার্ট কিনে দিল।

তুমি কিছু কেন?

মলি মুখ ফিরিয়ে বলল, আমি কি কিনব? এ তো অল্পবয়সীদের দোকান। কত ঢং-এর জামা কাপড় মলি দেখল। পঞ্চাশ সালে লণ্ডনে এসে যে শাড়ি পরে কাটিয়ে দিয়েছে। বছর চলে যায়, বয়স বাড়ে, মনের ইচ্ছার বয়স বাড়ে না কেন?

চল মা, এখান থেকে পালানো যাক। বড় ভিড়।

ওরা সাউথ মল্টন স্ট্রিট-এর একটা পাবে গিয়ে বসল। এ রাস্তায় গাড়ি আসা বারণ। রাস্তায় চেয়ার টেবিল, ছাতা পাতা প্যারিসের কায়দায়। দু-চারটে বেঞ্চি ছড়ানো। ছোট ছোট ফ্যাশনেবল

দোকান, জাপানী রেস্তোরাঁ, মল্টন ব্রাউন আর ভিডাল সাস্থন হেয়ার স্যালন এ ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খদ্দের টানছে চড়া দামে।

মলি বসে ব্যাগ থেকে তপুকে দশ পাউণ্ডের নোট দিয়ে বলল, আমার জন্যে কটেজ-পাই নে। আর এক কারাফ ওয়াইন নেয়া যাক। উঃ পা-টা ধরে গেছে।

ভিডাল সাস্থন থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে মলির মুখোমুখি বেঞ্চিতে বসল। হয়তো কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে। নীল ফাঁপা চুল, নীল চোখের পাতা, নীল হ্যাণ্ড ব্যাগ, নীল খোলা হাইহিল জুতো!

নীলাম্বরী।

কি বলছ?

একেই বলে নীলাম্বরী!

তপু হেসে বলল, কি তোমার এ রকম চুল করার ইচ্ছে?

যদি করি?

আমি পাবলিক হয়ে রাস্তার অন্য পাশ দিয়ে হাঁটব। তোমাকে আমি চিনি না।

বেশ, ছেলে মাকে চেনে না।

নীল চুলো মাকে চেনে না।

ওরা দু জনেই হেসে ফেলল। আগেকার দিনের মতো।

তপু!

হুঁ। তপু ওয়াইন-এর গ্লাসে চুমুক দিয়ে আনমনাভাবে বলল।

তপু, ম্যানচেস্টারে কোনো অসুবিধা হয় না তো!

না মা।

আমি ভাবছিলাম, আমরা তোদের পৌঁছে দিয়ে আসব একদিন ছুটি নিয়ে। তোদের গাড়ি তো দেখলাম না।

সুজানের গাড়ি! ও বিক্রি করে দিয়েছে প্যারিসে। টাকা কম পড়ে গিয়েছিল। তোমাদের পৌঁছে দিতে হবে না মা, আমরা

হিচহাইক করে চলে যাব।

এত কষ্ট করে যাবি ?

কষ্ট আবার কি ? তাছাড়া, সুজানকে দেখলেই গাড়ি থেমে যায়। তুমি কোনোদিন হিচহাইক কর নি ?

মাসি দিলে তো! কলেজ আর বাড়ি, বাড়ি আর কলেজ। মলির অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

তুমি তোমার মাসিকে এত ভয় পেতে কেন মা ?

মাসি আমার গার্জেন ছিল। ভয় না পাবার কথা মনেই আসে নি।

তোমরাও তো আমার গার্জেন! আমি কি সবসময় ভয়-ভয় করে চলব তাহলে ?

তোদের যুগ আর আমাদের যুগ! ভয় তো দূরের কথা, একবার মনে করে ভাল করে চিঠিও দিস না! মলি অনুযোগ করে বলল।

তপু ঐ 'মনে করার' ফাঁদে ধরা না দিয়ে একটু ভেবে বলল, আমি যদি ভয় করে চলতাম, ভাল লাগত তোমার মা ?

বারমেড এসে মলিকে বাটিতে কটেজ-পাই আর তপুকে স্টেক আর কিডনী-পুডিং দিয়ে চলে গেল।

সবাই অল্পবয়সীদের দোষ দেয়। আমরা কত খারাপ, তপু ন্যাপকিন থেকে কাঁটাছুরি ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, যেন আমরা মাটি ফুঁড়ে বড় হয়ে গিয়েছি, বয়স্করা আমাদের জন্মও দেয় নি, মানুষও করে নি।

মলি ওর বিশাল চোখ বড় বড় করে বলল, তোর যে এত রাগ জানতাম না তো তপু!

রাগ সকলেরই আছে। কম আর বেশি। তপু মার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার বড় সুন্দর চোখ মা!

মলি তরুণীর মতো চোখ নামিয়ে বলল, থাম, আমার চোখের

প্রশংসা করতে হবে না!

তুমি লজ্জা পেয়ে গেলে মা! সুন্দরকে সুন্দর বলব না!

নে খাওয়া শেষ কর।

সুজান একা আছে। বাড়ি ফিরবি তো এখন?

সুজান একা থাকতে ভালবাসে। চল, বাস নিয়ে একটু হাইড পার্ক কর্ণারে যাই।

খুব ভাল। মলি সোৎসাহে বলল। আগে মলি আর তপু সার্পেনটাইন লেকে রোয়িং করতে আসত। তারও অনেক আগে মলি আর কৃষ্ণস্বামী।

বাস কেন হেঁটেই চল।

চল, ভিড় ঠেলে হাঁটতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে। ইস, তপু চারিদিকে তাকিয়ে বলল, ট্যুরিস্টরাই মনে হচ্ছে লণ্ডন দখল করে বসেছে।

এ বছর তাও তো অনেক কম শুনছি। ডলারের দাম কমে গেছে একদিকে, অন্যদিকে লণ্ডন ভীষণ এক্সপেনসিভ হয়ে গেছে। শুনছিলাম লণ্ডন পৃথিবীর সবচেয়ে খরচে শহর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মলি শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ম্যানচেস্টারের গল্প বল। সেই একবারই তো আমরা গিয়েছিলাম দু রাতের জন্যে।

তপু লক্ষ্য করল মা ইয়োরোপ ভ্রমণের গল্প শুনতে চাইছে না। সে মনে মনে হেসে বলল, ম্যানচেস্টার তো জান ইনডাস্ট্রিয়াল টাউন। সৌন্দর্য কম। তবে থিয়েটার, কনসার্ট, সব কিছুই আছে। ইউনিভার্সিটি থিয়েটার খুব ভাল। প্রচুর কালো বাসিন্দা আছে, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান, ভারতীয়, পাকিস্তানী।

কি করে সময় কাটে? মলির সব জানতে ইচ্ছে করে, তপু কি পড়ে, কী ভাবে, কেমন ওর বন্ধুরা, কী ভাবে সময় কাটায়।

অন্য ছাত্রদের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয়?

সুযোগ করে নিতে হয়। কিন্তু ডাক্তারি ছাত্রদের বদনাম আছে, ওরা অন্যদের সঙ্গে মিশতে চায় না।

কেন?

তপু ওর লম্বা ছিপছিপে পা-কে সংযত করে মলির তালে হাঁটতে হাঁটতে একটু ভুরু কুঁচকে বলল, কেন বলা একটু মুস্কিল। আমরা ডাক্তারি ছাড়া অন্য ব্যাপারে বিশেষ ইণ্টারেস্টেড নই, এক ড্রিঙ্ক আর—তপু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, অন্য ছাত্ররা রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ, থিয়েটার, সংগীত নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

মলি তপুর সব কথা শুনতে পাচ্ছিল না ভিড়ে আর শব্দে। তপু যে কথা বলছে এই যথেষ্ট মলির কাছে।

তুই তো খুব বেশি ড্রিঙ্ক করিস না, হ্যাঁ?

না মা, আমি বিয়ার-ড্রিঙ্কারের দলের লোক নই। আমি তো একটু একাচোরা জান, খুব বেশি বদলাই নি।

তোর কোনো বন্ধু হয় নি? মলি চিন্তিত হয়ে বলল। ছেলে একা একা থাকে ওর ভাবতে ভাল লাগল না। সুজানের কথা সে ভুলেই গেছে।

হ্যাঁ হয়েছে, রিচার্ড বলে একটি ছেলের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব। আর সুজানের সঙ্গে তো বন্ধুত্ব হয়েছে কিছুদিন হল।

হাইড পার্ক কর্ণারে ওরা প্রায় এসে গেছে। সাবওয়ে দিয়ে ওরা নেমে গেল। এক বাস্কার গিটার বাজিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গাইছে, মাটিতে এক টুকরো কাপড় পাতা, ট্যুরিস্টরা যে যা পারে পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে। মলি ব্যাগ খুলে পাঁচ পেনি ছুঁড়ে দিল।

তপু হালকা হেসে বলল, মা তোমার দেশী অভ্যেস আর গেল না। ভিখিরি দেখলেই কি পয়সা দিতে হবে।

এমন সুন্দর গান গাইছে গিটার বাজিয়ে। মনে হচ্ছে ছুটিতে আছি যেন। কাজে ছোটা নেই, হুভার করা নেই, রান্না করা বাসন মাজা নেই, কাপড় কাচা নেই—ছুটি।

ছুটি! তপু সিঁড়ির কাছে এসে বলল, দৌড়ে ওঠ, দেখি কে আগে কর্ণারে পৌঁছয়।

মলি হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে তপুর হাত ধরে বলল, তুই বুড়ো মাকে মারবি দেখছি!

তোমাকে মরতে দিলে তো! ডাক্তার হচ্ছি কি করতে? তপু বুক ফুলিয়ে বলল।

আহারে, লোকেরা তো মরে না ডাক্তারের হাতে।

তোমাকে একশো কুড়ি বছর বাঁচিয়ে রাখব, তুমি দেখ।

ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন তোমার হাত থেকে।

তপু ভান করল যেন লাঠিতে ভর দিয়ে ঝুঁকে হাঁটছে, গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলল, তপুরে, কোথায় গেলিরে তুই?

মলি তপুকে ধাক্কা দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। কতদিন সে হাসে নি।

কি হচ্ছে, লোকেরা তোকে পাগল ভাববে! দেখ্ ট্যুরিস্টরা দাঁড়িয়ে দেখছে।

তপু ওর প্রায় ছ ফিট শরীর সোজা করে দাঁড়িয়ে বলল, লণ্ডনে তো ওরা মজা দেখতেই আসে। স্ট্যাচুর মতো কুইনস গার্ড, ট্রাফালগার স্কোয়ারের পায়রা—

আর তপুর অ্যাক্‌টিং! মলি কথাটা যোগ করে দিল।

ওরা হাইড পার্ক ধরে সার্পেনটাইন লেকের দিকে হেঁটে চলল। আজ রবিবার নয়, স্পিকার্স কর্ণার খালি। রঙিন ডোরাকাটা ইজিচেয়ারে মধ্যবয়সী বা বৃদ্ধরা চোখ বুজে সূর্যস্নান করছে অথবা বই পড়ছে। অল্পবয়সীরা ঘাসের উপর বসে দল করে আড্ডা মারছে, যারা আড়াল খোঁজে তারা পার্কের আরো ভেতরে গাছের ছায়ায় প্রেম করছে।

তোর বোরিং লাগছে না তো আমার সঙ্গে?

যাদের মাথায় গ্রে সেলের পরিমাণ কম তারাই শুধু বোরড় হয়।

তুই খুব অহঙ্কারী হয়েছিস তপু। ডাক্তারি ছাত্ররা তাই বোধহয় অন্যদের সঙ্গে মেশে না।

না গো মা, আমরা মিশি না আমাদের মূর্খতা ধরা পড়ে যাবে বলে! আর দেখ, তপু একটু হাঁটতে হাঁটতে ভেবে নিয়ে বলল, এত ইনটেলেকচুয়াল কচকচানীতে লাভটা কি, কাজ তো করুক আগে। তোমরা আমাকে 'এ' লেভেল পাশ করার পর দেশে পাঠিয়েছিলে, চায়ের দোকানে, কফি হাউসে রকে সে কি তর্ক, যেন বিপ্লব বাধিয়ে দেবে কালকেই। অত তর্কাতর্কিতেই সব এনার্জি চলে যায়। বিপ্লবটা করবে কখন। এই যে আমরা এসে গেছি, তুমি দাঁড়াও, আমি পয়সা দিয়ে আসি। ভাগ্যিস লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

মলি ঘড়িতে দেখল পাঁচটা বাজে।

তপু, কটা বেজেছে দেখেছিস।

বাজুক গিয়ে। বাসন মাজা, রান্না নেই, তোমার ছুটি আজকে।

না, সত্যি। তোর বাবার ফেরার সময় হয়ে যাবে।

সুজান তো আছে। ও রান্না করে রাখবে। ঘণ্টাখানেক রো করে নিই, অফিসের ভিড়টাও কমবে।

সার্পেনটাইন লেক ঝলমল করছে অগস্টের রোদে। অসংখ্য ছোট ছোট বোট ছিটিয়ে আছে লেকের জলে। মলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলের ছায়ায় হারিয়ে গেল। কেন আজকে থেকে থেকে কৃষ্ণস্বামীর কথা মনে পড়ছে? সেই সবুজ চঞ্চল দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে।

সার্পেনটাইন লেক যেন সেই পুরনো দিনগুলোর ছায়া বয়ে হেলেদুলে উঠছে। মলি একা। আজকে তপু আছে, দু দিন পরে সুজানের সঙ্গে সে চলে যাবে। মলি আবার একা হয়ে যাবে। স্মৃতি আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

তপু ছায়ার ওপর বোট ভাসিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এস মা।

মলি তপুর হাত ধরে বোটে নেমে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল। বোট টলমল করে উঠল।

বস। বস মা। বোট উলটে যাবে।

মলি অনিচ্ছার সঙ্গে হাত ছেড়ে এক কোণায় একা একা বসল।

নানান ভাষার টুকরো টুকরো কথা এধারে ওধারে ছড়িয়ে যেতে লাগল। বোট ভেসে চলল জলের ঢেউয়ে।

চৌদ্দ

দীপক বাড়ি ফিরে দেখে কেউ নেই। ও লাগার নিয়ে বসল কফির টেবিলে পা তুলে। অভ্যাস মতো টি.ভি. চালিয়ে দিতে ভুলল না। চোখ বুজে ওর তন্দ্রা নেমে এল। টি.ভি.র শব্দ বন্ধ হতে ওর তন্দ্রা কেটে গেল, দেখল ওর উলটো সোফায় সুজান বসে আছে কফির কাপ নিয়ে। দীপক পা নামাতেই সুজান বলল, ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম তো!

না। না। দীপক একটু লজ্জা পেয়ে বলল, ওরা সব গেল কোথায়?

টোপু আর মিসেস বোস ওয়েস্ট-এণ্ডে গেছে।

তুমি যাও নি যে!

এত ঘুরেছি না ক-সপ্তাহ। একটু শান্ত থাকার জন্যে ছটফট করছিলাম। সারাদিন তোমাদের বাগানে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি।

তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো!

একটুও না। আমিই বরং উড়ে এসে জুড়ে বসেছি।

সে জন্যে চিন্তা কোরো না, দীপক হেসে বলল, আমাদের বাড়িতে সবসময় লোকজন লেগেই থাকে।

টোপুও আমাকে তাই বলে আশ্বস্ত করেছে। আমি কিন্তু দেরী দেখে, না জিগ্যেস করেই ক্যাসেরোল বসিয়ে দিয়েছি আভেনে।

তোমরা কিছু মনে করবে না তো ?

মলি খুব খুশি হবে তৈরি করা রান্না পেয়ে। তোমার কন্টিনেণ্ট কেমন লেগেছে ?

খুব ভাল। ইচ্ছে করছিল না ফিরে আসতে।

তুমি অন্য ভাষা বলতে পার ?

একটু স্প্যানিশ জানি। ফরাসী কাজ চালিয়ে দিতে পারি, টোপুর জার্মানের মতো। তাই কোনো অসুবিধা হয় নি। আর বিদেশে বেড়াতে গিয়ে ভাষা না বোঝাটাই তো অর্ধেক মজা! অবশ্য বিপদে পড়লে নয়। সুজান হেসে বলল।

বিপদে পড় নি আশা করি।

তা একটু আধটু তো পড়তেই হয়। একটা ব্যাঙার কিনেছিলাম পনেরো বছরের পুরনো—কন্টিনেণ্টের মটর ওয়েতে ফুসে ফুসে ফসকে গেছে কয়েকবার। টোপুর একেবারে এঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধি নেই।

আমারই দোষ। শেখাই নি কোনোদিন। কোথায় তোমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে ?

বলা মুস্কিল। জানই তো নিউজিল্যাণ্ডারদের ইয়োরোপের প্রতি খুব দুর্বলতা। যেখানেই যাই, সেটাই যেন নতুন আবিষ্কার। টোপু খুব ভাল পথের-সঙ্গী। গাড়ি বাদ দিয়ে।

দীপক হাসল।

আমি খুব বক বক করছি তাই না ?

না, ভাল লাগছে শুনতে। তনির কথা মনে পড়ছে।

টনু ?

আমার মেয়ে।

ও টনু যে প্যারিসে আছে! আমরা যখন দেখা করার চেষ্টা করলাম ও তখন জেনিভায়। জেনিভায় গিয়ে শুনি ব্রিটানিয়াতে চলে গেছে। টোপুর খুব আফশোস। আমারও খুব ইচ্ছা ছিল ওর

সঙ্গে দেখা করার। টোপুর মুখে ওর কথা এত শুনেছি না!

হ্যাঁ ওদের খুব ভাব। দীপক আনমনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

ওর তো ফিরে আসার সময় হয়ে এল!

দীপক উত্তর দিল না।

তোমাকে আরেকটা লাগার এনে দেব?

না। তুমি নাও একটা।

একটু পরে নেব। ছেলেমেয়ে চলে গেছে। তোমাদের মন খারাপ লাগে, না?

বড় হয়েছে ওরা, চলে তো যাবেই। মনে মনে ভাবল, এক কথা কতবার লোককে বলবে, নিজেকে বলে বলে বোঝাবে?

টোপু কিন্তু তোমাকে, তোমার স্ত্রীকে খুব ভালবাসে।

হুঁ।

কি বিশ্বাস হল না আমাকে?

তপু তো আমার সঙ্গে বেশি কথা বলে না।

বলতে চায়। কিন্তু অভ্যেস নেই তো। টোপু তোমার কাছে আসতে চায়, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না।

দীপক এক ঝলকে সুজানকে ভাল করে দেখে নিয়ে ওর কথাটা বোঝবার চেষ্টা করল।

ছেলেরা বড় হলে, সুজানই আবার বলল, বাবাকে জানতে চায়। আমরা যেমন চাই মাকে। সুজান কফির কাপে মুখ ডুবিয়ে বলল, আমি ছোটবেলায় মার সঙ্গে খুব ঝগড়া করতাম। মা আমাকে বলত 'প্রবলেম চাইল্ড'। দেশ ছাড়ার আগে মার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। মা আমাকে তাঁর সুখ দুঃখের কথা বলত। এখন ভাবি মা-বাবার সুখ-দুঃখের কথা কতটুকু আমরা জানি। আমাদের সুখ-দুঃখের কথাই বা মা-বাবারা কতটুকু জানে। অথচ—

দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ হল। তপু আর মলি এক ঝলক

হাওয়ার মতো সূর্যের রোদ গায়ে মেখে যেন বসার ঘরকে ঝলমলিয়ে দিল।

কি তোমরা খুব গল্প করছ। মলি হাসিমুখে বলল, বড় দেরি হয়ে গেছে ফিরতে।

বস। সুজান বলল, চা করে দেব না লাগার খাবে ?

যা গরম না! লাগার খাব। তুমি বস। আমি রান্নার জোগাড় দেখি।

আমি ক্যাসেরোল বসিয়ে দিয়েছি। আশা করি তুমি—

চমৎকার। মলি সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল। আজকে সত্যিই তবে আমার ছুটি।

সুজান লাগার এনে দিয়ে আবার বসল। তপু সুজানের চেয়ারের হাতলে বসতেই সুজান উঠে অন্য চেয়ারে বসল।

কি উঠে লেগে যে। তপু ঠোঁট টিপে হেসে বলল, আমি কি হরিজন!

না আমার গরম লাগছে। সুজান ভালমানুষের মতো বলল।

কি করলে সারাদিন তোমরা ? দীপক তপুর দিকে তাকিয়ে বলল।

মাকে প্রায় সার্পেনটাইন লেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম! তপু হেসে বলল। তুমি এবার মাকে সাঁতার শিখিও তো! যা ভীতু না ?

বাজে বোকো না। মলি রাগ করে বলল। ও আমার সঙ্গে খেলা করছিল। তুমি ছেলেকে কিছু না বলে বলে মাথায় তুলেছ!

সবাই হাসল।

আমাকে বুড়ো বয়সে সিঁড়িতে রেস করিয়েছে, বৃদ্ধ হলে কেমন হব সারা লণ্ডনের সামনে আমাকে তা দেখিয়েছে, তারপরে বোট থেকে নামার সময় আমাকে ডোবানোর খেলা! বল দেখি!

ভালই সময় কেটেছে মনে হচ্ছে তোমাদের! যাই চোপা-চাপকান ছেড়ে আসি। দীপক টাই খুলতে খুলতে বলল।

আমিও একটু হাত মুখ ধুয়ে আসি। মলি উঠতে উঠতে বলল।

বাবা-মা উপরে চলে গেল। তপু কার্পেটে হাঁটু গেড়ে সুজানের কোলে মাথা রেখে ফিসফিস করে বলল, আই মিসড্ ইউ সুজান!

ডিড ইউ এনজয় দি ডে?

ইয়েস, ইয়েস। আই ডিড। আই মিসড্, ইউ অল দ্য সেম। আই মিসড্ ইউ ভেরি মাচ।

সুজান ওর মুখ তপুর মাথাভরা চুলে নামিয়ে বলল, ও টোপু! মাই লাভ!

মলি উপরে গিয়ে কি মনে করে কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসতে গিয়েও নামল না। তপু আর সুজানকে দেখে নামতে পারল না। ওর মধ্যবয়সী ক্লান্ত ভারি পা নিয়ে ও আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেল আবার। কার্পেটে মোড়া সিঁড়িতে একটুও শব্দ হল না।

দীপক উপর থেকে কথা বলতে বলতে নেমে এসে দেখল তপু সোফায় হেলান দিয়ে কার্পেটের উপর বসে কফি টেবিলে পা তুলে চোখ বুজে আছে। রান্নাঘরে টুকটাক শব্দ হচ্ছে। দীপক বসতেই তপু চোখ মেলে পা নামিয়ে দিল টেবিলের তলায়।

মা কোথায়? মার লাগার তো গরম হয়ে গেল। দিয়ে আসি গে।

থাক না। এখনি আসবে। হাত মুখ ধুচ্ছে বোধহয়। দীপক ভাবতে লাগল কি কথা বলে সে ছেলের কাছে যাওয়ার 'রাস্তা' খুঁজে পাবে!

এবার পরীক্ষা কেমন হল?

খারাপ নয়। ফিজিওলজি আর বায়োলজি পেপার বেশি ভাল হয়েছে।

এবার তো শুরু হবে ক্লিনিক্যাল ইয়ারস।

হ্যাঁ।

আবার কথা বন্ধ। টেবিলে প্লেট কাঁটা চামচ পড়ছে। সুজান গুন গুন করে গান গাইছে।

প্রথম তিন মাস খুব বোরিং শুনেছি। তপুই বলল, কেরানীর কাজ, থিয়েটারে রিট্র্যাকটার ধরে রাখা।

হুঁ! দীপক হাসল। আর একা খাওয়া। হ্যাউস ম্যান; রেজিস্ট্রার কনসালট্যান্ট আর সিস্টারদের কাছে ধমক খেতে হবে।

আবার একটু চুপচাপ।

তোর মা বলছিল, তুই ক-দিন পরেই চলে যাবি! এখনো তো কলেজ খুলতে দেরি আছে।

হুঁ! তপু বলল, অ্যানাটমী আর কেমিস্ট্রি একটু ভাল করে পড়ে রাখব। তাছাড়া—তপু আরো অজুহাত দিতে গিয়েও মাঝপথে থেমে বলল, সুজানের চাকরিতে জয়েন করতেই হবে পরের সপ্তাহে। আমি এক সপ্তাহ গ্যারাজে কাজ করব। ঠিক করে এসেছি।

ও!

খাবার কিন্তু তৈরি। সুজান এসে বলল। মিসেস বোসকে ডেকে আনব?

তপু বলল, আমি ডেকে আনছি।

তপু লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে মা মা বলে ডাকতে লাগল। টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখল, মলি শুয়ে আছে। তপু মার পাশে বসে ডাকল, মাগো! উঠবে না।

উঠছি। তুই যা।

তপু মার হাত ধরে বলল, এস তোমাকে উঠিয়ে দিচ্ছি।

মলি নিচে নেমে এল। দীপক মলিকে দেখে বলল, কি হয়েছে?

কি আবার হবে? একটু মাথা ধরেছে।

প্যানাডল খাবে?

না, চলে যাবে। তপু আমার লাগারটা নিয়ে আয় তো।

ওরা তিনজনে খুব গল্প করতে লাগল। মলি অল্প খেয়ে উপরে চলে গেল। সুজানই বলল, আমরা সব বাসন মেজে তুলে রাখব। তুমি বিশ্রাম কর গিয়ে।

সুজান দীপককে কিছু করতে দিল না। বলল, আজকে তোমাদের ছুটি। তোমরা গল্প কর গিয়ে, আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।

দীপক বসার ঘরে এসে বলল, সুজান একা একা করবে!

ও সাহায্য চাইলে ঠিক ডাকবে। তুমি ভেব না।

দীপক ভাবল টি. ভি. চালাবে কি না। ভাবল, না। এই গল্প করার সুযোগ ছেড়ে দেব না।

বাবা, তুমি একটু রোগা হয়ে গেছ মনে হচ্ছে।

ডাক্তারি মতে চল্লিশের পর রোগা থাকাই তো ভাল। দীপক ওর বুকের ব্যথার কথা বলবে বলবে করেও বলতে পারল না। ডাক্তাররা ওকে বলেছে এ ব্যথা ফাংশন্যাল, কোনো শারীরিক অসুখ নেই। তবু ডাক্তাররাও তো ভুল করে!

তুমি তনির জন্যে খুব ভাব, বুঝি?

দীপক যেন ধরা পড়ে গেছে, ভেবে হালকা করে হেসে বলল, একটু ভাবনা হয় বৈকি, মেয়ে তো শত হলেও।

তনি ভাল আছে বাবা। ও আমাকে খুব দার্শনিক চিঠি দেয়। উপদেশ দেয়।

দীপক একটু আহত হল, ভাইকে লেখে মনের কথা আর বাবা মাকে লেখে প্যারিসের কথা, কেমন আছ, ভাল আছি ইত্যাদি। এত কাছের ছিল তনি, এমন জোর করে সরে গেল কেন?

ও ব্ল্যাক কনশাসনেস নিয়ে খুব ভাবতে শুরু করেছে।

ও! দীপক ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এসে বলল, কি যেন ডেমনস্ট্রেশনে গিয়েছিল। বিপদে না পড়ে! সাবধান করে চিঠি দিয়েছি। আর মেয়ে সে কথা নিয়ে উচ্চবাচ্য করে নি।

কি দর্শনের কথা লেখে ?

প্রথম দিকে সিম্যন দি ব্যোভা নিয়ে ক্ষেপে উঠেছিল। এখন—

সিম্যন দি ব্যোভা কে ?

লেখিকা। সাত্রের বহু দিনের বান্ধবী ছিল।

ও হ্যাঁ, কাগজে তো পড়েছি। দীপক একটু পরে বলল, তা ও ব্লাক কনশাসনেস নিয়ে হঠাৎ ক্ষেপে উঠল কেন ?

হঠাৎ নয়। স্কুলে তো ও লিডার ছিল। কালোদের নিয়ে কিছু কেউ বললে রক্ষা আছে! ডিক তো ওর ডান হাত ছিল। ও, ভাল কথা মনে পড়েছে, ডিক-এর সঙ্গে একবার যোগাযোগ করতে হবে। ও শুনলাম সাস্‌ল নিয়ে খুব লড়ছে।

সত্যি ভাবতে খারাপ লাগে, শুধু গায়ের রঙ কালো বলে পুলিশরা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের ধরে তুলে নিয়ে যায়, হ্যারাস করে। কতটা সত্যি কিনা কে জানে !

অনেকটাই সত্যি বাবা। পুলিশরাও তো সাধারণ মানুষ। ওদের প্রেজুডিস যাবে কোথায় ? ইস্ট এণ্ড, সাউথ হল, ব্রিস্টলে কি হচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ। যত দেশের অবস্থা খারাপ হবে, ততই জাতিগত টেনশন বাড়বে।

ম্যানচেস্টারে তোর কোনো অসুবিধা হয় না তো ? দীপক চিন্তিত ভাবে বলল।

না না। ইউনির্ভাসিটিতে কালার প্রেজুডিস বড় একটা বোঝা যায় না। তবে ম্যানচেস্টারের একেকটা পকেটে কালো ভর্তি, সেখানে টেনশন তো আছেই।

সাবধানে থাকিস যেন।

তপু শুনতে পেল না।

আমার দু মাস প্লেসমেণ্ট খুঁজে নিতে হবে। ভাবছি কলকাতার স্টুডেণ্ট হেলথ হোমে চেষ্টা করব।

দীপক উঠে বসল।

সত্যি? আমি ভীষণ খুশি হব তুই যদি কলকাতায় প্লেসমেণ্টে যাস বা পাস।

তুমি চাও আমি দেশে ফিরে যাই? তপু কৌতূহল ভরে জানতে চাইল।

দীপক তপুকে ভাল করে দেখে সস্নেহে বলল, তোমার যেখানে মন চায় সেখানেই যাবে। দেশে তো আমি রোজগার করে টিঁকতে পারলাম না। কি করে বলি, তুমি যাও।

আমার ইংলণ্ডে থাকার ইচ্ছা নেই। কোথায় যে মন যেতে চায় এখনো জানি না। অবশ্য, এখনো অনেক সময় আছে মন ঠিক করার।

সুজান কফি নিয়ে এসে বসল।

তপু বলল, বাবা একটু ব্র্যাণ্ডি খাবে? ডিউটি ফ্রি, নিয়ে এসেছিলাম।

দাও। তোমরাও নাও না!

তপু ব্রাণ্ডির তিনটে গ্লাস নিয়ে এল।

ওরা ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করল আবার।

সুজানের মতো হলে বেশ হত। ও জানে ও দেশে ফিরে যাবে। মাঠের খেলা শেষ করে।

মাঠ তো বিরাট পৃথিবী। আজকাল প্ল্যানেটও। দেশ এতটুকু, সুজান একটু হেসে বলল, খেলা শেষ হলে ঘরে ফেরার সময় হবে। আমার এতটুকু দ্বীপে। সুজান তপুর দিকে না তাকিয়ে বলল।

তোমার দেশের জন্যে মন কেমন করে? সুজান জানতে চাইল।

এক-এক সময় ভীষণ করে। জীবনটা অর্থহীন মনে হয়। মনে হয় মাঠের খেলা বুঝি আর কোনোদিনও শেষ হবে না। দীপক নিশ্বাস ফেলে বলল।

তপু যেন দীপককে নতুন করে দেখল। সে মনে মনে ভাবল

দেশের শিকড় যে বাবার এত গভীরে সে তো কোনোদিনও টের পায় নি।

দেশে কি রিটায়ার করে ফিরে যাবে? সুজানই বলল।

তাই তো ভাবতাম। দীপক কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, তপু-তনি বড় হয়েছে, ওরা কোথায় শিকড় গাড়বে, কোথায় আমরা থাকব, কিছু আর ভেবে পাই না।

তোমার এ দেশে থাকতে খারাপ লাগে? খুব খারাপ লাগে?

অভ্যাস হয়ে গেছে। খারাপ লাগাও তো অভ্যাস হয়ে যায়। আমরা এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। ওরা তো আমাদের চায় না। আমরা থাকি আমাদের ফিরে যাবার উপায় নেই বলে। দীপক ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে শেষ চুমুক দিল।

না না, আর দিও না তপু।

তপু অল্প একটু কনিয়াক ঢেলে বলল, নাও না, কালকে তো শনিবার।

কি মিন্ কর দেশের? সুজান জানতে চাইল।

পুরো দেশটাকে! মাটি, আকাশ, মানুষ।

না না, সে তো অনেকটা অ্যাবস্ট্রাক্ট বেদনা। একচুয়েলি কি মিন্ কর?

দীপক ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল। আরেক চুমুক কনিয়াক নিল মুখে।

এখানে অফিসিয়ালী আমি একটা নম্বর। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটি তখন সাধারণ লোকের কাছে দেশে না খেতে পাওয়া একটা 'পাকি'। ক্লিনিকে আমি কেবল ডাক্তার, হাসপাতালে দ্বিতীয় শ্রেণী নাগরিক ডাক্তার। এ দেশে আমার সম্মান নেই, আমার স্টেটাস নেই।

তপু বাবাকে এ ভাবে এত কথা বলতে কোনোদিন শোনে নি।

কিন্তু বাবা, তপু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলে উঠল, বাবা তুমি

নিজে জান তুমি সম্মানী মানুষ, তুমি ভাল ডাক্তার, রাস্তার লোক কি ভাবল না ভাবল কি এসে যায় তাতে তোমার ?

দীপক সহসা উত্তর দিল না। সুজান দিল।

টোপু, আমরা তো সমাজে বাস করি। আমি নিজের সম্বন্ধে কি ভাবছি, ভুলই হোক বা ঠিকই হোক, আমি তো চাইব আমার আশেপাশের মানুষ তা কনফার্ম করুক। আমি তো রেকগ্নিশন চাইব। আমি নিজেকে ভালবাসি আমাকে অন্যলোকে ভালবাসে বলে তো!

অন্যলোকে ভাল না বললে, তপু ওর লম্বা পা গুটিয়ে বসে বলল, তুমি নিজেকে ভালবাসবে না ? তোমার যুক্তি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তপু এ দেশে পড়াশুনো করে ইংরেজদের স্বভাব পেয়েছে, সে উত্তেজিত হলেও গলার ভল্যুম নামিয়ে রেখে কথা বলতে পারে।

সুজান বলল ওর দুই ভুরু একজোট করে, আমার যখন মেয়ে হবে (সুজান ধরেই নিয়েছে ওর পেটে প্রথম মেয়ে হবে)। আমি আর আমার স্বামী যদি ওকে না ভালবাসি, আমার মেয়ে কি বিশ্বাস নিয়ে বড় হবে যে ও ভালবাসার যোগ্য বা অন্যদের ভালবাসা ওর প্রাপ্য!

আঃ, তুমি ফ্রয়েড আনছ ? তপু হাঁফ ছেড়ে বলল।

না। বোল বি আর রাটারকে আনছি। কমনসেন্স আনছি।

দীপক ওদের তর্ক শুনতে লাগল। সে না-ভালবাসা শিশু দেখে অভ্যস্ত।

কথা নদীর মতো, স্রোত আছে, চোরা স্রোত আছে, গতি পালটানো আছে, ঢেউ আছে—ভাব-ভাবনাকে দুই কূলের মধ্যে ধরে রাখতে চায় কথার নদী।

আমরা তো বড়দের কথা বলছিলাম। শিশুদের কথা না হয় মেনে নিলাম।

বড়রাও তো এককালে শিশু ছিল। সুজান জবাবে বলল।

আমিও একদিন শিশু ছিলাম। দীপক ভাবতে লাগল। আমার মা-বাবা কি আমাকে ভালবাসত, নিশ্চয় ভালবাসত। দীপক জোর দিয়ে নিজেকে বলল, তবে কেন সেই ভালবাসার তাপ আমি অনুভব করি না! অনুভব করার জন্যেই কি বারবার ছুটে যাই দেশে! মাতৃভূমি দেশ!

তোমার বাবা-মা বৃটিশ কলোনীর প্রডাক্ট। ভুলে যেও না।

হ্যাঁ, ইংরেজদের মতো মাস্টার জাত হয় না। তপু একটু বিদ্রূপে বলল, ঠাকুমা এখনো রাণী ভিক্টোরিয়ার কথা বলে। ইংরেজ আমলে নাকি বিচার ছিল, আলু পটল, চাল ডালের দাম কত সস্তা ছিল। আর এখন—

তপু হাসতে লাগল।

দীপকও হেসে বলল, হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকে ইংরেজদের আমরা ভয় আর শ্রদ্ধা করতে শিখে এসেছি। দুশো বছরের দাসত্ব কি কেবল স্বদেশী আন্দোলনে যায়?

আর স্বাধীনতা! কার স্বাধীনতা ভারতবর্ষে? তপু যোগ করে দিল।

সুজান হেসে বলল, তোমাকে রাশিয়াতে পাঠিয়ে দেব, তখন দেখবে।

আমার রাশিয়া বা চায়নায় বাস করার বিন্দুমাত্র শখ নেই। দেখবার শখ আছে অবশ্য।

আমি তো চায়নাতে যাব। চলে এস আমার সঙ্গে।

আরো কয় বছর অপেক্ষা করতে হবে তোমার তাহলে। তপু সুজানের দিকে তাকিয়ে বলল।

দীপক ঘড়ি দেখে বলল, বাঃ সাড়ে বারোটা বেজে গেছে! আমি শুতে যাচ্ছি। তোমরা গল্প কর।

আমি একটু হেঁটে আসি। তোমরা শুতে যাও। সুজান বলল

উঠতে উঠতে।

এত রাত্তিরে একা একা হাঁটতে যাবে কি? লণ্ডন আর সেই লণ্ডন নেই। তপু যাক তোমার সঙ্গে।

গুড নাইট। সুজান, তপু!

তপু পকেট থেকে চাবি বার করে বলল, বেশি দূরে যেও না কিন্তু। তপু জানে সুজানের রাত্তিরে একা একা হাঁটার অভ্যাস আছে। সঙ্গে যেতে চাইলে 'না' শুনতে হবে।

তপু সুজানের ভুরুর মাঝে চুমু খেয়ে বলল, গুডনাইট সুজান।

গুডনাইট টোপু। সুখী স্বপ্ন।

তপু পিছনের প্যাটিও ডোর খুলে বাগানে একটু দাঁড়াল, আকাশে একটাও তারা নেই। চাঁদ কোন দেশে চলে গেছে কে জানে। তপু গোলাপে নাক ডুবিয়ে মুখ সরিয়ে নিল।

দীপক শোবার ঘরে গিয়ে দেখল মলি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মলি ভ্যালিয়াম খেয়ে ঘুমুচ্ছে। এ দেশের সব অশান্তির ওষুধ— ভ্যালিয়াম! পর্দা টানতেও ভুলে গেছে। দীপক আলোয় মলিকে একটু দেখার চেষ্টা করল। কি অশান্তি মলির হল হঠাৎ। এত আনন্দে, ফুর্তিতে বাড়ি ফিরে এল তপুর সঙ্গে, তারপর? বেশ বুদ্ধিমতী সুন্দর মেয়েটা—সুজান।

দীপক কনিয়াকের নেশায় বালিশে মাথা দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ল।

দীপক বাজারে যাবার আগে থেকেই গাঁইগুঁই শুরু করেছিল। সুজান আঁচ করে বলল, তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমি ড্রাইভ করতে পারি। মিসেস বোস যদি ভরসা পায়।

তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পার মা ওর সঙ্গে।

দীপক হাঁফ ছেড়ে গার্ডিয়ান-এর পাতা খুলে বসল। তপু বলল

আমি ঘরবাড়ি পরিষ্কার করছি। তোমরা ঘুরে এস।

সুজানের সঙ্গে মলির ভাব হয়ে গেল। ওরা বাজার করে রেস্টুরেন্টে ঢুকল। দুপুরের খাওয়া সেরে নেবে। থাকুক বাবা ছেলে একসঙ্গে।

সুজান মলিকে জন-এর কথা বলেছে। ওর ফিঁয়াসে, দেশে ফিরে বিয়ে করবে। মলি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না। ফিঁয়াসেকে একা রেখে বিদেশ ভ্রমণই বা কেন, তপুর সঙ্গে খেলা-খেলা ভালবাসাই বা তবে কেন! না কি, ঘরে বসার আগে পথে পথে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বেড়াচ্ছে। সুভিন্যার নিয়ে ঘর সাজিয়ে রাখবে বলে। এ কেমনধারা মেয়ে। চব্বিশ বছর বয়স। তপুর চেয়ে তিন বছরের বড়। মেয়েদের মনের বয়স তো অনেক বেশি। তপুর মতো আনকোরা সবুজ মাথায় ও কি মন্ত্র ঢোকাচ্ছে কে জানে! তপু কি জানে জন-এর কথা? হ্যাঁ জানে। মলি ওর তথাকথিত আধুনিক মন নিয়ে সুজানকে বোঝার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। ওয়েস্টার্ন মেয়েদের রকম-সকমই আলাদা। দীপককে এ-সব বলে লাভ নেই। ও তো অল্পবয়সী মেয়ে দেখলেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায়। তবে স্বীকার করতেই হবে, সুজানের দিকে তাকিয়ে মলি ভাবল, মেয়েটার চালচলন ভাল, ভদ্র।

বাবা কি করে?

ফার্ম আছে। আগে ভেড়ার চাষ করত, ই ই সি হবার পর নিউজিল্যাণ্ডে ভেড়ার বাজার পড়ে গেছে। গরু চাষ করে।

কত বিঘা জমি? মলি ওর শাশুড়ীর মতোই প্রশ্ন করতে বসল।

সুজান তার হিসেব জানে না। দুটো গ্রাম নিয়ে ক্যাটল ফার্ম। হ্যাঁ, ওর পূর্ব পুরুষরা স্কটল্যাণ্ডের বাসিন্দা ছিল। না, যতদূর জানে স্কটল্যাণ্ডে ওদের পরিচিত কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। তবু সে স্কটল্যাণ্ড ঘুরে এসেছে। খুব ভাল লেগেছে সুজানের। আত্মীয়ের মতো।

দেশের জন্যে মন কেমন করে না ?

এখনো করছে না। যেদিন করবে, পরের দিন প্লেন বুক করে রওনা দেব।

মা-বাবা কিছু বলে নি, চিন্তা করে নি চলে আসছ বলে ?

চিন্তা করতে হয়তো পারে, মুখে উৎসাহ দিয়েছে। সবাই তো যায়।

কেমন বাবা-মা, মলি মনে মনে বলল। সে তো রোজ তপু-তনির জন্যে চিন্তা করে, ঠিক মতো খাচ্ছে কিনা, অসুখ করল কি না, কত কি ! সুজান মলির মনের কথা আঁচ করে বলল, মা-বাবা জানে আমি নিজেকে সামলে চলতে পারব।

তুমি তো পারলে ! অন্যরা যদি সামলাতে না পারে !

নিজেকে সামলানো মানেই তো অন্যদের সামলে চলা। জুডো জানি আমি। সুজান হেসে বলল।

মলি ওর রোগা ছোট্ট দেহ দেখে মনে মনে ভাবল, মনে হয় তো পাখার হাওয়ায় উলটে পড়বে।

পথে কতরকমের বিপদ।

ঘরে বসেও তো দুর্ঘটনা ঘটে। তাই না ?

ঘরে দুর্ঘটনা ঘটে বৈকি ! কিন্তু পথে বিপদ ঘটে। মলি ছাড়ে নি।

বাঃ, এ বয়সে যদি বিপদ না ডাকি, কবে জানব বিপদ কাকে বলে ?

মলি কিছুক্ষণ পরে বলল, তোমার ক্লান্ত লাগে না ?

ভীষণ। একেক সময়। ভারতবর্ষে ট্রেনে ট্রেনেই রাত কেটেছে পয়সা বাঁচাবার জন্যে। ঘোরার ক্লান্তি, তার উপর আমাশা। ট্রেনের পায়খানা দেখে আরো আমাশা বেড়ে গেল। খুব কষ্ট হয়েছে। মানুষের ভিড়, ঔৎসুক্য। খুব জ্বালাতন গেছে।

আর কিছু চাই ? মেয়েটি প্লেট সরাতে সরাতে জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ, আইসক্রিম। আর কফি। প্লিজ।

ইংরেজরা হাসতে ভুলে গেছে। সুজান ভুরু কুঁচকে বলল, মেয়েটাকে দেখলে। যেন সার্ভ করছে না, দয়া করছে আমাদের।

মলি অভ্যস্ত। ও গায়ে মাখল না। সে চোখ বড় বড় করে বলল, তুমি একা একা আমাদের দেশ ঘুরেছ ?

না, সঙ্গে পলা ছিল।

পলা এখন কোথায় ?

পলা ব্যাসিলডনে কাজ করছে।

কি করছে ?

সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালে কাজ করছে।

কি কাজ ?

অক্যুপেশনল থেরাপিস্ট। আমরা দু জনেই মানসিক থেরাপীতে স্পেশ্যালাইজ করেছি।

ওঃ তাই নাকি। মলি এতক্ষণ পরে সোৎসাহে বলল, আমিও তো অক্যুপেশনল থেরাপিস্ট। কই তপু আমাকে বলে নি তো!

সুজান মনে মনে বলল, আমাকে বলেছে টোপু। আমি অবশ্য জেনারেল হাসপাতালের দিকে আছি।

মলি এবার গল্প জুড়ে দিল। নিউজিল্যাণ্ড আর বৃটেনের ট্রেনিংয়ের পার্থক্য, হাসপাতালের অবস্থা, ডাক্তাররা জানে বা বোঝে কি না ওরা কি করে! না কি নিউজিল্যাণ্ডেও ডাক্তাররাও ভাবে ওরা উল বোনা, আর ট্রে বানাতে শেখায়! এতক্ষণ পরে ওরা যেন এক ভাষা খুঁজে পেল।

ওদের পাশের টেবিলের বাচ্চা ছেলেটি, বছর চারেক হবে, নিজে আইসক্রিম খেতে গিয়ে বাটি শুদ্ধ মাটিতে ফেলে দিয়েছে, কান্না জুড়ে দিয়েছে, আইসক্রিমের জন্যে।

বড় হয়েছ খেতে পার না ঠিক করে ? মা নিচু গলায় বকছে। অল্পবয়সী মা, কঠিন ক্লান্ত মুখের রেখা, এককালে চুল হয়তো ব্লণ্ড

করেছিল, খসখসে চুলের গোড়ায় বাদামী রঙ।

গোমড়া মুখো মেয়েটা এসে একটা কাপড় দিয়ে আইসক্রিম পুঁছে নিয়ে গেল।

আমার আইসক্রিম চাই।

চুপ কর। জন্মদিনে কাঁদে না।

মলির খুব ইচ্ছা করতে লাগল ওকে একটা আইসক্রিমের অর্ডার দেয়, মায়ের রুক্ষ মুখ দেখে ভরসা পেল না।

চল। ওঠা যাক। মলি দাম চুকিয়ে উঠে পড়ল।

আরেকটা আইসক্রিম কিনে দিলেই পারত ওকে, মলি বিড় বিড় করে বলল।

হয়তো পয়সা নেই। 'ডোল্'-এ সংসার চালায়।

হ্যাঁ, সত্যিই সংসার চালানো এখন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওরা বাড়ির সামনে আসতে, মলি বলল, তুমি দীপককে ডেকে আন, আমি পার্ক করছি।

তুমি পারবে তো ?

হ্যাঁ পারব। মলি ড্রাইভারের সিটে বসে গাড়ি পার্ক করা দুই গাড়ির মধ্যে এক ফাঁকে ঢোকাতে গিয়ে পেভমেণ্টে উঠে গেল গাড়ি। যতবারই সোজা করে পার্ক করতে চেষ্টা করে, গাড়ির পিছনটা অবাধ্য ঘোড়ার মতো পিছনে পা তুলে দেয়। মলি ঘেমে উঠল। ওরা আসছে না কেন ? ও দেখল রাস্তা দিয়ে এক ইংরেজ যাচ্ছে ছোট ছেলে সঙ্গে করে। ও মুখ বাড়িয়ে বলল, এক্সকিউজ মি, আমাকে একটু হেলপ্ করবে গাড়িটা পার্ক করতে ?

লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে রূঢ় ভাবে বলল, পার্ক করতে জান না গাড়ি চালাচ্ছ কেন ?

মলি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, চলে যাও। গাধা।

লোকটা দুমদাম করে জানালার সামনে এসে বলল, কি বললে ? আরেকবার বল।

ওঃ চ'লে যাও! চ'লে যাও যেখানে যাচ্ছ।

তুমি চ'লে যাও যে জঙ্গল থেকে এসেছ। লোকটা হুমকি মেরে বলল।

মলিদের প্রতিবেশি জামেইকান ভদ্রলোক বাড়ি ফিরছিল, সে দাঁড়িয়ে বলল, কি ব্যাপার? সাহায্য করতে পারি?

রূঢ় লোকটা তখনো যাচ্ছে না। মলি ওকে উপেক্ষা করে বলল, আমাকে একটু পার্ক করতে সাহায্য কর না।

গাড়ি চালাতে জানে না, গাড়ি চালাচ্ছে। লোকটা আবার বলল। ও যেন ঝগড়া বাধাবার একটা সুযোগ খুঁজছিল। ছেলেকে দেখাবে কালোদের কি করে শিক্ষা দিতে হয়! দীপক ততক্ষণে এসে গেছে। জামেইকান ভদ্রলোকও ওই লোকটাকে উপেক্ষা করে নির্দেশ দিচ্ছে মলিকে পার্ক করার।

মলি পার্ক করে, জামেইকানকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, একটা রেস-রায়ট লাগছিল আর কি!

দীপক বাজারের থলি হাতে নিয়ে শুনল মলির পার্কিংয়ের গল্প।

অভদ্র, অশিক্ষিত, ছোটলোক। মলি রাগে ফুঁসছিল।

দীপক শুনে বলল, দেখ বোধহয় 'থ্যাচারড' হয়েছে। তাই কালো লোকদের সৌভাগ্য সহ্য হচ্ছে না।

থ্যাচারড? মানে কি?

ম্যাগি থ্যাচারের কোপের বলিতে একটার পর একটা ফ্যাক্টরি, ব্যবসা বন্ধ হচ্ছে। লোকের চাকরি যাচ্ছে। সেই থ্যাচার থেকে থ্যাচারড।

সুজান বলল, জামেইকান ভদ্রলোক ওকে একটা চড় মারল না কেন?

হাত নোংরা করে লাভ কি? ওদের উপেক্ষা করাই ভাল। লোকটার অভদ্রতা তো গেল, তুমি কোন ভরসায় ড্রাইভিং পাস না করে একা গাড়ি পার্ক করতে যাচ্ছিলে?

বাঃ গাড়ি তো আমি পার্ক করতে শিখেছি। মলি একটু ভীতু মুখে লজ্জা পেয়ে বলল।

তপু কোথায়? মলি কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল।

তপু ডিক-এর সঙ্গে পাবে গেছে।

তুমি খেয়েছ?

হ্যাঁ। ঐ তপু এল বোধহয়।

তপু ডিককে নিয়ে এসেছে। আলাপ করিয়ে দিল সুজানের সঙ্গে।

হাউ ইজ উ মিস? ডিক হাত বাড়িয়ে বলল। ডিক ইচ্ছে করে ওয়ার্কিং ক্লাস ইংরেজদের মতো কথা বলে। খোলা গায়ে লাল হলুদ পুতির মালা। এক কানে দুল। মাথায় আফ্রিকান স্টাইলে অসংখ্য গুঁড়ি গুঁড়ি বিনুনী।

বসবে না? সুজান বলল।

না। আজকে নয়। ডিক নটিং হিল গেটের কার্নিভ্যাল-এর এক অরগানাইজার। ওকে এখন মিটিংয়ে ছুটতে হবে।

ডিক তপুর রোগা পিঠে পুরু হাতে এক থাপ্পড় মেরে বলল, লুক মি অন, ম্যান!

সি উ! তপু ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

তনির যা সব বন্ধু না! মলি টিপ্পনী কাটল।

ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে। অক্সফোর্ডে চান্স পেয়েছে। তপু বলল ফিরে এসে।

তা ওরকম চেহারা আচার ব্যবহার কেন?

রুটস দেখ নি? ও রুটস খুঁজছে। সন্ধ্যাবেলা ওদের ক্লাবে যাব সুজানকে নিয়ে। তোমরা আসবে নাকি? তপু বলল।

না, আমরা ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে কি করব, তোরা যা।

দীপক কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। ওর একটু ইচ্ছে ছিল, দেখে আসে তনিদের বন্ধুরা কেমন! ব্রাউন নয়, হলুদ নয়,

কালোদের চিন্তাধারা কেমন, কি ভাবছে ওরা ?

যা শুনলাম না, তপু বলল, ব্রিকস্টন আগুন হয়ে আছে। চাকরি নেই, পুলিশের ঝামেলা সাস্‌ল-তে ছেলেদের তুলে নিচ্ছে, ছেলে ছোকরারা চুরি ছিনতাই করছে। ডিক বেশ চিন্তিত।

ব্রিকস্টনে তো বেশির ভাগ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের ভিড়, তাই না ? সুজান জানতে চাইল।

হ্যাঁ, ওরা ব্রিকস্টন দখল করে বসেছে, যেমন সাউথ হল দখল করেছে ভারতীয়রা।

বিচিত্র লণ্ডন ! মাল্টিরেশিয়াল সোসাইটি !

আমরা যদি ইংরেজদের সঙ্গে ইন্টিগ্রেট না করি গোলমাল তো বাধবেই। মলি বলল।

সুজান আপত্তি তুলল, ইন্টিগ্রেট করতে যাবে কেন ? ইংরেজদের মতো হয়ে গিয়ে তুমি তোমার সামাজিক মূল্য, চিন্তাধারা ছাড়বে কেন ?

ওদের সমাজে তো আমরা বাস করছি। দীপক আস্তে আস্তে বলল।

বাস করছি বলে কি ওদের মতো হয়ে যেতে হবে আমাকে ? তপু এবার বলল জোর দিয়ে।

ওদের মতো না হলেও, ওদের সঙ্গে মানিয়ে তো চলতে হবে। দীপক উত্তর দিল।

ঐ রাস্তার ছোটলোকটার মতো আমি ইংরেজ হতে চাই না। মলি বলল ভেংচিয়ে ; জঙ্গলে ফিরে যাও না কেন ? লক্ষীছাড়া !

তপুকে আবার বলতে হল ঘটনাটা। তপু হো হো করে হেসে উঠল, ইস, ডিক যদি তখন থাকত, একটা মজা দেখতে ! হাই ম্যান, বলে ও বাঁদরের মতো ওর পিঠে গিয়ে উঠত জুডোর চাল চেলে। দেখাতো জঙ্গলে বাঁদররা কি করে ! আর কোনোদিন জঙ্গলে ফিরে যাও বলত না লোকটা।

পার্কিংয়ের বিস্বাদ ভুলে গিয়ে এবার হাঁফ ছেড়ে সবাই হাসল বিস্বাদ না ভুললে এ দেশে বাস করা যায় না।

পনেরো

ওরা সিটির ফেনচার্চ স্ট্রিট স্টেশন থেকে সাউথ এণ্ডের ট্রেন ধরে ব্যাসিলডনে নামল। একুশ বছর আগে জি. এল. সি (গ্রেটার লণ্ডন কাউন্সিল) ব্যসিলডন শহর গড়তে শুরু করেছিল এই ধারণা নিয়ে যারা লণ্ডনের স্লাম ভেঙে ব্যাসিলডনে থাকতে আসবে তারা কখনো আবার পচা লণ্ডনে কাজ করতে যেতে চাইবে না। টাউন প্ল্যানার সেই হিসেব ধরে রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত তোলে নি।

কিন্তু দেখা গেল ব্যাসিলডনের বাসিন্দারা পড়ি মরি করে বিষাক্ত বায়ু ভিড় ক্লান্ত লণ্ডনে ছুটছে চাকরি নিয়ে। তৈরি কর স্টেশন। তৈরি হল। কনট্রাকটারের আরকিটেকের আবার হিসেবে ভুল। প্ল্যাটফর্ম তো নয় যেন নিচু বেদী। রেলগাড়ি থামল। হয় লাফিয়ে ঝাঁপ দাও প্ল্যাটফর্মে, নয় সিঁড়ি লাগাও জাহাজের মতো নিচে নেমে আসার। ভাঙা হল বেদী, নতুন করে তৈরি হল উঁচু প্ল্যাটফর্ম। ব্যাসিলডনবাসীরা নিশ্বাস ফেলে লণ্ডন-মুখী ট্রেন ধরল। অফিস টাইমে লণ্ডনগামী ১২৭ আর এ-১২-র ডুয়েল ক্যারেজওয়ে গাড়িতে গাড়িতে পিঁপড়ের মতো পিল পিল করে, কচ্ছপের গতিতে গাড়ি চলে, থামে, থেমে থেমে চলে। তা যতই পেট্রোলের দাম বাড়ুক না কেন!

দুষ্টলোকে আরো বলে ইলেকট্রিসিটি কোম্পানি ব্যাসিলডন কর্পোরেশনকে ভুলিয়ে ভাঙিয়ে (ঘুষ দিয়ে? বৃটেনে ঘুষ শব্দটা সহজে উচ্চারণ করার সুযোগ হয় না।) কনট্রাক্ট নিয়েছে। গ্যাস হিটিং সস্তা থাকা সত্ত্বেও ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক ফ্লোর হিটিং। তুঁইফোড় বড়লোক ছাড়া কেউ ফ্লোর-হিটিং চালাতে সাহস করে না। মাসের শেষে বিল তো দিতে হবে! যে দেশে ন-মাস

শীতকাল।

ব্যাসিলডন ডিস্ট্রিক্টের পুরনো গ্রামের বাসিন্দারা চার্চে একজোট হলে এখনো আফশোস করে। ইস্ ইটের জঙ্গল তৈরি করেছে, রাস্তায় হুশ হুশ করে গাড়ি ছুটছে, হাঁটতে ভয় করে। কিন্তু বুড়ো বয়সে মরার ভয় বাড়ে। ওতে কান দিয়ে লাভ নেই। ব্যাসিলডন আরো বড় হচ্ছে, এমন কি থ্যাচারের আমলেও নতুন এস্টেট তৈরি হচ্ছে।

ব্যাসিলডনের কারিগর শ্রমিক শ্রেণীর আফিং হচ্ছে কনসিউমার সোসাইটি। এইচ. পি-তে হাত পা বাঁধা। নতুন বাড়িতে, নতুন ফ্ল্যাটে তো আর পুরনো জিনিস কিনে এনে তোলা যায় না। তাই টাউন-সেণ্টারের সারি সারি দোকান জিনিসের চাকচিক্যে জমজমাট।

তপু, সুজান সেই বেদীভাঙা ব্যাসিলডন প্ল্যাটফর্মে নামল। কড়া হাওয়া। লোকে বলে ব্যাসিলডনের হাওয়া সাইবেরিয়া থেকে আসে। সুজান হালকা কার্ডিগান গায়ে জড়িয়ে বলল, চল হেঁটে যাই।

কত দূর।

বেশি নয়। মিনিট পনেরো কুড়ি লাগবে হাঁটতে। ওরা ফোর্ড কোম্পানির বিরাট অফিসের পাশ কাটিয়ে সাবওয়ে ধরে নিচে নেমে গেল।

চিমনী দেখলেই বোঝা যাবে হাসপাতাল। এগারো বছর আগে হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই দেয়ালে দেয়ালে ফাটল ধরেছে। সুজান বলল, এস করিডর দিয়ে যাব। দেখাব একটা জিনিস।

করিডর চলছে তো চলছেই। সেই ম্যেটারনিটি ব্লক থেকে শুরু করে সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল পর্যন্ত করিডর। প্ল্যানাররা চায় নি মানুষ হাঁটতে হাঁটতে সবুজ লন দেখে, আকাশ দেখে, ঘষা কাচ

বসিয়ে দৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছে। সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালের কাছে এসে দেখা গেল দুই জায়গায় গাদা গাদা পেপার-টাওয়েল দেয়াল ঘেঁষে জমা করা আছে।

এই দেখ! সাইকিয়াট্রিক উইং তিন বছর আগে তৈরি হয়েছে, এখনো জল চুঁইয়ে পড়ে। পয়সা নেই দেয়াল ভেঙে নতুন করে গড়ার। কিন্তু ভাব তো প্রতিদিন গাদা গাদা পেপার-টাওয়েল বদলাতে কত খরচ পড়ে বছরে।

তুমি এত জানলে কি করে?

বা, আমি এখানে ক-সপ্তাহ কাজ করে গিয়েছি না!

ও। তপু একটু ভেবে বলল, তুমি এত তিক্ত কেন বৃটেন সম্বন্ধে!

নীল কোর্তা পরা পোর্টার খাবারের ট্রলি ফেরত নিয়ে যাচ্ছে করিডর দিয়ে। সুজান সরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘষা কাচের দেয়াল ঘেঁষে।

তিক্ত! আমাকে মনে হয় তিক্ত! হবে হয়তো। বাবা স্কটল্যাণ্ড, মা ইংলণ্ডের, দাদু-দিদিমা থেকে আরম্ভ করে মা-বাবা এমন স্বর্গপুরী আমাদের কাছে তৈরি করেছিল যে স্বপ্ন-ভাঙা বেদনায় হয়তো ছটফট করছি। বৃটেনের তো দোষ নয়, দোষ আমার আকাশে গড়া কেল্লার। ব্যাসিলডন হাসপাতাল হচ্ছে ইংরেজদের চরিত্র ভেঙে যাওয়ার সিম্বল।

চারজন নার্স দরজা ঠেলে ছুটতে শুরু করল।

এখানে কি নার্সরা রিসাসিটেড করে নাকি?

সুজান হেসে বলল, নিশ্চয় কোনো সাইকিয়াট্রিক রুগী জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে কিছু অপকাণ্ড করেছে, ধরে আনতে যাচ্ছে।

চল আমরা লেভেল 'বি'-তে যাব। ব্যাসিলনডন হাসপাতাল উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো জমির উপর তৈরি হয়েছে। সুতরাং লেভেল এ. বি. সি. করে উপরে উঠে গেছে বা নিচে নেমে গেছে যে যেভাবে

দেখতে চায়।

তুমি যে 'সিম্বল'-এর কথা বলছিলে না। ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটির আদি বিল্ডিং দেখেছ তো কী রকম সলিড। বিল্ডার, ইন্সপেক্টররা টাকা মেরে সরে পড়ে নি তখনকার দিনে।

তুমি নিউজিল্যাণ্ডে এসে দেখ, আমাদের দেশে সিমেণ্টের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে দেয় না।

এক্ষুণি রাজি আছি দেখতে যেতে।

সত্যি ?

সত্যি !

ও টোপু ! তোমাকে নিয়ে আমি কি করব বল তো ? জীবনে এই প্রথম প্রেমে পড়লে, ঠিকমতো বেছে প্রেমে পড়বে তো !

বেছে বেছেই তো তোমাকে পেলাম।

টোপু !!

সুজান !! তপু ওর গলা নকল করে বলল। দু জনেই হেসে ফেলল।

পলার অফিসে ওরা টোকা মেরে ঢুকল। একটা ছোট্ট অফিসে প্রায় সাতজন ছেলেমেয়ে গাদাগাদী করে গুলতানী মারছে। পলা সুজানকে দেখে লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরল।

সুজান ! হাউ গুড টু সি ইউ !

পলা ! সুজান ওকে গালে চুমু দিয়ে বলল।

পলা এক ঝলকে সবাইকে দেখিয়ে বলল, চল। এই গুচ্ছের আজেবাজেদের সঙ্গে আলাপ করে সময় নষ্ট করার দরকার নেই।

'আজেবাজেরা' প্রতিবাদ করে শাসিয়ে উঠল, সোমবারে কাজে এস তো, তখন দেখা যাবে।

পলা মিষ্টি হেসে বলল, আমার মাসল দেখেছ তো। চল করিন, তোমার ফ্ল্যাটে যাওয়া যাক।

পিটার, রবার্ট আপত্তি তুলে বলল, আমরা কি দোষ করলাম। ওরা তপুর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এই মেয়েছেলেদের সঙ্গে যাচ্ছ, ওরা তোমাকে আস্ত ডিনার করে খাবে দেখ, বলে দিলাম।

তপু উদার ভাবে বলল, আমি হারেম রাখতে অভ্যস্ত!

হারেম রাখা দেখাচ্ছি তোমাকে। পল ওর ছ ফুট গোল-গাপ্পা শরীর টান টান করে বলল।

ওরা বেরিয়ে আসতেই এক ফিটফাট গোলগাল সুন্দর মহিলা করিনকে থামিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, জান, আমার মনে হচ্ছে আজকেই ট্রিপলেট হবে! কি করব বল তো?

ভেব না। ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ড তো কাছেই, ওরা তোমার দেখা-শোনা করবে দরকার হলে।

উঃ বাঁচালে আমাকে। সাবধানে যেও, বাইরে কিন্তু সব রাশিয়ান স্পাইরা ছোরা শানিয়ে লুকিয়ে বসে আছে!

ভয় নেই, আমার বন্ধুরা আছে। গুডনাইট মিসেস ব্রিঙ্ক-ওয়ার্থ!

গুডনাইট।

ওরা বেরিয়ে এসে পলার গাড়িতে উঠল। সুজান বলল, মহিলার ধারণা ওর অ্যাস্ট্রনট স্বামী প্ল্যানেট থেকে নেমে এসে রাত্তিরে যৌনসঙ্গ দিয়ে যায়। নিজের স্বামীকে স্বামী বলে স্বীকার করবে না। স্টারিলাইজ হয়েছে, তবু ওর বদ্ধ ধারণা ওর পেটে তিনটে বাচ্চা সাঁতার কাটছে। সেই একই মিসেস ব্রিঙ্কওয়ার্থ!

দেখে কিন্তু একেবারেই মনে হয় না যে পাগল। তপু মন্তব্য করল।

তুমি আমি যে পাগল হতে পারি, করিন হেসে বলল, সে কি দেখে বোঝা যায়? নাকি তথাকথিত পাগলদের দেখলে পাগল বলে বোঝা যায়!

তপু ওর পাশে বসা করিনকে ভাল করে দেখল। করিন বেঁটে, পায়ে তিন ইঞ্চি হাই হিল জুতো, একটু গোলগাল, প্রায় ছত্রিশ ইঞ্চি বুক, গাঢ় বাদামী ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, সিঁড়ির মতো কাটা কপালে, গালে ঘিরে রয়েছে। ওর সবজে নীল চোখ অপূর্ব সুন্দর। চোখের পাতা ছায়া ফেলছে গালে। আমেরিকান অ্যাকসেণ্ট।

তুমিও কি ও টি ?

না, আর্ট থেরাপিস্ট। ওদের সঙ্গে দয়া করে মিশি।

হুঃ! হাঃ! পলা ড্রাইভ করতে করতে বলল।

আর্ট থেরাপিস্ট ? তপু একটু ভেবে নিয়ে বলল, কী ভাবে তুমি আর্টকে কাজে লাগাও ?

ফ্ল্যাটে গিয়ে আরাম করে বসি। তারপরে বলব।

এত গুরুতর কাজ কি দু মিনিটে বলা যায়! পলা টিপ্পনী কাটল।

হাইওয়ের মুখোমুখী তিনতলার ফ্ল্যাট। জানালায় দু প্রস্থ পুরু কাঁচ। ষাট-সত্তর মাইলে গাড়ি চলার শব্দ আর শীতের হাওয়া বন্ধ করে রাখবে ডবল গ্লেজিং।

সুন্দর করে সাজিয়েছে করিন ওর ঘর। কারুর ফেলে দেয়া টেবিল, পুরনো সোফা, জাঙ্কশপে কেনা সাদা কার্পেট। বিজি লিজি প্ল্যাণ্টে গোলাপী ফুল ফুটে আছে। পুরনো ওয়াইন বোতলে শুকিয়ে নেয়া লম্বা খামের পাতা আর শুকনো ডালপালা যেন উড়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। ছোট্ট টি. ভি. টেলিফোন। দেয়ালে পোস্টার।

বাঃ সুন্দর ফ্ল্যাট তোমার। কতদিন আছ তুমি ?

ছ মাস হল ফ্ল্যাট পেয়েছি।

আপাতত এখানেই থাকবে বুঝি ? তপু জানতে চাইল।

না, এবার ফিরে যাবার সময় হয়েছে মনে হচ্ছে। তোমরা গল্প

কর। আমি রান্না-বান্না চাপাব।

এতদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা হল, প্রাণের কথা হোক। আমি বরং লুইসার সঙ্গে দেখা করে আসি।

না, না। জ্যুয়িশ রান্না খেয়ে তারপরে যেখানে ইচ্ছা যাও। করিন বলল, এস তুমি স্যালাড বানাও, আমি রান্না চাপাই।

পাশাপাশি দুই ঘরে দু রকমের গল্প শুরু হল।

করিন ফ্রিজ থেকে স্যালাডের বাক্স বের করে দিল, বের করে দিল ছুরি আর বড় কাঁচের বাটি, কাঠের বোর্ড।

সব খুব ছোট ছোট করে কাটবে। করিন নির্দেশ দিল।

ও ওয়াইন বোতল বার করে কর্ক-স্ক্রু দিয়ে কর্ক খুলে চারটে গেলাসে ঢালল।

তুমি এটা নাও। করিন দুটো গেলাস বসার ঘরে নিয়ে বলল, এক ঘণ্টা সময় দিচ্ছি প্রাণের কথা শেষ করার। আর ওয়াইন দরকার হলে বোলো।

থ্যাঙ্ক।

সুজান হেসে বলল, পলা সবে খোঁজার প্রথম পাতায় এসেছে।

সব পাতা প্রায় আমাদের এক। করিন হেসে বলল, নিকি একটু পরেই আসবে। ও একই ক্লাবের মেম্বার।

করিন বসার ঘরের দরজা বন্ধ করে রান্নাঘরে ঢুকল।

কি ক্লাব তোমাদের? তপু জানতে চাইল।

করিন হো হো করে হেসে উঠল। সঙ্গী খোঁজার ক্লাব। আমরা তিনজনেই জীবন-সঙ্গী খুঁজছি।

তপু করিনকে দেখে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, তোমাদের তো, বিশেষ করে তোমার সঙ্গীর অভাব হবার কথা নয়।

থ্যাঙ্কু। করিন মুচকি হেসে বলল, সঙ্গীর অভাব তো বলছি না। জীবন-সঙ্গীর অভাবের কথা বলছি।

আচ্ছা!

কি বললে?

বললাম, আই সি! কিন্তু ব্যাসিলডন কি তোমাদের জীবন-সঙ্গী পাবে, তপু গাজর শুদ্ধ হাত ছড়িয়ে বলল, যাও লণ্ডনে, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার এডিনবরাতে।

বার্মিংহামে তো বারমেডের কাজ করতাম।

ছেড়ে এলে কেন?

হোম অফিস নোটিশ দিল আমি যদি নিজের লাইনে কাজ না করি আমেরিকায় ফিরে যেতে হবে। ব্যাসিলডনে চাকরি ছিল। চলে এলাম। ভেবেছিলাম জীবন-সঙ্গী বুঝি জুটে গেছে—

তারপর?

ভদ্রলোক ফিরে গেল ওর পুরনো সংসারে। আমি একা হয়ে গেলাম। করিন সহজেই কাঁদে। ওর চোখে জল ভরে এল। তপু দেখতে পেল না।

যেমন সুজান ফিরে যাবে জন-এর কাছে।

কিন্তু সুজান তো তোমাকে বলেছিল যে জন অপেক্ষা করছে।

জানলে কি ব্যথা কমে? তোমার বন্ধু বলে নি যে, সে বিবাহিত?

বলেছিল। ও স্ত্রীকে ছেড়ে চলে আসার পর আমার সঙ্গে আলাপ। আমরা প্ল্যান করেছিলাম। ওর ডিভোর্সের পর বিয়ে করব। প্ল্যান। বৌ ছেলেমেয়েই জিতল শেষ পর্যন্ত।

এখনো তোমার মন কেমন করে বুঝি?

করিন হাতের পিঠে চোখের জল মুছে বলল, অপারেশনের পর তীব্র ব্যথাটা চলে গিয়েছে। এখন কেবলই মনে হয় সময় বুঝি পালিয়ে যাচ্ছে।

কিসের সময়?

তুমি পুরুষ মানুষ, বুঝবে না।

চেষ্টা করে দেখ।

এখন ইচ্ছে করে ঘর গুছিয়ে বসি, স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে। আমার চাকরি ভাল লাগে না। বয়স তো হচ্ছে।

কত বয়স ? সরি, মেয়েদের তো বয়েস জানতে নেই।

পঁচিশ। করিন হেসে বলল, আমি কি ইংরেজ ? আমাকে যা খুশি জিগ্যেস করতে পার। উত্তর দেয়া বা না দেয়া আমার উপর নির্ভর করছে।

তপু হেসে ফেলল ওর বলার ধরন দেখে।

তোমরা আমেরিকানরা অনেক খোলামেলা। ইংরেজেরা বড় জড়-সড় হয়। আর জান, তপু একটু ভেবে বলল, আমি নিজে এবং বন্ধুদের দেখে বলতে পারি কোনো মেয়ে যদি আমাকে ধরার চেষ্টা করে আমি পরের বাস ধরে পালাব।

সে জন্যেই কি সুজানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ ?

তা হবে। তপু গম্ভীর ভাবে বলে করিনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল, আগে কিন্তু ভেবে দেখি নি।

তোমার বয়স কত ?

একুশ।

ও, তুমি একটা বাচ্চা ছেলে।

ফিজিওলজি কিন্তু তোমার কথা মেনে নেবে না।

ও, ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি মেডিক্যাল স্টুডেণ্ট।

কই, তুমি তোমার আর্ট-থেরাপীর কথা তো আমাকে বললে না।

কি বলব ? মানুষের মনের কথা ছবি এঁকে, বা কোলাজে, বা স্কালপচারে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করি।

কেন, কথায় বলতে পার না ?

সবাই কি কথা বলতে পারে, না কথা বলতে চায় ? আর তা ছাড়া বেশির ভাগ কথাই তো অসত্য। ছবি আঁকা তো আদিমতম ভাষা।

আর যারা ছবি আঁকতে পারে না ?

আমি তো কাউকে আর্টিস্ট তৈরি করার জন্যে আঁকাই না। সবাই এঁকে কথা বলতে পারে—ভাব, ভাবনা, স্বপ্ন শঙ্কা সব নিজের অজান্তে ফুটে ওঠে।

তপু কিছুক্ষণ চুপচাপ আপেল কেটে বলল, আমরা যে এতক্ষণ কথা বললাম সে কি সব মিছে কথা।

অসত্য বলেছি। মিছে কথা বলি নি। আর তা ছাড়া, যদি ভেবে দেখ—

পলা দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বলল, কি আমাদের এত অবহেলা করছ কেন ? আমাদের গ্লাস কখন খালি হয়ে গেছে।

কে কাকে অবহেলা করছে ? সুজান উঠে রান্নাঘরে এসে বলল, বাঃ হাঙ্গারীয়ান গুলাশের দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে।

দরজায় বেল বেজে উঠল।

নিকি এসেছে। নিকলা থেকে নিকি।

পলা আলাপ করিয়ে দিল। নিকি ম্যানচেস্টারের মেয়ে। লম্বা, সুন্দর হাসি, লাজুক মুখ। একটু জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলে। ও সোশ্যাল ওয়ার্ক ট্রেনী হয়ে হাসপাতালে ঢুকেছে। ছ মাসের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছে এই শহরে। ব্রিস্টল ইউনির্ভাসিটিতে পড়তে যাবে। দিন গুনছে।

ভাল লাগছে না কেন ? সুজান বলল কথা বলার জন্যে।

ডিপার্টমেণ্টটা ভাল নয়। সবাই চাকরি ছেড়ে যাচ্ছে। ব্যাসিল-ডনে কিছু নেই।

কি আছে ভেবে এসেছিলে ? তপু সোজামুখ করে বলল।

উত্তর দিও না। করিন হাত তুলে বলল। টোপু ফাজলামী করছে। তোমরা ওঘরে সবাই গিয়ে বস তো। পলা হেল্প করবে। আর পাঁচ মিনিটে ডিনার টেবিলে পড়ে যাবে।

থ্যাঙ্কু!

খাবার টেবিলে হাসপাতালের গল্প শুরু হল। ডাক্তারদের শ্রাদ্ধ হল, ডাক্তারদের মাথায় নাকি ওষুধের বই 'মিম্‌স্‌' প্রিণ্ট করা আছে। আর কিছু নেই। তপু খুব প্রতিবাদ করল। কনসালট্যাণ্টরা কিংপিন হয়ে বসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে—হাসতে গেলে ওদের মুখ ভেঙে যাবে; জুনিয়র ডাক্তাররা বেশিরভাগই বিদেশী অর্থাৎ বাদামী, কি ইংরেজি বলে একমাত্র নিজেরাই বোঝে, সাহেবদের ইংরেজি বোঝে না—অতএব 'মিম্‌স্‌' দেখ, ওষুধ লাগাও। আর নার্সিং? ওদের মাথায় বসে আছে ব্যুরক্র্যেটিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কনসালট্যাণ্টদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে শক্তির খেলায়! আর যারা অ্যাকচুয়েলি নার্সিং করে, ওদের এমনই ট্রেনিং যে ওরা রুগীর জামা কাপড় খুলিয়ে বিনা দ্বিধায় স্নান করাতে পারে, কিন্তু রুগীর ভাব অনুভূতির ধারে কাছে যেতে ওদের ভীষণ ভয়। ওরা ডিউটিতে আসার আগে ব্রেনটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অফিসে জমা দিয়ে মাথায় নার্সিং ক্যাপ পরে ওয়ার্ডে আসে কাজ করতে।

আর প্যারা-মেডিক্যাল স্টাফ? করিন কথা শেষ করল, আমরাও পাল্লা দিয়ে বলছি আমরা রুগী সারাতে পারি ওষুধ না দিয়ে। কেউ কারুর কথা শোনে না, সবাই করিডর লক্ষ্য করে দৌড়চ্ছে। মাঝখানে পড়ে গেছে রুগীরা। সবার শেষে জিব বার করে হাঁপাচ্ছে, কেউ বা পালিয়ে বেঁচেছে, কেউ দাঁড়িয়ে গেছে, কেউ বা বসে, কেউ বা বিছানা নিয়েছে। এই হচ্ছে ন্যাশনাল হেলথ-এর সাইকিয়াত্রি!

হোয়াট ইনডাইক্টমেণ্ট! তপু বলে উঠল আতঙ্কে।

নিজে রুগী হয়ে যাবার আগে আমিও পালাচ্ছি!

সে কি? নিকি বলে উঠল, সবে এত কষ্ট করে ওয়াল-পেপার লাগিয়ে ঘর সাজিয়ে বসেছ, আর সব ছেড়ে চলে যাবে।

অন্য যারা আসবে ভোগ করবে। এ তো ফ্ল্যাট, ঘর তো নয়। পলা তো পরের সপ্তাহেই চলে যাচ্ছে। আর সহ্য হল না ওর।

স্যালির রাজত্বে কেই বা টিঁকবে?

স্যালি কে?

স্যালি হচ্ছে আমাদের বস্। জীবনে ওর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কটা ডাক্তারকে ও সিডিউস করতে পারে। পলা বলল হেসে। ও জুনিয়র থেকে শুরু করেছিল, এখন এক কনসালট্যান্টকে ধরেছে।

আঃ মনে হচ্ছে, সুজান বলল, এ ঘরে কারুর চোখ ছিল সেই কনসালট্যান্ট-এর উপর।

ওরা সবাই হেসে হালকা করে দিল মেয়েলি হিংস্রতা।

পলা কি নিউজিল্যাণ্ডে ফিরছ? তপু এবারে বলল।

না, আয়র্লণ্ডে। আমাদের পুর্ব পুরুষরা আয়র্লণ্ড থেকে এসেছিল।

যাচ্ছ শিকড় খুঁজতে?

হ্যাঁ, তা বলতে পার। কোনো আইরিশ ছেলে পেলে বিয়ে করে ফিরে যাব।

আর যাই কর আইরিশ বিয়ে করে বস না। কথা বানাবার মাস্টার ওরা। তোমাকে বাড়িতে ফেলে রোজ সন্ধ্যেবেলা পাব-এ কাটাবে। মাঝরাতে ফিরে আসবে মাতাল হয়ে।

আঃ, এবার নিকির আইরিশ প্রেজুডিস বেরিয়ে পড়ছে। করিন হেসে বলল।

ঠিক আছে, বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখ তুমি!

ঠিক আছে, তাই যদি হয় দেশে ফিরে একটা ছেলে করে ঘর পেতে বসব।

তপুর মুখের দিকে তাকিয়ে সুজান একটু হেসে বলল, পলার বিয়ের ঠিক নেই। কিন্তু ছেলের বাবাকে ও বায়না করে রেখে এসেছে, নিউজিল্যাণ্ডে।

পলা হাসল গলা মিলিয়ে সকলের সঙ্গে। তপু পুরোপুরি না বুঝেই হাসল, সুজানকে চোখ টিপে।

ব্যবস্থা হল সুজান করিনের ফ্ল্যাটে থাকবে। পলা হাসপাতালের হস্টেলে এক ঘরে থাকে। তপু থাকবে লুইসার কাছে।

তপু রাণা আর লুইসাকে পছন্দ করে। কিন্তু ইতস্তত করছিল স্বামী পরিত্যক্ত লুইসার সঙ্গে দেখা করতে। কি বলে সান্ত্বনা দেবে! দীপকই বলেছিলে দেখা করে আসার কথা।

তপু একটু ভয়ে ভয়ে বেল টিপল। লুইসা দরজা খুলে দুই হাতে তপুর হাত নিয়ে বলল, এস, এস। কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম। বস। খেয়ে এসেছ ফোনে বললে। একটু ব্র্যাণ্ডি খাবে? আমেরিকা ফেরত নিয়ে এসেছি।

দাও একটু। তুমি যদি খাও।

পলা আসার সময়ে সাবধান করে দিয়েছিল, মধ্যবয়সী মহিলারা কিন্তু কচি ছেলে খুব পছন্দ করে। তপু পলার কথা মনে করে একটু হাসল।

লুইসা ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এসে বসল।

আমেরিকা কী রকম লাগল?

খুব ভাল। বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মেরেই সময় কেটে গেছে।

কোথায় কোথায় গেলে?

বলতে গেলে কোথাও না। গ্রিনীচ ভিলেজে একটা সন্ধ্যা কাটিয়েছি। বস্টনে হার্ভার্ড দেখেছি, আর ভারমণ্টের পাহাড়ে বসে আড্ডা মেরেছি।

চমৎকার। আমেরিকানদের সঙ্গে মেশ নি?

দু-চারজন। ওদের মাথায় একটু ছিট আছে, জান? ওরা বুঝতেই পারে না দুনিয়ার লোক ওদের অপছন্দ করে কেন। তারপর তোমার কথা বল। সুজানকে নিয়ে আসলে না কেন?

ও ওর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারছে। তোমার তো অসুবিধা হবে না আমি থাকলে ?

অসুবিধা আবার কি ? ঘর তো পড়েই আছে। সুজানের কথা বল।

তপু একটু লাজুক ভাবে হাসল।

সুজান, তপু ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিয়ে মুখ নামিয়ে বলল, ও মাস দুয়েক বাদে আমেরিকা চলে যাচ্ছে।

লুইসা তপুর প্রোফাইল দেখে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। তপু বলল, আমি একটা নিতে পারি ?

লুইসা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি স্মোক করছ আজকাল ?

না। মাঝে মধ্যে খাই, তপু হেসে ফেলে বলল, পরের সিগারেট পেলে।

পার যদি ধর না। বড় বিশ্রী অভ্যাস। তুমি বলছিলে সুজান আমেরিকা চলে যাচ্ছে। তোমার বলার ধরন শুনে মনে হল ও চলেই যাচ্ছে !

তুমি দেখছি, তপু হেসে হালকা করে দেবার চেষ্টায় বলল, তুমি দেখছি রাণার থেকে ট্রেনিং নিয়েছ !

না, আমার ট্রেনিং অন্যখানে। লুইসা বলল, এড়িয়ে যেও না। বল।

তপু বলতে শুরু করল। সুজানের কথা কাউকে বলার জন্যে ওর কতদিন ধরে প্রাণ ছটফট করছিল। মাকে বলার প্রশ্নই ওঠে না। বাবার সঙ্গে সে কোনোদিন প্রাণের কথা বলে নি। বন্ধুরা জানে দেশ-বেড়াতে-আসা—সুজনের সঙ্গে 'অ্যাফার' হচ্ছে, ওদের কাছে 'অ্যাফার' মানে দু দিনের ফুর্তি, ও নিয়ে মজার কথা বলা চলে, গভীর প্রাণের কথা বলার প্রশ্ন কোথায় আসে ! সুজান তো ওকে প্রথম দিনই আঙুলে আংটি দেখিয়ে বলেছিল, সে 'এনগেজড',

সে বিয়ে করবে দেশে ফিরে। সুজান তো ওকে মিছে কথা বলে নি, ঘনিষ্ঠ হতে চায় নি, ঘনিষ্ঠ হয়েও বলেছে, এ দু দিনের সঙ্গ, এ দু দিনের খেলা, প্রেমে পড়বে না। ভালবাসা কি এক-পা দু-পা খেলার ছকে আঁকা এগোনো-পেছনো? ছকে একবার পা ঢোকালেই সর্বনাশ। এই তপুর প্রথম প্রেম, ও কি করে জানবে সমুদ্রের জলে শুধু পা ভিজোতে হয়, ঝাঁপিয়ে পড়তে নেই। না, না সুজান সে রকম মেয়েছেলে নয়। ওর মধ্যে ভেজাল নেই, ঘর পাতার ব্যাপারে ওর একমনা প্রেম, সেখানে প্রবেশ নিষেধ, অথচ ওর অদ্ভুত ভালবাসার ক্ষমতা আছে। তপুর মনে হয় নি সুজান শুধু হিচ-হাইকার তুলে নিয়েছে দূর পথের একঘেয়েমী দূর করার জন্যে? সুজানকে সে পছন্দ করল কেন এত মেয়ে থাকতে? লুইসা কেন রাণাকে পছন্দ করল এত পুরুষ থাকতে? না না, সে প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছে না। প্রশ্নর উত্তর জানে না বলে বলতে পারছে না।

কমপ্রেহেনসিভ স্কুলে সে পড়েছে, মেয়েদের দেখেছে বন্ধুর মতো। কলেজেও তো মেয়েরা বন্ধুর মতো। হঠাৎ সে যেন সুজানকে দেখল, ভাবে ভরা চোখ, সুন্দর ছোট্ট পাখীর মতো এতটুকু মেয়ে, কিন্তু ধারালো বুদ্ধি, ইস্পাতের মতো মন। ও বিহ্বল হয়ে বুঝতে গিয়েছিল, বুঝতে গিয়ে প্রেমে পড়ে গেছে।

কিন্তু ও সুজানের কাছে কৃতজ্ঞ। নিজের কাছে নিজেকে ওর ছেলেমানুষ মনে হত, এখন মনে হয় সে পুরুষমানুষ হয়েছে।

আমি কেবল নিজের কথাই বলে চলেছি স্বার্থপরের মতো। তপু নতুন করে ভরা ব্রাণ্ডি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল।

লুইসা তপুর হাত ছুঁয়ে হেসে বলল, এবার ভাবছ তোমার জিগ্যেস করা উচিত আমি রাণা মাইনাস কেমন ভাবে আছি?

তপু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, সে রকম কিছু।

প্রেম, বেদনা, মৃত্যুশোক মানুষকে স্বার্থপর করে দেয়। আমার সে সব পালা চুকে গিয়েছে। আমি এখন ভাল আছি। প্রতিদিন

সকালে ঘুম ভেঙে ভেবে কষ্ট হয় যে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। সময় এসে গেল। সেই বেদনাই এখন বেশি লাগে। আবার সেই ভবঘুরে জীবন। বাড়ির আরাম অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

কোথায় যাবে তুমি ?

উগাণ্ডায় চাকরি পেয়েছি। পরের মাসে রওনা দেব।

বাবা বোধহয় জানে না।

না। আমি কাউকে বলি নি। সবাই ভেবেই বসবে প্রাণের দুঃখে অন্ধকার আফ্রিকার জঙ্গলে পালিয়ে যাচ্ছি।

আফ্রিকা তো অন্ধকার নয়।

সরি। লুইসা হেসে ফেলে বলল, আমি সেকেলে লোক তো, এখনো আফ্রিকাকে ডার্ক কন্টিনেণ্ট বলে ভাবি। ব্লাডি ইম্পিরিয়া-লিস্ট!

তুমি বেশ অ্যাডভেনচারাস আছ।

আমার ছেলেবেলার সখ আফ্রিকা দেখব, এখন সুযোগ এসেছে ছাড়ি কেন ?

আগে যাও নি কেন তবে ?

ঘর বাঁধার সখ ছিল যে। ঘর বাঁধার সাধ বুঝে নিয়েছি, এখন আমি পাখির মতো স্বাধীন।

তপুর মনে পড়ল করিনদের ক্লাবের কথা। সবাই ঘর বাঁধার খোঁজে আছে। স্বাধীন থাকতে ওদের ভাল লাগছে না।

কি ভাবছ ?

না। ভাবছিলাম সুজানের বন্ধুরা দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘর বাঁধার সঙ্গী খুঁজছে। তুমি ঘর ভেঙে সানন্দে আফ্রিকায় চলে যাচ্ছ।

আমার তো সঙ্গী খোঁজার বয়স চলে গিয়েছে। সঙ্গী জুটে যায় ভাল, না জুটে গেলেও আর হা-হুতাশ করব না। সুজানের বন্ধুদের বোলো পড়িমরি করে খুঁজছে বলেই সঙ্গী জুটছে না ওদের। লুইসা উঠে পড়ে বলল, চল, তোমার শোবার ঘর দেখিয়ে দিই।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।

তুমি আবার বিয়ে করবে না ?

বিয়ে ? লুইসা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে ভেবে উত্তর দিল। আমার সমবয়স্ক পুরুষরা অল্পবয়সী মেয়ে খোঁজে—আমি একবার অল্পবয়সীর সাধ মিটিয়েছি, আর ওর ধারে কাছে যাচ্ছি না। সুতরাং বিয়ের চিন্তা আমি মন থেকে দূর করেছি। ওঠ, রাত ভোর হয়ে যাবে গল্প করতে বসলে।

আমার ঘুম পাচ্ছে না। তপু বলল। কফির কাপ নামিয়ে। আবদারে গলায়।

শুলেই ঘুম এসে যাবে। লুইসা মলির মতো করে বলল। তপুর মনে হল, কাল সকালে উঠতে কষ্ট হবে না হলে।

কালকে তো তোমাদের সারাদিনের প্রোগ্রাম। রাত্রে শুতে আসবে তো ?

আসব। তপু বিনা দ্বিধায় বলল। কথা ছিল ও নিকির ফ্ল্যাটে রাত কাটাবে।

তুমি আমাদের সঙ্গে চল না।

না, আমার অনেক কাজ আছে। লুইসা বলল। তোমরা ঘুরে এস।

তপুর আনমনা ভাবে ইচ্ছা করল লুইসাকে জড়িয়ে সে শুয়ে থাকে। অ-যৌন ভাবে। সান্ত্বনার মতো।

তপু উঠে দাঁড়াল। একেবারে নিশ্চুপ চারিধার। কথার আর চিন্তার ভাবগুলো যেন তরঙ্গের মতো খেলা করছে।

গুডনাইট তপু। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট করে তোমাকে তুলে দেব।

গুডনাইট লুইসা।

সুজান, তনি, মলি, লুইসা, করিন সব একাকার হয়ে গেল তপুর নেশা ভরা ঘুম ঘুম চোখে।

নিকির পুরনো ভক্সস গাড়িতে ওরা সারাদিন হৈ হৈ করে কাটাল। সাউথ এণ্ড-এর পিয়ার-এ গিয়ে সমুদ্র দেখল, বীচে বল নিয়ে খেলা করল,—সাউথ এণ্ড আর ভাল লাগছে না, ক্ল্যাকটনে চল। ক্ল্যাকটনে কেবল বৃদ্ধ আর মধ্যবয়সীদের আড্ডা, ট্যুরিস্ট সীজন শেষ হয়ে আসছে। ওরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলুভাজা আর মাছভাজা খেল ভিনিগর ঢেলে। বব উঠল আবার চল্লিশ মাইল ড্রাইভ করে সাউথ এণ্ডে ডিসকোতে যাবে। এবার তপু বেঁকে বসল। ওসব ডিসকো সীনে আমি নেই। তোমরা যাও।

ওকে বলে লাভ নেই। সুজান তপুকে উদ্ধার করল। টোপুকে লুইসার ওখানে নামিয়ে দিয়ে, চল মুখ-টুক ঠিক করে ডিসকোতে যাই। তোমার আপত্তি নেই তো!

বিন্দুমাত্র না।

কি বেরসিক এক বন্ধু করেছ। করিন বলল বিরক্ত হয়ে।

তপু হেসে ফেলল করিনের বলার ধরন দেখে।

বড় দেরীতে আলাপ হয়েছে। না হলে দেখাতে পারতাম বেরসিক কিনা! তপু আফশোষ করে বলল।

তোমাকে ক্ল্যাকটনে রেখে আসা উচিত ছিল বুড়োদের মধ্যে। পলা বলল এবার।

লুইসার সঙ্গে আমার ডেট আছে। তপু গম্ভীরভাবে বলল।

সুজান তপুর হাতে চাপ দিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, আমাকে ভয় দেখাচ্ছ বুঝি!

তপু সুজানের হাত ছাড়ল না।

জিনস আর সাদা শার্ট পরে দরজা খুলে দিল লুইসা।

এস টোপু এস। লুইসা বলল হাসিমুখে।

বসার আগে আমি একটু স্নান করে নিতে চাই। অসুবিধা

হবে ? তপু জানতে চাইল। এ দেশে স্নান করার অনুমতি চাইতে হয়।

কিচ্ছু না। তুমি স্নান সেরে এস আমি ততক্ষণে সাপার তৈরি করি। ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়।

ভীষণ।

লুইসা টেবিল সাজালো। টেবিল ম্যাটস ওয়াইন গ্লাসে ন্যাপকিন দিয়ে, ফুলদানীতে গোলাপ ফুল দিয়ে। একটা বাটির মতো মোমবাতী লাল আভা ছড়িয়ে জ্বলছে।

তপু খাবার ঘরে ঢুকে বলল, বাঃ! রোমান্টিক পরিবেশ। আমি কিছু করতে পারি ?

না তুমি বস। ও, ওয়াইন ফ্রীজে আছে, ওটা খোল তুমি। আর একটা রেকর্ড চাপিয়ে এস।

তপু ওয়াইন ঢালতে ঢালতে ভাবল এমন অ্যাট্রাকটিভ্ স্ত্রী, এত সাজানো ঘর ছেড়ে রাণাদা চলে গেল কি করে ? তপু রেকর্ড প্লেয়ার বেটোভেনের পিয়ানো কনচার্টো চাপিয়ে দিল।

লুইসা বড় সার্ভিং ডিশে বেকনজয়েন্ট কেটে নিয়ে এল। গরম মশলা দিয়ে সেদ্ধ। সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। ডাল সেদ্ধ। স্যালাড।

রাণা ইংরেজি খাওয়া পছন্দ করত না। তোমার আপত্তি নেই তো ? লুইসা ন্যাপকিন কোলে বিছিয়ে বলল।

না। আমি সব রকম খাওয়া পছন্দ করি। তপু ওয়াইনের গ্লাস হাতে নিয়ে বলল, চিয়ারস। তোমার উগাণ্ডা-জীবন সার্থক হোক।

ধন্যবাদ। লুইসা হাত বাড়িয়ে গ্লাসে গ্লাস ঠুকে বলল। নতুন, পুরনো—জীবন তো একটাই।

এই একটা জীবন নিয়েই কত কাণ্ড বল তো। আমরা নিজেদের জীবনকে কি ভীষণ ইম্পর্টেনস দিই, যেন আমাদের আগে কেউ বাঁচে নি, পরেও আর কেউ বেঁচে থাকবে না। তপু কাঁচা গাজর খেতে খেতে বলল।

তুমি খুব ভাব জীবন নিয়ে না? লুইসা জানতে চাইল বেকন মুখে পুরে।

মাঝে মাঝে। জান—তপু চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে বলল, ভাবতে গিয়ে আগে জট পাকিয়ে যেত। সুজানকে ভালবেসে মনে হয় সব কিছু যেন সহজ হয়ে গেছে। প্রেমের যেন একটা আলাদা অস্তিত্ব, একটা আলাদা শরীর আছে। ঐ শরীর যেমন উচ্ছল, তেমনই গভীর।

তপু দেখল লুইসা মাথা নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে। সে সচকিত হয়ে বলল, তোমাকে বোর করছি লুইসা?

লুইসার চোখ জলে ভাসছে, সে জোর করে চোখ নামিয়ে রেখে বলল, না তপু। বল তুমি।

তপু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে লুইসার চিবুক তুলে বলল, তুমি কাঁদছ লুইসা?

খেতে বস। বেকন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্মী ছেলের মতো আবার খেতে শুরু করল তপু। লুইসা একটু পরে ওয়াইনের গ্লাস তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, প্রথম প্রেম খুব পবিত্র টোপু। তারপর সারাজীবন শুধু প্রথম প্রেমের সন্ধানে আমরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। প্রেমের মানুষের সঙ্গে বাস করতে গেলেই সে কেমন সাধারণ, বিরক্তিকর হয়ে যায়। হয়তো প্রয়োজনীয়তা শুধু থেকে যায়। কিন্তু—

না লুইসা। তোমার উপার্জিত সিনিসিজম আমার বন্ধুদের মধ্যেও দেখি। তপু একটু ভেবে বলল, অনেক সময় ভাবি আমার মা-বাবা কি করে এত বছর এক সঙ্গে আছে? ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা যেন দুই জগতে বাস করে।

বেশির ভাগ সময়েই তো ছেলেমেয়েরা সেতু হিসেবে কাজ করে, তাই না?

উহুঁ! তপু মাথা নাড়ল। কাঁচা গাজর চিবিয়ে গালের এক

পাশে রেখে বলল, না আমার মনে হয় ছেলেমেয়েরা সেতু নয় তূণের অস্ত্র, যেন দাবার ছকের ঘুঁটি, ঘুঁটি চালিয়ে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে আক্রমণ করছে, হারাবার চেষ্টা করছে। কে কত ভাল চাল চালতে পারে!

লুইসা ভেতরে ভেতরে একটু চমকে উঠল, তার ছেলে বা মেয়ে যদি আজকে বেঁচে থাকত (যদি বেঁচে থাকতে দিতাম) বড় হত, সেও কি মাকে (বাবা কোথায়?) এ ভাবে দেখত। সে আস্তে আস্তে বলল, টোপু, স্নেহ, ভালবাসা দায়িত্বের কথা ভুলে যাচ্ছ একেবারে।

তপু কাঁটা-চামচ বাঁ পাশে শুইয়ে দিয়ে প্লেটটা একটু সরিয়ে দিয়ে বলল, না, ভুলে যাই নি লুইসা। মা আমাকে ভীষণ বেশি ভালবাসে, এত বাসে যে আমার মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে। দীপকবাবুর দায়িত্ববোধ আছে ঠিক, কিন্তু ভালবাসা যদি থেকে থাকে তো ভদ্রলোকের আছে একমাত্র তনুর প্রতি।

না, না, না, লুইসা টেবিলে দু হাত রেখে বলল, তুমি দীপকের প্রতি অবিচার করছ। দীপক ইংরেজদের মতো অনুভব-গভীর, প্রকাশ করতে জানে না। প্রকাশ করতে ভয় পায়।

হাঃ! তপু তাচ্ছিল্যে বলল, সেফ ডিপোজিটে গয়না রাখার মতো ভালবাসা আছে। জন্ম দিয়ে ফেলেছে, এখন জমা দেওয়া আছে ভালবাসা।

লুইসা উঠে প্লেট সরিয়ে, পাশে রাখা মাঝারি প্লেটে ব্ল্যাক-ফরেস্ট গ্যেটো এনে রাখল। তপু আনমনে সেই নরম ক্রীম দেয়া কেকে কাঁটা ডুবিয়ে দিল। তারপর একটু মুখে দিয়ে বলল, তুমি জানলে কি করে আমি ব্ল্যাক-ফরেস্ট ভালবাসি?

তোমার বাবা একদিন খেতে এসেছিল রাণা থাকতে। ব্ল্যাক-ফরেস্ট গ্যেটো দিলাম খেতে। বলল, তপু থাকলে খুব আনন্দ করে খেত আজ।

তপু লুইসার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, আই টেক ইওর পয়েন্ট !

লুইসা ওয়াইনের গ্লাস ঠোঁটে ছুঁইয়ে রেখে তপুর মুখের থেকে চোখ না সরিয়ে ব্যঙ্গভরে বলল, খুশি হলাম শুনে।

তপু চোখ নামিয়ে মন দিয়ে ক্রীম আর চকোলেটের কালো জঙ্গলে নিজেকে হারিয়ে যেতে দিল।

কফি ?

এবার তুমি বস লুইসা। তপু সচকিত হয়ে বলল, তুমি বস গিয়ে।

বেশ, তুমি বাসন মাজ, আমি মুছে তুলে রাখব।

তপু টেবিল পরিষ্কার করে, সিঙ্কে গরম জল ভর্তি করে তরল সাবান ঢেলে দিল। শার্টের হাতা গুটিয়ে ডুবিয়ে দিল দুই হাত।

লুইসা রান্নাঘর গুছোতে গুছোতে বাসন রাখতে লাগল মাজার জন্যে। ওরা কাজ করতে করতে গল্প করতে লাগল। তপুই আরম্ভ করল। তপুকে যেন আজ কথায় পেয়েছে। তপু বলল, তোমাকে চিনতাম রাণাদার স্ত্রী হিসেবে। সত্যি কিন্তু তোমাকে চিনতাম না।

আমিও চিনতাম তোমাকে দীপক-মলির ছেলে হিসেবে। তুমি কি ভাব, চিন্তা কর, জানতাম না। জানতাম তুমি মলির বাধ্য, মলির লক্ষ্মী ছেলে।

তপু হো হো করে হাসতে লাগল।

হাসছ কেন ?

'লক্ষ্মী-ছেলে'র লেবেল ঘাড়ে নিয়ে বড় হয়েছি, খুব মুস্কিল ওটাকে ঝেড়ে ফেলা। তনি দুষ্টু রাগী, আমি শান্ত ভাল। সব ভাঁওতা।

তা আমি আজকে, লুইসা ঠোঁট টিপে হেসে বলল, একটু বুঝলাম।

তপু বাসন মাজতে মাজতে হাসতে লাগল। লুইসা ন্যাপকিন

দিয়ে মুছে মুছে জায়গার জিনিস জায়গায় তুলে রাখতে লাগল।

তোমার সঙ্গে কত সহজে কথা বলতে পারছি। তপুর হাত থেকে ওয়াইনের পাতলা গ্লাস প্রায় ফসকে যাচ্ছিল, সে কায়দা করে ধরে রেখে বলল, মার সঙ্গে কিন্তু পারি না।

আমি তো তোমার মা নই। তাই বোধহয়।

হুঁ। তপু সিঙ্কের স্টপার উঠিয়ে জল ছেড়ে দিল। ততক্ষণে পারকুলেটরে কফি ফুটছে।

অনেক হয়েছে। তুমি কফি নিয়ে যাও। আমি ব্র্যাণ্ডি আর গ্লাস নিয়ে আসছি।

তপু ঘরে এসে দেখল রেকর্ড প্লেয়ার তখনো চলছে। সে বন্ধ করে দিল। কার্পেটে পা ছড়িয়ে সোফায় পিঠ রেখে সে চোখ বুজে বসল।

লুইসা কিছুক্ষণ পরে ঘরে এসে সেও অন্যদিকের কার্পেটের উপর বসল।

লুইসা।

বল।

রাণাদা ফিরে আসলে ?

রাণা ফিরে আসবে না। ফিরে আসতে সাহস করবে না। ফিরে আসলেও আমার ওকে আর কিছু বলার থাকবে না।

কফি আর ব্র্যাণ্ডিতে একটু চুমুক দিয়ে তপু নিজের মনেই বলল, সুজান যদি ফিরে আসে! তখন আমাদেরও কি কিছু বলার থাকবে না ? ভাবতে ভাল লাগে না।

সম্পর্ক কি তুলনা করা যায় ? কথায় মনে হয় সুজান তোমার বন্ধুও বটে। রাণা আমার বন্ধু ছিল না কোনোদিন।

হ্যাঁ, আমরা বন্ধুও বটে। বন্ধুত্ব হয়তো অটুট থাকবে। তপু হাত বাড়িয়ে বলল, লুইসা আমাকে একটা সিগারেট দাও।

লুইসা প্যাকেট ছুঁড়ে দিল লাইটার সমেত। তপু দুই হাতে

বলের মতো লুফে নিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, বৃষ্টিরও শব্দ নেই। আপনমনে পড়েই চলেছে। তপু সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আমার যদি মা-বাবা না থাকত, তাদের এক্সপেকটেশনের শেকল না থাকত, আমি লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম।

কোথায়? নিউজিল্যাণ্ডে?

হয়তো। হয়তো না। তপু লুইসার ঠাট্টা উপেক্ষা করে বলতে লাগল। কাউকে হতাশ করার বোঝা যদি আমার না থাকত, তাহলে কোথায় যাই কি করি, কিছুতেই কিছু এসে যেত না।

লুইসা কোথায় যেন পড়েছে আজকালকার ছেলেমেয়েদের নাকি আশা, স্বপ্ন, আদর্শ, উচ্চাশা বিশেষ কিছু নেই। সে একটু ভেবে বলল, তোমার কোনো উচ্চাশা নেই?

উচ্চাশা? তপু ভুরু কুঁচকে লাংস-পোড়ানো সিগারেটের কালো ধোঁয়া দেখতে দেখতে বলল, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তারি লাইনে মার পেটে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে গিয়েছি। ভাল ডাক্তার হতে চাই বৈকি। আর কি উচ্চাশা? অনেক, অনেক টাকা? ইনফ্লেশন আর ইনকাম ট্যাক্সে টাকার মূল্য কতটুকু। কেবলই যুদ্ধের হুমকী। মধ্য বয়সীরা প্ল্যান, প্রোগ্রাম করে। তরুণরা বাঁচে।

তপু চুপ করে গেল। সে ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখত মার জন্যে স্বপ্নপুরী তৈরি করে দেবে, আর একটু বড় হলে ভাবত মাকে নিয়ে সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে। মনে হত মাকে মুক্ত করা দরকার। নিজের স্বপ্নের কথা মনে করে তপু নিজের মনে ভেংচে হাসল। মা যেন একটা দায়িত্ব হয়ে গেছে, তার ভালোবাসার দাবি তপু কোনোদিনও মেটাতে পারবে না। তপু ইজ এ গুড সন্। মা পড়তে বসাত। বাবা বাংলায় তর্জমা করত। তপু অতি ভাল ছেলে।

তপু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

কি হল?

তপু পায়চারি করতে করতে লুইসার পিছনে দাঁড়াল।

তোমার কাছে হাশিশ নেই ?

না। লুইসা ভুরু কুঁচকে বলল।

তোমার এ-সব চলে নাকি ?

মাঝে-সাঝে। যখন পৃথিবীকে, নিজেকে অসহ্য মনে হয়। তপু যেন রাগত ভাবে বলল।

এখন অসহ্য লাগছে ?

তপু উত্তর দিল না। রেকর্ড প্লেয়ারে বিটলস্-এর একটা রেকর্ড চাপাল। ভল্যুম বাড়িয়ে দিল। অ্যাম্প্লিফায়ারে চারদিক থেকে ঘরটা ঝম ঝম করে উঠল। তপু আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে লাগল। লুইসা পা গুটিয়ে বসল। রাণা বিটলস্‌দের রেকর্ড লাগালেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। রবীন্দ্র সঙ্গীতও অসহ্য ছিল লুইসার কাছে।

তপু লুইসার সামনে হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে বসে বলল, তোমার কি উচ্চাশা ছিল লুইসা ?

লুইসা উত্তর দিল না। কি বলবে সে এতটুকু ছটফটে ছেলেকে ?

বল না। বল।

এখন ? আমি পুরোপুরি বাঁচতে চাই। ছোট ছোট সুখ দুঃখ নিয়ে। কাজ নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে।

সে তো সবাই চায়।

আমি তো অন্য কারুর থেকে বেশি কিছু চাই না।

রাণা চলে গেছে বলে কি তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে ?

কফির কাপে চুমুক দিয়ে লুইসা বলল, আমি কি ব্যর্থতার কথা বলেছি ? লুইসা কথা ঘুরিয়ে বলল, তুমি কি তোমার নিজের কথা ভাবছ ? সুজান চলে গেলে তোমার কি হবে ?

তপু দাঁড়িয়ে পড়ল। হুম করে নিডলটা রেকর্ড থেকে তুলে নিল। তপু লুইসার পিছনে দাঁড়িয়ে খুব ছোট গলায় বলল, আমার

মন যদি খুব অস্থির হয়ে যায় তোমার কাছে চলে আসতে পারি ?

লুইসার মনে হল বাচ্চা ছেলে একা হবার ভয়ে কাঁদছে। ওর ইচ্ছা করল ঘুরে বসে দু হাত বাড়িয়ে তপুকে বুকে টেনে নেয়। সে শক্ত হয়ে বসে আস্তে আস্তে বলল, তপু তুমি আসতে পার। কিন্তু আমি তোমাকে বলব এস না। ছেলেরা একদিন পুরুষ মানুষ হয়। মার কোল কি চিরকাল থাকে ?

তপু বসে পড়ে লুইসার দুই কাঁধ শক্ত করে ধরে রাগত স্বরে বলল, আমি তো মার কাছে ফিরে যাবার কথা বলি নি। বলেছি ?

লুইসা তপুর হাত কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আমি তোমার মার চেয়ে বয়সে বড়। তা ছাড়া আমি, লুইসা একটু থেমে যোগ করে দিল, আমি মেয়েমানুষও তো বটে।

তপু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় আঙুল চালিয়ে বলল, আমি শুতে যাচ্ছি।

ব্র্যাণ্ডিটা শেষ করে যাও।

না। তুমি খাও।

লুইসা তপুর ব্র্যাণ্ডির গ্লাস হাতে নিতেই তপু ছোঁ মেরে গ্লাসটা ওর হাত থেকে নিয়ে এক চুমুকে ব্র্যাণ্ডিটা শেষ করে দিল। তরল নরম আগুন শ্বাসনালী দিয়ে পাকস্থলী গরম করে তুলল। তপু ঝুঁকে লুইসার গালে চুমু রেখে বলল, গুডনাইট লুইসা।

গুডনাইট টোপু।

লুইসা তপুর হেঁটে যাওয়া দেখল অলস চোখে। ওর মনে হল ছেলেদের যত বয়সই হোক, তারা ভেতরে ভেতরে বাচ্চাই থেকে যায়। ওর ইচ্ছা করল না উঠতে, কাপ, গ্লাস তুলে রাখতে। ইচ্ছা করল না একা বিছানায় শুতে যেতে। তপু যেন আজকে অনেকদিন পর রাণাকে খুব কাছে এনে দিয়েছে। লুইসার একটু লজ্জা করল। রাণারও কি রাত্রিবেলায় কখনো লুইসার কথা মনে পড়ে ? কলকাতায় হয়তো এখন সকাল হয়ে গেছে।

তপু ব্র্যাণ্ডির নেশায় জামা কাপড় খুলে শুয়ে পড়ল নগ্ন দেহে। ওর চিন্তা, অনুভূতি কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে। একবার নিজেকে মনে হচ্ছে সে যেন ছেলেমানুষের মতো কান্নাকাটি রাগ করে এসেছে লুইসার কাছে, আবার মনে হচ্ছে সে যেন পুরুষের মতো কামনা করেছে নারীকে। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক ? উত্তর খুঁজে পাবার আগেই ওর চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

পলা আর করিন ওদের তুলে দিয়ে গেল স্টেশনে। রবিবারের প্ল্যাটফর্ম প্রায় খালি। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করা ছাড়া রবিবারে কিই বা করার আছে লণ্ডনে। রেলের টিকিটের যা দাম বেড়ে গেছে নেহাত দায় না পড়লে কেউ আর ট্রেন ধরে না।

ওরা কম্পার্টমেণ্টে উঠে ঘন হয়ে বসল। ওদের সীটের উলটো দিকে কোণায় শুধু একজন ভদ্রলোক 'সানডে মিরর' পড়ছে। তপু সুজানের হাত হাতে নিয়ে ওর কানে একটু চুমু খেয়ে বলল, সারারাত গল্প করেছ বুঝি ?

হুঁ। সুজান তপুর কাঁধে মাথা রেখে অলস গলায় বলল, কত কথা। আর তুমি ?

আমরাও অনেকক্ষণ গল্প করেছি।

কি গল্প করলে ?

জীবনের কথা। লুইসার সঙ্গে একা বসে কোনোদিন গল্প করি নি। লুইসাকে মনে হচ্ছিল যেন বহুকালের বন্ধু।

তুমি বেশ বয়স্ক মহিলাদের পছন্দ কর আমি লক্ষ্য করেছি।

তা করি। তপু হেসে বলল, অল্পবয়সী মেয়েদের কেমন যেন 'সিলি' মনে হয়।

ফ্রয়েড কিন্তু অন্য কথা বলবে।

ফ্রয়েড সাহেব, তপু ভেবে নিয়ে বলল, হয়তো দু-একটা সত্য

কথা বলে থাকতেও পারে। তপুর কানে তখনো বাজছে, 'আমি তো নারীও বটে।'

ব্যাপারটা কি? সুজান একটু সচকিত হয়ে জানতে চাইল।

কিছু নয়। তপু গম্ভীর ভাবে বলল, আমার চিন্তাটা একটু পরিষ্কার হোক তখন বলব।

আচ্ছা।

রেলগাড়ি লেইনডন-এ থেমে আবার চলতে শুরু করল। উলটোদিকের ভদ্রলোক বলপয়েন্ট বার করে ক্রসওয়ার্ড পাজল-এ হাত দিয়েছে। তপু ওর এক হাত দিয়ে সুজানকে জড়িয়ে আরাম করে বসল। সুজান চোখ বুজে আছে।

ঘুমুচ্ছ?

হুঁ।

কথা বলবে?

বল।

তুমি বল।

আমার বন্ধুদের কেমন লেগেছে?

পলাকে দেখে জিম্-এর টিচার মনে হয়েছে। যেন ফুটবল প্লেয়ার।

বেচারা পলা! ওর মনটা এত নরম। ছেলেরা ওকে দেখলে ভয় পায়, অথচ ও ভালবাসতে চায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, এতটুকু হয়ে! আমার উলটো!

হ্যাঁ, তুমি খুব ডিসেপটিভ আছ। তোমাকে দেখলে মনে হয় হাতের মুঠোয় তোমার পুরো মানুষটাকে ধরে রাখা যাবে।

আমার কথা থাক। আর করিন?

ওকে আমার খুব ভাল লেগেছে। যদি ছাত্র না হতাম, প্রপোজ করে বসতাম।

এই না তুমি আমাকে এত ভালবাস! সুজান তপুর বুকে নড়ে-

চেড়ে বলল।

তুমি তো আমার ভালবাসা চাও না সুজান!

সুজান মাথা না তুলে বলল, এখন কি চাইছি তবে?

এ তো দু দণ্ডের বিশ্রাম। তারপরে চলে যাওয়া। খুব খারাপ লাগে তোমার?

একটু লাগে বৈকি!

সুজান মাথা তুলে সরে বসতে যাবে, তপু ওকে আরো জড়িয়ে ধরল। অন্য সীটে কাগজ খর খর করে উঠল।

তপু সুজানকে ছেড়ে দিয়ে কানে কানে বলল, আমার খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করছে।

আমারও। সুজান ফিস ফিস করে বলল। ট্রেন দাঁড়াল স্টেপনী গ্রীনে। লণ্ডন এসে গেছে। লোক উঠছে।

তোমার ঘরে আজ রাত্রে আসব। তপু নিচু গলায় বলল।

মা-বাবা। তোমার মা প্রথম দিনই আমাকে সাবধান করে দিয়েছে।

হুঁ। তপু একটু পরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আমি ঠিক চলে আসব দেখ। তপু যেন নিজের মনেই যোগ করে দিল, আমি তো ছোট ছেলেটি নেই আর।

সুজান পা নামিয়ে জুতো পরতে পরতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। কিছু বলল না।

ফেন্‌চার্চ স্ট্রিট স্টেশন এসে গেছে। পুরনো স্টেশন। আলোর ছটাতেও কেমন যেন ধোঁয়াটে ময়লা লাগে। ওরা টিকিট দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠল। টিউব স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল। চারিদিকের সেকেলে দালান। অফিস পাড়া নিঃঝুম। রবিবারে যেন ঝিমিয়ে নিচ্ছে। কাল সকাল ন-টার আগেই জেগে উঠবে অফিস-রিসেশন, রিডানডেন্সি—কার চাকরি বাড়তি হয়ে গেছে, কে কাকে ল্যাং মেরে চাকরি রাখবে, উপরে উঠবে, ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি

দিয়ে কত বেশি লাভ করা যাবে, গুন গুন ঝম ঝম করবে অফিস পাড়া। আজকে কিন্তু জুতোর শব্দের প্রতিধ্বনি উঠছে দালানে দালানে।

টাওয়ার হিল টিউব স্টেশনে পোস্টার—পিক পকেট কাছেই আছে। সামলাও পকেট। ওরা টিকিট কিনে নেমে এল প্ল্যাটফর্মে। রবিবারে বড় দেরি করে করে টিউব আসে। দু-চারজন ছড়িয়ে অপেক্ষা করছে সুড়ঙ্গ ট্রেনের জন্যে। ঝমঝমিয়ে ট্রেন এসে গেল। ওদের সঙ্গে উঠল সেই কাগজ পড়া ভদ্রলোক। কে জানে ওর ক্রসওয়ার্ড পাজল শেষ হয়েছে কিনা! এত খালি সিট থাকতেও ভদ্রলোক বসল ঠিক ওদের উলটো দিকে। সুড়ঙ্গ ট্রেন চলতে শুরু করলে বড় শব্দ হয়, না চ্যাঁচালে কথা বোঝা যায় না। ওরা দু জনে হাতে হাত দিয়ে মনোযোগ দিয়ে বিজ্ঞাপন পড়তে লাগল। 'কি তোমার চাকরির জন্যে ভাবনা—আলফ্রেড মার্কস-এ চলে এস।' 'মুখে দুর্গন্ধ? সবাই পালিয়ে যায়! লিস্টারিন ব্যবহার কর।' 'তুমি কি প্রেগনেণ্ট? ভাবছ কেন? চলে এস প্রেগনেন্সি অ্যাডভাইসারি সার্ভিসে।' দুনিয়ার প্রশ্নের উত্তর, মানুষের চাহিদা বিজ্ঞাপনে লেখা আছে। দেয়ালের লেখা।

এমব্যাঙ্কমেণ্টে নেমে লেস্টার স্কোয়ার, লেস্টার স্কোয়ার থেকে সোজা উডগ্রীন। নীল পিকাডিলী লাইন।

উডগ্রীন স্টেশনে নামল ওরা। দুইদিকে দুই ছোকরার দল গুলতানি মারছে, এক দল সাদা, এক দল কালো।

ওরা হাঁটতে শুরু করল। অনেকটা হাঁটা পথ। তোমার মা-বাবাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। সুজান বলল, দু জনেই এত ভাল অথচ অঙ্কে মেলে না।

বাড়ি ছেড়েছি দু বছর হয়ে গেল। তপু বলতে লাগল, যখন বাড়িতে থাকতাম কিছু অস্বাভাবিক মনে হত না। বাবা আর তনি একদিকে, আমি আর মা যেন অন্য দিকে। বাড়িতে একরকম,

অথচ বাড়ির বাইরে তনির সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তপু হাঁটতে হাঁটতে সুজানের হাত হাতে নিয়ে বলল, এখন বাড়িতে আসলে দু দিন পরেই পালাই-পালাই লাগে।

তুমি তোমার বাবার সঙ্গে গল্প কর না কেন ?

চেষ্টা করি, কিন্তু কোথায় যেন আটকে যায়। অনেক সময় মনে হয় বাবা যেন এক অপরিচিত ভদ্রলোক।

তবে তুমি কে ?

তুমি বল না ! মনোবিজ্ঞানের চর্চা কর তুমি !

তুমি কে ?- আমি কে ? দুই পথিক। পথ চলতে চলতে বিশ্রাম নিতে গিয়ে মারাত্মক ভাব হয়ে গিয়েছে !

সুজান ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, মা-বাবারা অন্য নক্ষত্রের আজব চিজ। ওদের আমরা বুঝি না।

তোমার মা-বাবা কেমন ?

সুজান হেসে ফেলে বলল, আজব মানুষ। দু জনে ঝগড়া শুরু করল, তারপর কথা বন্ধ। ছেলেমেয়েরা তখন পোস্ট অফিস হয়ে যায়। আদরের শেষ নেই তখন দু দিক থেকে। আবার যখন দু জনে ভাব হত, এত ভাব যে আমাদের অস্তিত্বই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা ভুলে যেত। বড় হয়ে হাসতে শিখেছি। ছোটবেলায় বড় কনফিউসিং লাগত।

তুমি কি দুঃখী ছিলে ছোটবেলায় ?

একটুও না। সুজান হেসে বলল, আমাদের দু ভাইবোনে খুব ভাব ছিল, আর ছিল পাশের বাড়িতেই, অর্থাৎ পাশের গ্রামে দাদু-দিদিমা। মা-বাবার ভাব মানেই আমাদের দাদুর বাড়ি চলে যাওয়া। ডাক পড়লেই দিদিমা বলত, যাও, ঝগড়া মেটাও গিয়ে।

সুজান খিল খিল করে হেসে উঠল। কে কবে মা-বাবাকে বুঝেছে ? অদ্ভুত।

আমরা যখন মা-বাবা হব, তপু চিন্তিতভাবে বলল, আমরাও

কি ওদের মতো অদ্ভুত হয়ে যাব ?

ভাবতে ভয় লাগে। সুজান উত্তর দিল। আজকে আমাদের প্রোগ্রাম কি ?

মা ক্যামডেন লক-এ যেতে চায়। তারপর দেখা যাক কোথায় যাওয়া যায়।

ক্যামডেন লক কি ?

রবিবারের বাজার। লণ্ডনের লিটল ভেনিস। তুমি আর মা বাজার দেখ, আমি আর বাবা নদীর ধারের পাব-এ বসব খন। দেখি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা-বার্তা বলা যায় কি না।

তপু দুই জাগ বিয়ার নিয়ে এসে বসল, দীপককে দিল এক জাগ। টেমস নদীর মুখোমুখী। তপু একটা সিগারেট ধরাল। সকালে এক প্যাকেট কিনেছে।

তুই বেশি স্মোক করিস না তো। আজকাল ডাক্তাররা তো সব ছেড়ে দিচ্ছে। দীপক বলেই ভাবল সে অন্য কথাও তো বলতে পারত।

তপু একটু বিরক্তি চেপে বলল, না আমার অভ্যাস নেই। মাঝে-সাঝে খাই।

চুপ-চাপ। এক দল 'পাঙ্ক' নীল সবুজ খাড়া খাড়া চুল নিয়ে ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। ছেলে কি মেয়ে চোখ দিয়ে জামা কাপড় না খোলালে বোঝা যায় না। খালের ওপারে ছোট ছোট দোকান, কন্টিনেণ্টের মতো, ডেভিড হকিন্স-এর একজিবিশন হচ্ছে, পটারী, অ্যান্টিক, চামড়ার কাজ, মাটিতে বসে একদল ছেলেমেয়ে স্টোন হেঞ্জের কায়দায় পাথর বিক্রি করছে। কিন্তু কেউ ওদের দিকে নজর দিচ্ছে না। আমেরিকান ইংরেজি আর জার্মান ভাষার ছড়াছড়ি। নদীতে ঢাকা নৌকোয় দু জন ইংরেজ ভারতীয় জামা কাপড়, ধূপ ইত্যাদির দোকান সাজিয়ে বসেছে। ছেলেমেয়েরা

সব জিন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীপক মনে মনে ভাবল, দেশের এত খারাপ অবস্থা, চাকরি নেই, এত দামী সাজ-পোশাক ছেলে-ছোকরারা করে কি করে?

দীপক ভয়ে ভয়ে তপুকে জিগ্যেস করল না। রোদ আজকে বেশ চড়া। ভাল লাগছে। এ বছরে পুরো গ্রীষ্মকালই প্রায় বৃষ্টি আর ঠাণ্ডাতে গেছে। এ দেশে না থাকলে রোদের পিপাসা বোঝা যায় না।

লুইসা কেমন আছে? দীপক জিগ্যেস করল।

ভাল আছে মনে হল। ওর বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। যা টাকা চেয়েছিল পায় নি। ও উগাণ্ডায় চলে যাচ্ছে। তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবে বলেছে।

অদ্ভুত মহিলা। সাহস আছে। এ বয়সে আবার উগাণ্ডায় যাবে! দীপক প্যাণ্টোমাইন দেখতে দেখতে বলল।

ছেলেমেয়েরা চকের না কিসের গুঁড়ো দিয়ে মুখ পেণ্ট করে প্যাণ্টোমাইন করছে, ভিড় জমে গেছে।

তোমার নিজের খুব বয়স-বয়স লাগে? তপু সিগারেটের বোঁটা জুতোয় পিষে বলল।

মাঝে মাঝে লাগে বৈকি!

তপুর খুব জানতে ইচ্ছে করল বুড়ো হলে কেমন লাগে মনের দিক থেকে। ভরসা পেল না প্রশ্ন করতে।

মা বলছিল তোমরা কলকাতায় যাবে এই খ্রীস্টমাসে।

তোমার মা তোমাদের রেখে যেতে চাইছে না খ্রীস্টমাসের ছুটিতে। তনিও তো তখন এসে যাবে।

ঘুরে এস, কয়েকদিন বেশি থাকতে পারবে। বছর তিনেক হল যাও নি। আমি আর তনি না হয় বাড়িতে থাকব, আমাদের জন্যে ভেব না।

যাক, দীপক মনে মনে ভাবল তপু যোগ করে নি, আমরা এখন

বড় হয়ে গিয়েছি।

তনি কোথায় পড়বে, কিছুই আমাকে জানায় না। দীপক বলল।

ও তো আমাকে লিখেছে সাসেক্স ইউনিভার্সিটিতে যাবে। ব্রাইটনে।

ইণ্টারভ্যু দেবে, জায়গা পাবে, তবে তো যাবে।

ও তোমাকে বলে নি, ইণ্টারভ্যু দিয়ে গিয়েছিল আগের বছরে। চিঠি পেয়েছি যে সিলেক্টেটেড হয়েছে।

দীপক নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল, বিয়ার এক চুমুকে শেষ করে।

আরেকটা আনব তোমার জন্যে ?

দীপক উত্তর দিল না। তপু উঠে আরেক জাগ বিয়ার আনতে গেল। ফিরে এসে দেখে দীপক নেই। একটু পরে দীপক ফিরে এল মুখ মুছতে মুছতে।

তোমার গরমে কষ্ট হলে চল ছায়াতে বসি।

না। রোদটা বেশ ভাল লাগছে।

তপু বাবার হাতে বিয়ারের জাগ ধরিয়ে দিল।

আমার মতামত দূরের কথা, তনি একবার আমাকে জানাল না পর্যন্ত। টাকা তো আমাকেই দিতে হবে। না কি ?

তপুর ধারণা ছিল তনি নিশ্চয়ই বাবাকে জানিয়েছে। প্রথমে রাগ হল নিজের উপর, তারপরে তনির উপর। আচ্ছা মেয়ে তো, চাকরি করছে করছে, এমন নয় যে টাকা জমিয়ে পড়া-থাকার খরচা চালাতে পারবে, যদি পারেও, বাবাকে বলে নি কেন ? ও তো বিবেচনাহীন মেয়ে নয়। বাবার তো রাগ করারই কথা।

তপু একটু ভেবে আস্তে আস্তে বলল, হয়তো তনি ভেবেছে তুমি আপত্তি করবে বাড়ি ছেড়ে বাইরে পড়ার জন্যে।

আমাদের আপত্তির তোয়াক্কা করে তনি প্যারিসে গেছে !

তুমি তনিকে তো জান, তপু যেন বাবার কথা শুনতে পায় নি

এমন ভাবে বলল হালকা করে, ও নিশ্চয় ভাবছে, বাড়িতে ফিরে ও এমন ভাবে এমন সময়ে তোমাকে কথাটা জানাবে, তুমি আর না করতে পারবে না।

দীপক আবার কপালের ঘাম মুছল। প্যাণ্টোমাইনের ছেলে-মেয়েরা স্টেজ গুটোচ্ছে, পয়সা পকেটে রেখে। এরই মধ্যে একটি ছেঁড়া নোংরা জিন পরা, লম্বাচুলা ছেলে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে গিটার বাজিয়ে গান ধরেছে।

দীপক তপুর দিকে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে সোনালী বিয়ারে চোখ রেখে গম্ভীর গলায় বলল, আমরা কি দোষ করেছি তপু ?

বাব্বা ! তোমরা তখন থেকে ড্রিঙ্ক করে চলেছ ? মলি বলল, নাও তোমাদের জন্যে হামবুর্গার নিয়ে এসেছি।

তপু উঠে দাঁড়াল মাকে বসতে দিয়ে। দীপকের প্রশ্নের উত্তর আর ওকে দিতে হল না। সুজান তপুকে দেখল, তপুর চোখে বেদনার ছায়া।

দীপক উঠতে উঠতে বলল, বস সুজান।

না, আমি আর তপু মাটিতে বসছি। তুমি বস।

তোমরা কি ঝগড়া করছিলে নাকি এতক্ষণ ? থমথমে।

দীপক জোর করে হেসে বলল, এত সুন্দর দিন, এত হাসি, গান, থমথমে কোথায় দেখছ তুমি ? দীপক হামবুর্গারে কামড় দিল।

তুমি রিজেণ্টস পার্ক দেখেছ সুজান ? রাণীর পার্ক। গোলাপ বাগান ?

না। রিজেণ্টস পার্ক জু দেখেছি।

এর পরে চল ওখানে যাওয়া যাক। কি রাজি ?

দীপক মাথা নেড়ে সায় দিল খেতে খেতে। তনু বড় হয়েছে, অনুমতি পরামর্শের তোয়াক্কা রাখে না।

রিজেন্টস পার্ক। ওরা কনসার্ট শুনতে ঘাসের উপর বসে গেল। এখানের দৃশ্য অন্য রকম। চারিদিকে ফুলের রঙের সে কি বাহার! কাপড়ের ইজিচেয়ারে মধ্যবয়সীরা আধশোয়া ভাবে কনসার্ট শুনছে। এখানে জিন পরা, লম্বা চুলো, ছেলেমেয়েদের বড় বেশি দেখা যায় না, দেখা যায় না 'পাঙ্ক-বকার' আর 'স্কিনহেড'দের। ভদ্র, সুবেশ, রাজা-রাণীর বৃটেনে যেন ট্রাডিশন বজায় রেখে চলবে বলে এরা জড় হয়েছে। এখানে উঁচু গলায় কথা নেই, উঁচু গলায় হাসি নেই, গিটার বাজিয়ে পয়সা ভিক্ষা নেই, সমৃদ্ধ কলোনীয়ল ইংলণ্ড। বাকিংহাম প্যালেস মিষ্টি তীব্র রোদে সূর্যস্নান করছে, নরম সবুজ ঘাসের উপর, উপরে নীল আকাশের ছাউনি, চারিধারে লন—নীল, বেগুনী, গোলাপী, নীল ফুলের রূপ মেয়েদের রঙ করা মুখকে লজ্জা দিচ্ছে। লেকে ডিঙি ভাসছে, ভাসছে হাঁস। কে বলবে বৃটেনে দু মিলিয়ন লোক বেকার। কারখানার পর কারখানা বন্ধ হচ্ছে, হাহাকার উঠেছে উত্তর ইংলণ্ডে, ওয়েলস-এ। রিজেন্টস পার্কে রেস রায়ট, মাগিং নেই, রেপ নেই। রাণীর বাকিংহাম প্রাসাদ উদার-ভাবে প্রজা আর পর্যটকদের পাহারা দিচ্ছে।

তপু ঘাসের উপর শুয়ে চোখে হাত দিয়ে এলোমেলো ভাবছিল ক্যামডেন লক আর রিজেন্টস পার্কের পার্থক্যের কথা। ওর এলোমেলো ঘুমঘুম কনসার্ট শোনা ভাবনার মধ্যে থেকে থেকেই বাবার প্রশ্ন ভেসে আসছিল—কি দোষ করেছি, কি ভুল করেছি আমরা? ও যদি সুজানের সঙ্গে কথা বলতে পারত? মাথাটা একটু পরিষ্কার হত। মা-বাবাদের এত আহত-অভিমান হয় কেন?

বাড়ি ফিরে মলি রান্না করল, তপু আর সুজান সাহায্য করল। ওরা অনেক সময় নিয়ে খেয়ে দেয়ে ব্রীজ খেলল চারজনে বসে। শোবার সময় হলে তপু বলল, আমার একটুও ঘুম পায় নি। তোমরা শুতে যাও। আমি আর সুজান একটু গল্প করে পরে যাব।

মলি থতমত খেয়ে শুতে চলে গেল দীপকের সঙ্গে। তপুর কি পরিষ্কার ভাষা, অর্থাৎ তোমরা এবার আমাদের একটু একলা থাকতে দাও।

ওরা চলে যেতেই তপু বলল, তুমি কফি কর, আমি উপর থেকে কম্বল নিয়ে আসছি। বাগানে বসা যাবে। এত সুন্দর রাত ঘরে বসে নষ্ট করার মানে হয় না।

ওরা আলো নিবিয়ে প্যাটিও ডোর খুলে বাগানে কম্বল বিছিয়ে কফি নিয়ে বসল।

সুজান তপুর হাত নিজের ছোট্ট হাতে নিয়ে বলল, ক্যামডেন লক্-এ তোমার আর তোমার বাবার চোখে ব্যথা দেখেছিলাম।

তপু কফিতে চুমুক দিয়ে অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস নিয়ে বলল, আমরা মা-বাবাদের কোথায় কখন কী ভাবে যে আঘাত দিই আমরা হয়তো নিজেরাই বুঝতে পারি না।

আরেকটু স্পষ্ট করে বল। তপু বলল তনির কথা।

কিন্তু বাবার প্রশ্নে আরো কোনো গভীর বেদনা ছিল, তনি যে কোনো কিছু জানায় না সেটাই সবকিছু নয়।

মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে। ফুল, পাতা, গাছ রঙ হারিয়ে ঘন ছায়া ছায়া হয়ে গেছে। আকাশ থমথমে নীল কালো। এতটুকু হাওয়া নেই কোথাও। সবাই নিশ্চুপ হয়ে কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। দু-চারটে তারা আধ-বোজা চোখে ঝিকমিক করছে।

তপু সুজানের কোলে মাথা রাখল।

তোমার মা যদি নিচে নেমে আসে কোনো কিছুর জন্যে?

আসবে না। মাকে হয়তো আঘাত দিয়েছি, যে আঘাতের কথা বলছিলাম।

খারাপ লাগছে?

না। মনে হচ্ছে আমার কথায় যদি মা আঘাত পায় যে আমি তোমার সঙ্গ চাই, তোমার শরীরকে চাই তাহলে সেটা আমার দোষ নয়।

সুজান কিছু বলল না। তপুর ঘন চুল নিয়ে আঙ্গুলে খেলা করতে লাগল।

জীবনে এক একটা মুহূর্ত আসে মনে হয় সে চিরকাল মনের ফ্রেমে বাঁধা থাকবে। সুজান আস্তে করে বলল।

তারার মতো। কিন্তু তারাও তো খসে পড়ে! তপু বলল।

বাঃ এটা কী রকম বৈজ্ঞানিকের কথা হল। সুজান হালকা ভাবে বলল।

ভাব-ভাবনাকে এখনো তো বিজ্ঞান অঙ্কে ফেলতে পারে নি!

ভাগ্যিস পারে নি। সুজান বলে উঠল, জীবনটা কী রকম বোরিং হত বল তো!

চুপচাপ।

আমার কাছে এস। তপু তারার মতো আধবোজা চোখে বলল। তপু মাথা সরিয়ে নিল। সুজান তপুর বুকে মাথা রেখে ছোট্ট করে বলল, টোপু।

কোথায় যেন দুটো বেড়াল চীৎকার করে উঠল, ওরা কি মারামারি করছে, না ভালবাসছে?

সোমবার। দীপক মলি দু জনেই ছুটি নিয়েছে। কালকে ওরা চলে যাবে। দীপক বাগানে নেমে দেখল কফির মগ ছড়ানো। সে মগ দুটো তুলে এনে ধুয়ে রাখল। তপু বাড়িতে আছে, মলি চীৎকার করে বলবে না আজকে, দেখ তো কোনো চিঠি এসেছে কিনা! সে গার্ডিয়ান নিয়ে চোখ বুলোতে বুলোতে রান্নাঘরে চা করতে গেল। চা নিয়ে সে বসল কাগজ খুলে। বেশ লাগে কাজের দিনে ছুটি। দুনিয়ার লোক ছুটোছুটি করে মরছে, আর

দীপকের আজকে কোনো তাড়া নেই।

মলি নেমে আসল দশটার পরেই। সে আরেক পট চা নিয়ে দীপকের পাশে এসে বসল, রবিবারের সানডে টাইমস ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে।

দীপক কাগজে চোখ রেখেই বলল, কি ওরা উঠবে না? সুজান বলছিল কেম্ব্রিজে যেতে চায়।

সারারাত জাগলে সকালে ঘুম ভাঙে?

দীপক না শোনা না বোঝার ভান করল।

মলি ম্যাগাজিনের পাতা উলটে পালটে বলল, তোমার তো কোনোদিকে হুঁশ নেই।

মলি, দীপক কাগজ নামিয়ে বলল, তপু বড় হয়েছে। ডাক্তারি পড়ছে। কেন এক কথা বার বার বল?

তনি যদি হত?

তনি মেয়ে।

সুজানও তো মেয়ে।

সুজানের বয়স পঁচিশ বছর। তনির উনিশ!

তনি যদি বয়ফ্রেণ্ড নিয়ে এসে ওঠে তখন কি করবে?

নিশ্চয় তাড়িয়ে দেব না। কিন্তু কি করব জানি না। দীপক কাগজটা উঠিয়েও আবার নামিয়ে বলল, তনি তো তোমারও মেয়ে, তপু আমারও ছেলে। আমরা এমন ভাবে কথা বলি যেন ওরা আমাদের নয়—তোমার-আমার।

মলি ম্যাগাজিনে চোখ রেখে ঝাপসা রঙিন ঘোড়ামুখো প্রিন্সেস এ্যাম-এর মুখ দেখতে দেখতে বলল, কেন এমন হল। তপু যেন কত দূরে সরে গেছে—

দীপক চোখ না তুলে আস্তে আস্তে বলল, ছেলেমেয়েরা বড় হলে কি আর মা-বাবার থাকে? মা-বাবাই একা হয়ে যায়।

মা-বাবা হওয়াটাই যেন পাপ। যেন মহা দোষ করে ফেলেছি।

মা! তপু সিঁড়ির মুখ থেকে বলল, একটু চায়ের জল চাপাবে?

মলি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বলল, উঠেছিস। আয়।

দীপক হেসে ফেলে বলল, কি পাপ স্খলন করতে যাচ্ছ?

কিছু বলছ বাবা?

না, কিছু না। তোমার মাকে বলছিলাম।

তপু শিস দিতে দিতে বাথরুমে চলে গেল। তপু নেমে বাগানের দিকে তাকিয়ে বলল, চমৎকার দিনটা।

দীপক বাগানের দিকে তাকাল। রোদ ওঠে নি আজকে। মেঘ ভরা থমথমে আকাশ। দীপক তপুর তরুণ সুখী মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য ঈর্ষা বোধ করল। সেও হেসে জবাব দিল, চা খেয়ে নাও। সুজানকে উঠিয়ে দাও। কেম্ব্রিজে যেতে হলে ধীরে সুস্থে রওনা হওয়া দরকার।

উঠিয়ে দিয়েছি সুজানকে। তপু হাসি মুখে বলল। ওর ঠোঁটে সুজানের ঘুম ভাঙ্গা ঠোঁটের স্বাদ এখনো মিষ্টি লাগছে।

মা, চা কই?

তপু রান্নাঘরে গিয়ে মাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলল, কতদিন তোমার হাতে চা খাব না বল তো!

যাঃ ন্যাকামি করতে হবে না। মলি খুশি হয়ে বলল, বস। কি খাবি বল। সুজান উঠেছে?

হ্যাঁ এক্ষুণি আসবে। শুধু টোস্ট খাব। আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

আগে কমলালেবুর রস খেয়ে নে।

তুমি খেয়েছ? তপু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, খাচ্ছি। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, বাবাকে ডাকব?

তোমার বাবা এখন কাগজ নিয়ে বসেছে। ওঠাতে পারবে না। ছুনিয়ার পলিটিশিয়ানদের মিছে কথা, আর ধাপ্পাবাজী কি যে পড়ে ভগবানই জানেন।

তুমি যে এত সিনিক তা তো জানতাম না।

কিই বা আমার জানিস!

তপু টোস্টে মাখন মাখাতে মাখাতে একটু পরে বলল, জান মা, কালকেই আমি ভাবছিলাম, তোমাদের আমি কতটুকু জানি!

আরেকটা টোস্ট দেব?

না।

গুডমর্নিং মিসেস বোস।

গুডমর্নিং মিস ম্যাক্‌ক্যালেন! তপু সুজানের গলা নকল করে বলল। তুমি আমার মাকে মিসেস বোস ডেকে মরছ কেন?

কি বলে ডাকব তাহলে?

মা, তোমাকে কি বলে ডাকবে?

মলি বলে ডাকতে পার, দিদি বলে ডাকতে পার। আন্টি শুনতে আমার ভাল লাগে না।

বেশ, ডিডি বলে ডাকব। সুজান চেয়ার টেনে বসে বলল। তবে মিঃ বোসকে কি বলে ডাকব?

দাদা।

ডাডা!

উঃ তোমরা দ আর ত বলতে পার না কেন বল তো?

তুমি সকালে উঠে আমার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করেছ কেন বল তো?

মলি হেসে বলল, তুমি তপুর কথায় কান দিও না। আমি স্নান করে আসি। তোমার ডাডাকে একটা টোস্ট দিয়ে এস। যদি ভদ্রলোক খাবার সময় পায়!

দীপক ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, ভদ্রলোক সব শুনতে পাচ্ছে কিন্তু।

আজকের দিনটা ভালই যাবে মনে হচ্ছে, সুজান মনে মনে বলল টোস্টে মার্মালেড মাখাতে মাখাতে।

দিনটা ওদের ভালই গিয়েছিল। গ্রীষ্মের ছুটির কেম্ব্রিজ। পর্যটকদের ভিড়। সাইকেলের ভিড় কম। কালো গাউন পরা ছাত্ররা বই হাতে ঘোরাফেরা করছে না। ট্যুরিস্টরা যা করে ওরাও তাই করল। গাড়ি কার-পার্কে রেখে পায়ে হেঁটে এক কলেজ থেকে আরেক কলেজে সরু পাথুরে রাস্তা দিয়ে কিংস কলেজ চ্যাপেল দেখে মাঠের ভেতরে কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আইসক্রিম খেল, ব্রিজে দাড়িয়ে রোয়িং দেখল, কফি শপে গিয়ে কফি খেল, নিজেরা নৌকো ভাড়া করে রোয়িং করল! পাব-এ এসে লাঞ্চ খেল।

দেশে যাকে নালা বলে, সেরকম নদীর ধারে ওরা ঘাসের উপর বসল। উইপিং উইলো নদীতে সবুজ কান্নার দীর্ঘ পাতা ফেলে কোনো ব্যথায় বা আনন্দে অল্প অল্প দুলছে। সুজান টি শার্ট আর জিন পরে এসেছে, ওকে দেখাচ্ছে ষোড়শীর মতো। ও মাটিতে লাজুক মেঘ-ভাঙ্গা সূর্যের খেলা দেখছে। তপু জোর করে সুজান থেকে ওর লোভী চোখ সরিয়ে বলল, আধশোয়া ভাবে, তোমরা খ্রীস্টমাসে দেশে ঘুরে এস; তনি যদি বাড়িতে থাকে আমি না হয় লণ্ডনে একটা চাকরি জোগাড় করে নেব।

তুমি চাকরি করার জন্যে এত উঠে পড়ে লেগেছ কেন? মলি ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল।

বাঃ! কলকাতায় স্টুডেন্ট হেলথ হোমে যদি জায়গা পাই টাকা লাগবে না? প্লেনের ভাড়া, দু মাসের থাকা। ঠাকুমার কাছে থাকলেও টাকা তো লাগবে ঘোরাফেরা করতে!

মলি বলতে চাইল আমরা কি এতই গরিব যে তোমার টাকার জোগাড় করতে পারব না! দীপক ইশারায় ওকে বাধা দিল। ছেলে যদি রোজগার করে দেশে যেতে চায় ওরা বাধা দেবার কে? সে বলল, তোমার উপরি যদি কিছু টাকার দরকার হয়, আমরা দেব তা তো জান।

তোমরা তো দিচ্ছই। দরকার হলে চাইব বৈকি! তনির পড়ার খরচা আছে। তোমরা এত খাট, নিজেদের জন্যে কিছু কর না!

ইয়োরোপে যাবার খরচা কি গ্যারেজে কাজ করেই চালিয়েছ? মলি জানতে চাইল।

হ্যাঁ।

ওদের একটু দূরে এক মধ্যবয়সী স্বামী-স্ত্রী তিনটে ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে বসল। সকলের হাতে আইসক্রিম।

সারাদিন ক্লাস করে, দীপক নদীতে রোয়িং দেখতে দেখতে একটু চিন্তিত ভাবে বলল, আবার সন্ধ্যাবেলা কাজ করছ, শরীর ভেঙ্গে পড়বে যে!

থার্ড ইয়ারে আর বিকেলে কাজ করতে পারব না। ঠিক করেছি কোনো কোনো উইক-এণ্ডে মিনি-ক্যাব-ড্রাইভারের কাজ করব। তপু এক মুহূর্ত সুজানকে দেখে নিয়ে বলল। সুজান চলে যাবে। শনি রবিবারের ছুটি আর ওর দরকার হবে না।

মলি কিন্তু বুঝল। দীপক বলল, পড়াশুনো তো করতে হবে।

আমি খুব খাটতে পারি তোমার মতো। তপু বাবাকে আশ্বস্ত করল, তুমিও তো চারটে টিউশিনি করতে, ঠিক না?

তা করতাম। দীপক স্বীকার করল, কিন্তু বুঝতে পারল না কে তপুকে বলেছে ওর ছাত্র জীবনের টিউশনির কথা। মা নিশ্চয়। মলিকেও তো সে ভাল করে বলে নি। কেরানীর ছেলে ডাক্তারি পড়বে, টিউশিনি ছাড়া উপায় কি ছিল? বাবা কি ঘুষ নিত? ঘুষ নেবার কি সুযোগ ছিল ভদ্রলোকের? নিশ্চয় ছিল। না হলে সংসার চালাতো কি করে কেরানীর রোজগারে! দীপকের ভাবতে ভাল লাগল না!

সে বলল, আমাদের উপায় ছিল না। তোমার তো সেরকম দরকার নেই ভগবানের কৃপায়।

ভগবানকে টানাটানি করছ কেন? মলি হেসে বলল।

ভগবানকে বিশ্বাস করে কিনা সে নিজেই জানে না। দুঃখে বিপদে পড়লে সে মাকে ডাকে। ওর দিবাস্বপ্নে মা এক অপূর্ব সুন্দরী শক্তিময়ী উদার মহিলা। বাবাকে ডাকতে গিয়েও সে ডাকে না। বাবা অন্যজনের সম্পত্তি হয়ে গেছে যেন। বাবার চিঠির উত্তর দেয়া হয় নি। সে নিশ্চয় লিখবে, মলি নিজের মনে কান মলে বলল, তপু চলে গেলে কালকেই লিখবে টেলিভিশন না দেখে।

আমরা বাংলাতে কথা বলে চলেছি, দীপক জানতে চাইল, সুজান কিছু মনে করছে না তো!

সুজান নিজের নাম শুনে চোখ মেলে বলল, কিছু বলছ?

না, তুমি ঘুমোও আবার। তপু হেসে বলল। ওর ইচ্ছে করতে লাগল, সুজানের ছোট্ট শরীর ওর বুকে জড়ো করে নেয়। ও সেই সুন্দর ইচ্ছা দমন করে বলল, তনির তো আসার সময় হয়ে এল। আমি একটা উইক-এণ্ডে এসে দেখা করে যাব। মহিলা কত বদলে গেছে দেখতে হবে তো!

তনি কি খুব বদলে গেছে? দীপক কণ্ঠস্বরে ঔৎসুক্য চেপে বলল, প্রতি চিঠিতে লিখি একটা ছবি পাঠাও, কে কার কথা শোনে!

আমাকে তো পাঠিয়েছে, তপু পার্স থেকে ফটো বার করতে করতে বলল, একেবারে পাক্কা প্যারিসিয়ান হয়ে গেছে। দীপক ভরসা পেল না হাত বাড়িয়ে নিতে। ওর হাত কাঁপছে।

দেখি মেয়ের ছবি! মলি হাত বাড়িয়ে দিল।

ও তোমার মতো অত সুন্দর হয় নি মা! তপু মন্তব্য করল।

ফটো থেকে এক উজ্জ্বল তরুণ মুখ হাসি ভরা ঝিকমিকে কালো চোখে বলছে যেন, কেমন আছ? মলি ঈর্ষা গর্ব চেপে ছবিটা দীপককে দিয়ে বলল, দেখ, তোমার মেয়েকে চিনতে পারবে না।

আবার সেই 'তোমার'। দীপক ছবিটা আলতো ভাবে ধরে একটু দেখে বলল, বাঃ বেশ সুন্দর ছবি!

ছবি শুধু সুন্দর! তনি নয়। মেয়ে নয়। সুন্দর ছবি। তপু ভেবে বলল, তুমি রেখে দাও। ওর বন্ধু মিশেল তুলেছে।

যে মিশেল আমাদের কাছে এসেছিল এক সপ্তাহ? মলি বলল।

ও, মিশেল সত্যিই এসেছিল তাহলে! তপু বলে উঠল, ওদের তো অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব! প্রতি চিঠিতে মিশেল কি বলেছে, কোথায় ওরা গিয়েছিল, ইত্যাদি। কেমন মেয়েটা? বল নি তো এসেছিল যে!

মলি বলতে গিয়ে চেপে গেল, তোমাকে বলার সময় কখন পেলাম। আমাদের তো ভালই লেগেছে। মলি বলল, খুব ভদ্র। মেয়ে তো নয় ভদ্রমহিলা! প্রায় তিরিশ বছর বয়স। ফটো জার্নালিজম করে বলল।

হ্যাঁ, তনি ওর একটা বইও পাঠিয়েছে আমাকে।

কি বই?

কি যেন নারী স্বাধীনতা নিয়ে লেখা, ফরাসী ভাষায়। কিছু বুঝলামও না।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কলকাকলী শোনা যাচ্ছে। পাশে বসা মধ্যবয়সী স্বামী-স্ত্রী অনবরতই বাচ্চাদের বলে যাচ্ছে, নদীর অত কাছে যেও না। ওরা বসে বসেই বল খেলছে, বাচ্চারা মহা আনন্দে ছুটোছুটি করছে। স্বামী-স্ত্রীর মুখ দেখে মনে হয় মধ্যবয়সে মা-বাবা হয়ে গিয়ে যেন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মলি মনে মনে বলল, নিশ্চয়ই বহু দিনের চেষ্টায় ফারটিলিটি ক্লিনিকে গিয়ে পর পর তিনটে বাচ্চা করে ফেলেছে সময় চলে যাবার আগে।

মিশেলকে প্রথম দিন দেখে তো আমরা অবাক! তনির বন্ধু অল্পবয়সী হবে, আমি চকলেট, কেক, আইসক্রিম সব এনে রেখেছিলাম। মলি একটু বিব্রত হয়েই হাসতে হাসতে বলল, ঢুকল দেখি এক সফিস্টেকেটেড প্যারিসিয়ান মহিলা। তোমার বাবাও

থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

দীপক এবার হাসল তপুর সঙ্গে।

মিশেলের মতে তো, মলি বলল, তনু এক অসাধারণ মেয়ে। আমার তো একেক সময় মনে হত ও বুঝি দেখতে এসেছে আমরা তনির মা-বাবা হবার যোগ্য কিনা!

তুমি যা বল না মা!

সত্যি বলছি। মলি হেসে ফেলল। দীপক ঘড়ি দেখে ইংরেজিতে বলল, ছ-টা বেজে গেছে। এবার আমাদের ওঠা দরকার। অতনু আসবে বলেছে। রান্নাও তো করতে হবে বাড়িতে গিয়ে।

না, আমি সব রান্না কাল করে রেখে এসেছি। তোমার সব পছন্দ মতো। সুজানের ঝাল না লাগলেই হল।

আমি সব খাই। সুজান উঠতে উঠতে বলল।

যেতে যেতে আশা করি অফিস ট্রাফিকও পাতলা হয়ে আসবে। দীপক নিজের মনে মনেই বলল।

কেম্ব্রিজ থেকে উডগ্রীন পর্যন্ত ওরা তনির গল্প করতে করতেই সময় কাটিয়ে দিল। তনি চিরকাল বিচিত্র বন্ধু নিয়ে এসেছে বাড়িতে। হোমোসেক্সুয়েল ডিক, হেরোইন অ্যাডিক্ট জ্যানেট, বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা জামেইকার ভিভিয়ান, ফোক সিঙ্গার ডিলিয়ন, বাংলাদেশী রেস্তোরাঁর ওয়েটার জামাল। মনে আছে? মলি দীপককে বলল, জামালকে পড়িয়ে 'ও' লেভেল দেওয়াল।

দীপক হেসে বলল, জামাল শুনছি আজকাল ব্রিক লেনের এক নেতা!

আফশোস থেকে গেল তনির সঙ্গে আলাপ হল না। সুজান বলল।

কিছু ভেব না, তুমি যাবার আগেই তনি এসে যাবে। মা, সুজানকে যদি এক উইক-এণ্ডে নিয়ে আসি তোমার আপত্তি আছে?

মলি এক মুহূর্ত সময় নিল উত্তর দিতে, নিয়ে এস। ভালই

হবে। বাড়িটা আবার জমজমাট হবে।

সুজান ওদের সঙ্গে হাত দিয়ে খেল। কুমড়োর চচ্চড়ি, চিংড়ি মাছের মালাইকারী, মাংস, পোলাও, স্যালাড, পায়েস।

মা, তুমি কত রান্না করেছ!

ম্যানচেস্টারে তুমি কি খেয়ে থাক তুমিই জান! আবার কবে তোমার আসার সময় হবে তার ঠিক আছে!

বললাম যে তনি আসলে দেখা করে যাব।

তুমি ঘন ঘন এসো তপু, অতনু বলল, এত ভাল খাওয়া কার ভাগ্যে জোটে।

মা, ছেলের জন্যে করেছে না ভাইয়ের জন্যে করেছে বলা মুস্কিল।

ওরা খাওয়া দাওয়া সেরে মলিকে হাতে হাতে গুছিয়ে দিয়ে বসার ঘরে এসে বসল। অতনু আজ রাত্রে থাকবে। অতনু আর তপু এক সঙ্গে হওয়া মানেই সারারাত গল্প করা।

মলি একবার মনে করিয়ে দিল, তোমরা সকালে উঠে যাবে, সারারাত জেগ না কিন্তু।

দীপককে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সে উঠতে উঠতে বলল, চা খেয়ে আমি শুতে যাচ্ছি। কাল তোমরা কখন যাচ্ছ?

ছ-টায় রওনা দেব ভাবছি। অতনু আমাদের মটরওয়েতে পৌঁছে দেবে। আমাদের ডেকে দিও কিন্তু। এলার্ম ক্লক কাজ করছে তো!

হ্যাঁ! তুমি ঘুমোও। কালকে তোমাদের কাজ। সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছ। মলিও একটু পরে উঠে গেল।

ওরা কফি করে নিয়ে এসে বসল! অতনু ওর ঝুলি থেকে বার করল স্কচ-এর বোতল। সুজান বলল, বাঃ এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিলে কেন? ডাডা, ডিডিকেও দেয়া যেত!

দাদা দিদি, অতনু গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলল, ছেলে ছোকরাদের হুইস্কি খাওয়া পছন্দ করবে না। বিয়ার, ওয়াইন ঐ পর্যন্ত।

আমি একটু হাশিশও নিয়ে এসেছি, চলবে নাকি ?

না, তপু হেসে বলল, আজকের জন্যে আমার পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ নেই, শান্তি—গাঁজা না খেলেও চলবে।

সুজানও রাজি হল না। বলল, ওটা স্মোক করলেই আমি স্টোনড্ হয়ে যাই। অতনু হতাশ হয়ে এক্সপার্ট-এর মতো হাতের তালুতে হাশিশ বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে চেপে সিগারেটের কাগজে মুড়ে ঠোঁটে চেপে আরাম করে টান মারল।

এটা ধরলে কোথায় ? সুজান জানতে চাইল।

প্রেসিডেন্সি জেলে। কলকাতায়।

সুজান তপুর কাছে একটু আধটু শুনেছে অতনুর বিপ্লবী জীবনের কথা, ওর বাবা কী ভাবে পুলিশ অফিসারদের, পাশপোর্ট অফিসার-দের ঘুষ দিয়ে ছেলেকে বিদেশে পাচার করেছে।

তুমি বলছিলে শিয়ালদার স্টুডেন্ট হেলথ হোমে যাবে। আমি দু-একটা ছেলের ঠিকানা দিয়ে দেব, দেখা কর। তোমার নীল টোরী মনোবৃত্তি দু দিনে পালটে যাবে।

তপু হেসে আপত্তি করল, আমি আবার নীল টোরী হলাম কবে থেকে ?

আরে বাবা, বলতে গেলে এ দেশে জন্ম থেকে পড়াশুনো করছ, তোমাকে ব্রেন ওয়াশ করে বড়জোর লিবারেল বুর্জোয়া বানিয়ে দিয়েছে। এ দেশের পার্টি তো দুটো, লেবার আর টোরী, পয়সার এপিঠ আর ওপিঠ।

সুজান পা গুটিয়ে কার্পেটের উপর বসে সোফার হাতলে হেলান দিয়ে বলল, তুমি বিপ্লবী হয়ে এই ক্যাপিটালিস্ট দেশে পড়ে আছ কেন ?

সংগঠন তৈরি করতে হবে না! লেনিন মার্কস এরা সবাই একসাইলে ছিল।

সলজেনেৎস্কিনও একসাইল। সুজান মনে করিয়ে দিল।

ও ভদ্রলোক তো সিনাইল। ওয়েস্টার্ন প্রেস ওকে নিয়ে মাতামাতি করছিল প্রপাগেণ্ডার অস্ত্র হিসেবে, এখন প্রায় বৃদ্ধকে ওরা ভুলেই গেছে।

কালো আকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। একটু পরেই বাজ ভেঙ্গে বৃষ্টি শুরু হল।

শালার দেশ, অতনু আরাম করে গাঁজায় টান দিয়ে বাংলায় বলল, একদিন রোদ উঠলেই পরের দিন বৃষ্টি। কোনো বিশ্বাস নেই এদের।

তপু সুজানের জন্যে অনুবাদ করে দিল ইংরেজিতে।

তোমার যদি এতই এ দেশ খারাপ লাগে, তোমার তো এ দেশের রুটি জল খাওয়া উচিত নয়। সুজান একটু বিরক্ত হয়ে বলল।

বোঝাও তোমার বান্ধবীকে। অতনু বলল।

না, তুমি বোঝাও আমাকে। সুজান ছাড়ল না। তপু কেন বোঝাতে যাবে আমাকে?

অতনু এবার ভাল করে সুজানকে দেখল, এক রত্তি মেয়েকে ও পাত্তাই দিচ্ছিল না। তপু মনে মনে হাসল। সুজানকে প্রথমে দেখে সবাই একই ভুল করে।

ওরা আমাদের দুশো বছর রক্ত শুষে, নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করেছে। এখনো ভারতবর্ষে ওদের কত ইনভেস্টমেন্ট আছে জান?

না জানি না। সুজান বলল।

ওরা ভান করে এইড দিচ্ছে, চ্যারিটি করছে। পপুলার প্রেস লেখে, থার্ড ওয়ার্লডকে টাকা বিলিয়ে দিচ্ছে-কেন? কেউ বলে না, অতনু গাঁজায় আরেকটা গভীর টান দিয়ে বলল, চ্যারিটির ভান না করলে ব্যবসা চালাবে কি করে। পেছন থেকে রাজনীতির কলকাঠি

নাড়াবার কম্পিউটর তো আমেরিকার হাতে, বৃটেন আমেরিকার সিক্সটিনথ স্টেট ছাড়া তো কিছু নয়।

তপু অতনুর রাজনৈতিক অতিরঞ্জনে অভ্যস্থ, সে অপেক্ষা করতে লাগল সুজান কি বলে।

রাশিয়ার কথা ভুলে গেলে যে! ভারতবর্ষে রাশিয়া কি করছে?

আঃ রাশিয়া তো নিউ-ইম্পিরিয়ালিস্ট। আন্তর্জাতিক খেলা তো বিশেষ করে মধ্য এশিয়া আর এশিয়াতেই চলছে। ইন্দিরা গান্ধী কি সোশ্যালিজম-এর ধার ধারে? যার থেকে যেটুকু সুবিধা নিয়ে ক্ষমতা রাখতে পারলেই হল। আরো ভাল করে দেখ, ইন্দিরাকে আবার গদীতে বসালো কে! কোন্ আন্তর্জাতিক কম্পিউটর সেখানে কাজ করেছে ভেবে দেখ।

তুমি মহান চীনের কথা বলছ না তো! তপু থাকতে না পেরে বলল।

চীন! অতনুর গাঁজা শেষ হয়ে গেছে, সে ঠাণ্ডা কালো কফি এক চুমুকে শেষ করে বলল, চীন কোন্ পথে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে রিভিশিনিস্ট লাইন নিয়েছে। অতনু ভুরু কুঁচকে বলল।

রাশিয়া একটার পর একটা স্যাটালাইট তৈরি করছে। চীন দেশে হচ্ছে কোকাকোলার ফ্যাক্টরি, হিল্টন হোটেল—এখন তোমার বিপ্লবের চেয়ারম্যান হবে কে? তপু একটু না ঠুকে পারল না।

অতনু অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে গগারু তাহিতী প্রিণ্ট দেখতে দেখতে বলল, মার্কস, লেনিন, মাও সে তুং মরে গেছে; কিন্তু তাদের আইডিয়াকে কি আজ পর্যন্ত কেউ মেরে ফেলতে পেরেছে? ভারতবর্ষে সেই সায়েন্টিফিক আইডিয়া নিয়েই বিপ্লব হবে। ভাবতে পার, ভারতবর্ষে বিপ্লব না হলে, কোটি কোটি লোক কি করে ঘেয়ো কুকুরের মতো বাঁচার হাত থেকে মুক্তি পাবে!

রাশিয়া, আর চীন দেশের সাধারণ মানুষ কি মুক্তি পেয়েছে? সুজান উত্তর চাইল।

তুমি নিউজিল্যাণ্ডের মানুষ। তুমি বুঝবে না। অতনু ঘাড় নেড়ে বলল, ভারতবর্ষে গেলে বুঝতে পারতে।

ভারতবর্ষে আমি তিনমাস ঘুরেছি। সুজান বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলল অতনুর পিঠ চাপড়ানো গলার স্বরে, আমার নিজের লজ্জা হয়েছে আমি এক পৃথিবীর নাগরিক বলে।

অতনু সুজানের হাত হাতে নিয়ে ছেড়ে দিল।

বাজ পড়া আর বৃষ্টির শব্দ দেশের কাল বৈশাখীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। অতনু বলল।

নরম গলার স্বর পালটে গেল এক মুহূর্তে, সে সুজানের দিকে ঘুরে বসে বলল, তাহলে তুমি বল কি করে বিপ্লব ছাড়া ভারতবর্ষের মুক্তি আছে ?

ভারতবর্ষের মুক্তি কোথায় আছে, আছে কি না আমি জানি না। সুজান নিশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু তথাকথিত সোশ্যালিস্ট দেশ দেখে আমার বিশ্বাস হয় না বিপ্লবে কারুর মুক্তি হয়।

কোন মুক্তির কথা তুমি বলছ ? অতনু উঠে বসে জানতে চাইল, আত্মার মুক্তি ওয়েস্টার্ন সোসাইটির বিলাস-বুলি। ভারতবর্ষ খেয়ে পরে মানুষের সম্মান নিয়ে বাঁচতে চায়। গিয়ে দেখে এস চীনে। রাশিয়ায় সে সম্মান সাধারণ মানুষ পেয়েছে কি না !

যাব। আমি যাব দেশে ফেরার আগে।

গিয়ে তুমি নিজে দেখ। ওয়েস্টার্ন মিডিয়ার প্রপাগেণ্ডায় ভুলো না।

হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখব। জেরিয়াট্রিকরা কী ভাবে সমাজতন্ত্র গড়ছে !

দেখে আমাকে জানিও। অতনু বলল।

কিন্তু তুমি তো আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলে না। সুজান মনে করিয়ে দিল, বিপ্লবী আইডিয়া নিয়ে ক্যাপিটালিস্ট দেশের রুটি মাখন ধ্বংস করছ কেন ?

অতনু এবার হো হো করে হেসে উঠল।

তুমি দারুণ মহিলা! তপু তোমাকে পছন্দ করেছে কেন বুঝতে পারছি।

আমি তপুকে পছন্দ করেছি কেন, সেটা তো বুঝতে পার নি!

তাও একটা কথা!

ক-টা বেজেছে জান? তপু হাত ঘড়ি দেখে বলল, প্রায় তিনটে বাজে। এখন শুতে গেলে আড়াই ঘণ্টা ঘুমনো যাবে।

তনি কবে আসছে? অতনু জানতে চাইল।

এই দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই আসবে। তপু বলল। তপু জানে তনির প্রতি অতনুর একটু দুর্বলতার কথা। তনি ওকে পাত্তা দেয় না। বলে, 'বম্বাস্টিক স্পয়েল্ড চাইল্ড।' ভাবে ফুঁ দেয়া বেলুনের মতো।

তনি ওকে আক্রমণ করলে অতনু কখনো গায়ে মাখে না। মলি তনিকে বকেওছে কয়েকদিন, মামার সঙ্গে এ ভাবে কথা বলতে হয়?

অতনু আবার মামা। তনি হেসেছে মার বকুনী খেয়ে। তপু মনে করে নিজের মনে হাসল, অতনুকে ওর পছন্দই হয়। ওর মতে একমত হতে হবে তার কোনো মানে নেই। ও নিজের বাবার টাকার সদ্ব্যবহার করছে কি করছে না তা নিয়ে ওর মাথা ঘামাবার তো দরকার নেই। তা ছাড়া অতনুর বাবাই কি সৎভাবে টাকা রোজগার করে? কলকাতায় ক-জন করে?

তপু উঠে পড়ে বলল, তুমি আমার বিছানায় শোও, আমি নিচে শুচ্ছি।

না না, তুমি যাও। আমি যেখানে পড়ব সেখানেই ঘুমুব।

আমি যাচ্ছি। সুজান হাই তুলে বলল। গুডনাইট। গুডমর্নিং!

গুডনাইট!

সুজান পা টিপে টিপে উপরে উঠে গেল।

মঙ্গলবার। ওরা চলে গেছে। দীপক আর শুতে যায় নি। মলি আবার ঘুমিয়ে নিচ্ছে একটু।

দীপক ঘর পরিষ্কার করে চা করে খবরের কাগজ নিয়ে বসল। একটু পরে চিঠি আসার সময় হবে। তনির চিঠি সপ্তাহ দুয়েক পায় নি। কাগজে আজকে মন বসছে না। থেকে থেকেই তপুর কথা মনে পড়ছে। সুজানের কথাও। কোনো চাল, চমক নেই। তপুকে দেখে এবার অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করছিল। তপু যেন পুরুষ মানুষ হয়ে গেছে এই গত কয় মাসেই। সুজান তো সুযোগ করে দিয়েছে কথা বলার। দীপক চেষ্টা করেছে। কিন্তু কথা আর ভালবাসার নদী যেন বাঁধে বাঁধে বাধা দেয়া—সেখানে মসৃণ ভাবে স্রোত বয় না। তনি ফিরে আসলেও কি আবার মেয়েকে নতুন করে চিনতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। বারবার দীপক নিজেকে সাবধান করেছে—মেয়েকে আগলে রাখার চেষ্টা কোরো না, ওকে নারী আর মানুষের স্বীকৃতি দাও--তনি তো আর তাদের সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি নেই।

কতদিন তনি চিঠি দেয় না। দীপক কাগজ রেখে ধীর পায়ে দরজার গোড়ায় এল, চিঠি এসেছে। তনির? হ্যাঁ, তনির চিঠি এসেছে দীপকের নামে। আলাদা করে আবার মলির নামে। দীপকের চোখ ছল ছল করে উঠল। এটাই কি বয়সের লক্ষণ! মেয়ের হাতে লেখা খামের চিঠি নিয়েও চোখ ছল ছল করে ওঠে?

চিঠি এসেছে নাকি? মলি জানতে চাইল সিঁড়ি থেকে।

হ্যাঁ। তনি তোমাকে লিখেছে।

মলি তরতর করে নেমে এসে খামটা হাতে নিয়ে বলল, কি সৌভাগ্য, মেয়ে আমাকে চিঠি লিখেছে! ও খাম খুলে পড়তে পড়তে বাথরুমে চলে গেল। অফিসের তাড়া।

দীপক খামটা খুলল না। ভাবল ক্লিনিকে বসে পড়বে। সেভ করতে করতে বলল, কি লিখেছে তনি?

অনেক কিছু। ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখেছি। অফিস থেকে ফিরে এসে পড়ো।

দীপক মলিকে স্টেশনে পৌঁছে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে লর্ডশিপ লেন ধরে নর্থ সার্কুলারে পড়ল। রমফোর্ডে পৌঁছুতে হবে। প্রথম পাঁচ মাইল সে বড় ভিড় পায়, হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় যেতে হয়। সে ট্রানজিস্টার খুলে এল. বি. সি. দিল—উডফোর্ড রাউণ্ড-অ্যাবাউট-এ লরী লোডশেড করেছে, খুব ট্রাফিক জ্যাম।

আঃ, দীপক বিরক্ত হয়ে স্টেশন পাল্টে বি. বি. সি. থ্রি-তে দিল। মালার সিম্ফনী হচ্ছে। ওর অটোমেটিক গাড়ি, গিয়ার বদলাবার ঝামেলা নেই। ক্লাচের দরকার নেই। ব্রেকে পা দিয়ে, পা ছেড়ে গাড়ি চালাতে, থামাতে লাগল।

ক্লিনিক-এ দেরী হয়ে যাবে। দেরী করে আরম্ভ করা মানে দেরী করে শেষ করা। নিঃশ্বাস নেবার সময় পাবে না আজকে : ন্যাশন্যাল হেলথ-এর ক্লিনিক। ওর মনে পড়ল তপুর সঙ্গে আলোচনা। সুজানও ছিল সেখানে বসে। মলি রান্না করছিল। জান বাবা, অনেক ভাল আইডিয়ার মতো ন্যাশন্যাল হেলথ-এর শুরুও অতি চমৎকার ছিল। বেভান ভেবেছিল, ফ্রি ন্যাশন্যাল হেলথ করে দিলেই মানুষের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যাবে।

কিন্তু ফ্রি করে দিয়ে বন্যার গেট খুলে দিয়েছে তাই কি বলতে চাইছ? সুজান জিগ্যেস করল।

শুধু তাই নয়। দেশটাকে হাইপোকনড্রিয়াক করে দিয়েছে। অথচ যাদের সত্যিকারের চিকিৎসার দরকার তাদের ওয়েটিং লিস্ট দেখ। কোল্ড কেস হলে তুমি অনায়াসে দু বছর অপেক্ষা করতে পার।

তোমার কি মনে হয় না, সুজান বলল, মেডিক্যাল ট্রেনিং-এ কোথাও গণ্ডগোল আছে? মন, দেহ নিয়ে যে মানুষ, সেই গোটা

মানুষকে দেখার কোনো ট্রেনিং নেই, ইচ্ছা নেই।

জি. পি-র কাছে যাও, মুখের দিকে না তাকিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে প্রেসক্রিপশন লিখে দেবে।

ডাক্তাররাই তো মানুষকে হাইপোকনড্রিয়াক করে তুলেছে, প্রেসক্রিপশন আর রিপিট প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিয়ে।

সময় কোথায়, দীপক বলেছিল, আমি মাঝখানে একবার জি. পি. হয়েছিলাম, সকাল ন-টা থেকে বারোটা—পঁচিশ জন রুগী ওয়েটিং রুমে বসে আছে, তারপর বাড়িতে রুগী ভিজিট করতে হবে। সময় কোথায়?

ডাডা, সুজান মাথা নেড়ে আপত্তি করেছে, আজকাল তো অ্যাপয়েন্টমেণ্ট সিস্টেম হয়েছে, কনভেয়ার বেল্টে পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর রুগী চলে আসে। আমার সবচেয়ে আপত্তি কি জান, সুজান ঝুঁকে বসে বলল, তোমাদের ট্রেনিং শোনার কান তৈরি করে না। ঐ পঁচিশ জনের মধ্যে পনেরো জন বার বার ঘুরে আসে একটা না একটা অজুহাত নিয়ে।

তপু আপত্তি করে বলল, তুমি কি সব ডাক্তারদের সাইকো-থেরাপিস্ট হতে বলছ? বল বাবা?

দীপক তপুকে সায় দিয়ে বলল, ওয়েলফেয়ার স্টেট তো, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেখাশোনার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় লোক দিয়ে অফিস বসিয়ে রেখেছে। তবু ওরা ডাক্তারদের কাছেই আসবে, প্রেসক্রিপশন নিয়ে বাইরে গিয়ে ডাক্তারের শ্রাদ্ধ করবে।

সত্যি, সুজান এবার হেসে ফেলল, তোমরা ওদের আসল অসুখ ধরতে পার না, প্রেসক্রিপশন লিখে দাও, গালাগাল দেবে না কেন? আমার একবার দুর্ভাগ্য হয়েছিল জি. পি-র কাছে যাওয়ার। বিছানা থেকে উঠতে পারি না এত ক্লান্ত লাগে। জি. পি. চট করে না দেখেই লিখে দিল, অ্যান্টি ডিপ্রেস্যাণ্ট ওষুধ; বলে কিনা কাজে ফিরে যাও, মন ঠিক থাকলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। কি দারুণ সাইকোথেরাপী!

আমি প্রেসক্রিপশন ছিঁড়ে ফেলে হাসপাতালের ডাক্তার বন্ধুর কাছে গেলাম। রক্ত নিয়ে দেখল ভাইরাস ইনফেকশন হয়েছে—তিন সপ্তাহের বিশ্রাম।

আবার দীপকও হেসে বলল, রুগী স্বীকার করবে না ডিপ্রেশন। বলবে পেটে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, বুকে ব্যথা, এক্সপেনসিভ ইনভেস্টিগেশনে পাঠাও, কোথাও কিছু নেই, মনের ব্যথা! কথাগুলো বলেই দীপকের নিজের বুকের ব্যথার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। ও তাড়াতাড়ি যোগ করে দিয়েছিল, ন্যাশন্যাল হেলথের এখনো একটা সার্ভিসই ভাল আছে, সেটা হল এমারজেন্সি সার্ভিস। বাঁচাতে পারলে, মরতে তোমাকে কিছুতেই দেবে না! মরতে চাইলেও বাঁচিয়ে তোমাকে রাখবেই।

ন্যাশন্যাল হেলথের গলদ কিন্তু আরো অনেক গভীরে। তপু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলেছিল, এ দেশে পাবলিক হেলথের উন্নতি করে কলেরা, টাইফয়েড, স্মলপক্স, প্লেগ দূর করেছে, কিন্তু অন্য বেশির ভাগ অসুখই তো আমরা কী ভাবে বাঁচি, কি খাই, কেমন ভাবে থাকি, কী রকম সমাজে বাস করি তার থেকে জন্ম নিচ্ছে। ন্যাশন্যাল হেলথ-এর ফ্যান্সি দামী ওষুধ সস্তায় খেয়ে টেকনিক্যাল বিপ্লবে মানুষের অসুখ সারবে এ-কথা ভাবাই তো ফ্যালাসি!

দীপক তপুর দিকে তাকিয়ে ছিল, তপু যে এত গভীরভাবে চিন্তা করে সে তো তা জানত না।

দীপক ঘাড় নেড়ে বলেছিল, আমরা ডাক্তাররা ভান করি আমরা ভগবান। কারণ রুগীরাই তাই ভাবে। কিন্তু বেশির ভাগ ওষুধই তো স্বস্তি দেবার, ব্যথা কমাবার ওষুধ। তাই বোধহয়, আমি শিশু ডাক্তারী করি—কিন্তু মা-বাবাদের শিক্ষা দেবে কে? এ দেশে বুড়ো বুড়ীদের মরতে দেয়া হয় না। সমাজ ন্যাশন্যাল হেলথ আর সোশ্যাল সার্ভিস তৈরি করে বিবেককে তাকে তুলে রেখেছে।

আমরা টেকনিক্যাল বিপ্লবে, মলি কখন এসে যোগ দিয়েছিল,

ওরা খেয়াল করে নি, চাঁদে মানুষ পাঠাচ্ছি, কিন্তু ঘর সংসার কেমন করে চালালে মানুষের একটু সুখ শান্তি হবে তার হদিশ খুঁজতে আমরা প্রাণান্ত। কাগজ খুললেই এ ওকে হুমকী দিচ্ছে, হিরোশিমা যেন শুধু খেয়ালের খেলা। এ পৃথিবীতে বেঁচে আছি বলে আমার একেক সময় নিজের উপর ঘেন্না হয়, লজ্জা করে। যদি যুদ্ধ শুরু হয় ছেলেমেয়েদের কি হবে ?

মা! তপু মাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সান্ত্বনা দিয়েছিল বুকে করে, মা!

দীপক রাত্রিবেলা মলিকে বুকে জড়িয়ে বলেছিল, মলি, তোমার এত দুঃখ কেন ?

জানি না। মলির বাঁধভাঙা কান্না উপছে পড়েছিল স্বামীর বুকে, জানি না আমি। আমার একেক সময় মনে হয় এত লোক মরে, আমি কেন মরি না।

কেন ? কেন ?

দীপক চোখ রগড়ে ডান দিকের ইণ্ডিকেটর দিয়ে রাউণ্ড অ্যাবাউট-এ ঢুকল। গাড়ি চালানোর একটাই সুবিধা রিফ্লেকস অ্যাকশনে ড্রাইভিং চলে, মন যেন একটা স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে নেয়। বাস্টার্ড! দীপক জোরে গালাগাল দিল। পেছনের গাড়ি ইণ্ডিকেটর না দিয়েই হঠাৎ ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। আরেকটু হলেই ধাক্কা লেগেছিল আর কি!

কে কার কথা শোনে ? বুঝতে পারে ? মলির এত গভীর ব্যথার উৎস কোথায় ? স্বামী হয়ে সেই ব্যথার ভাগ সে কতটুকু নিতে পারে ? নাকি তার নিজের বিষাদ সে অজান্তে নিজের স্ত্রীকে দিয়ে ফেলে দিব্যি গাড়ি চালিয়ে ক্লিনিক নিচ্ছে গম্ভীর হালকা মেজাজে! কত প্রশ্ন! যারা মানুষকে চাঁদে পাঠায় তারা কতটুকু আর উত্তর জানে মানুষের প্রশ্নের ? ও প্রায়ই শোনে ক্লিনিকে কিছু কিছু মা-বাবারা যুদ্ধ নিয়ে চিন্তা করছে—আণ্ডারগ্রাউণ্ড

শেল্টার—পাতালপুরী থেকে উঠে এসে ওরা কি দেখাবে—বিধ্বংসী ইংলণ্ড ?

মলি ভিড়ের স্রোতে বিনা চেষ্টায় সুড়ঙ্গ ট্রেনে উঠল। ওর এক মুহূর্ত মনে হল, ওর পা দুটো বুঝি শূন্যে ঝুলছে। যে যার মনে চলেছে, যাদের সৌভাগ্য তারা বসে বসে কাগজ পড়ছে, ক্রস ওয়ার্ড পাজ্‌ল্ করছে, অথবা বই পড়ছে। শুধু ট্রেনের শব্দ। ম্যানর হাউসে ট্রেন থামল, আবার এক ঝাঁক উঠল ট্রেনে। তারপর ফিনসবাড়ি পার্ক স্টেশন, মলিকে নামতে হবে। সে 'এক্সকিউজ মি' করে করে দরজার দিকে এগোবার চেষ্টা করল। ফিনসবাড়ি পার্ক আসতেই একদল নামার ধাক্কায় সে নেমে গেল, উলটোদিকের প্ল্যাটফর্মে ভিক্টোরিয়া লাইনের ট্রেন ধরতে। পিল পিল করে সাদা-কালোরা আর বাদামী-কালো এশিয়ানরা উঠল। ফিনসবাড়ি পার্ক কালোমানুষে গিজ গিজ করছে।

মলি একটা ট্রেন ছেড়ে দিয়ে একেবারে প্ল্যাটফর্মের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে বসার জায়গা পাওয়া যায়। আজকাল ছেলেরা মেয়ে দেখলে সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় না। সে-সব ভদ্রতা বড় সেকেলে হয়ে গেছে।

মলি সত্যিই বসার জায়গা পেল। আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে, শকুনীর মতো চোখ রেখে দেখা কোথায় কোন সীট খালি হল, একদম ভাল লাগে না মলির। সে জোর করে তপুর মুখ মনের আয়না থেকে সরিয়ে রাখল। আসার সময় সে তনির চিঠি ব্যাগে পুরে এনেছে। হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে সে আবার চিঠিটা পড়তে লাগল :

প্রিয় মা, তোমাকে কয়েকটি চিঠি লিখেও ছিঁড়ে ফেলেছি, পছন্দ হয় নি। মনে হয়েছে কি যেন বলতে চাই, অথচ কলম নিজের নিয়মে আবোল-তাবোল লিখে গেছে। মনের কথা ধরতে পারে নি।

বলতে পারে নি এ-সব কথা। মলি মেয়েকে হাত দিয়ে ঠেলে নিজের মনে কেঁদেছে মায়াহীন রাগকে বুকে তালাচাবি দিয়ে। ওর একেক সময় মনে হত ও বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র তপুই বোধহয় ওকে পাগল হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, বাঁচিয়ে দিয়েছিল। মলিও একেকদিন চিৎকার করে 'মা' 'মা' ডেকে কেঁদে উঠত।

শরীর ভাল হয়েও সে প্রায় এক বছর দুর্বলতায় ভুগেছে। একদিন যেন সে হঠাৎ চোখ মেলে দেখল মেয়ের মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কুচকুচে কালো চুল গজিয়েছে, ইঁদুরের মতো কুঁচকানো চামড়া নরম, মসৃণ হয়ে গেছে।

কিন্তু ততদিনে তনি দীপকের হয়ে গেছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে, কাজের শেষে দীপক ছুটে এসেছে মেয়েকে দেখতে। খাওয়ানো, স্নান করানো, ন্যাপী বদলানো, দীপক করেছে। প্রথম প্রথম মলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। যা দুরন্ত তপু, এই দুর্বল শরীর নিয়ে দুটো বাচ্চাকে সে দেখবে কি করে? ঘরের কাজ করে রান্না করে? সেই অজুহাতে তনিকে দেখাশুনোর হাত থেকে নিজে নিস্তার পেয়েছে। ওর হাসপাতালের অস্ট্রেলিয়ান বন্ধুরা দীপকের প্রশংসা করত। ভারতীয় স্বামীরা এত বিবেচক হয় বুঝি?

ওরা ঠাট্টা করে বলত, আমাদের উচিত ছিল ভারতবর্ষে গিয়ে ভারতীয় স্বামী ধরে আনা। ওদের দীপকের কাছে ট্রেনিং এ পাঠিয়ে দেব।

মলি জোর করে হাসত কফির কাপ মুখে দিয়ে।

এককালের সেই কুৎসিৎ তনি আজকে ঝকঝকে ঘন বাদামী রঙ নিয়ে মাকে বলছে, সে মাকে ভালবাসতে চায়। মলিও তো মেয়েকে ভালবাসতে চায়, যেমন করে মা মেয়েকে ভালবাসে। ওর সমস্ত চোখ জলে ভাসতে লাগল। হাত থেকে তনির চিঠি পড়ে

গেল নিচে। পাশে বসা ইংরেজ ভদ্রলোক, চিঠি তুলতে তুলতে বলল, আর ইউ অলরাইট ?

হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তোমাকে। মলি লজ্জায় হাসার চেষ্টা করে বলেছে। সে তো মানুষের দয়ার যোগ্য নয়। ট্রেন থামল। দেখল ভক্সল-এ এসে গেছে। ভিক্টোরিয়া স্টেশন কখন বেরিয়ে গেছে টেরও পায় নি।

মলি তাড়াতাড়ি উঠতে যাবে, হাত থেকে হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে পড়ে গেল—কাঠের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল লিপস্টিক, পার্স, রাজ্যের জঞ্জাল যা মেয়েরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মলি কোনোরকমে সব ব্যাগের মধ্যে পুরতে লাগল। পাশের সেই ভদ্রলোক তড়াক করে উঠে যেই দরজা বন্ধ হতে যাবে, দু হাতে দরজা ঠেলে দাঁড়িয়ে থাকল মলিকে তৈরি হবার সময় দিতে। খোলা দরজা ধরে দাঁড়ালে ট্রেন চলবে না। মলি ঝাঁ করে ট্রেন থেকে বেরিয়ে এল। সে লজ্জায় ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাতেই পারল না, ধন্যবাদ দেওয়া তো দূরের কথা। মলি কান্না চেপে আবার উলটোদিকের প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোল। কত দেরী হয়ে যাবে কাজে যেতে। কি বলবে সে ? ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়েছিল ?

দীপক ফেরার পথে গাড়িতে উঠে বসে স্টিয়ারিং ধরে থাকল কিছুক্ষণ। চিঠিটা বের করে পড়ল ঃ

প্রিয় বাবা, চিঠি দিতে দেরী হয়ে গেল এবার। কিছু মনে কোরো না। বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এসেছে। তাই বন্ধু বান্ধবের আতিথেয়-তার আদরে একদম সময় পাচ্ছি না। ফরাসীরা দরজা খোলে ফরাসী ভাষা বলতে পারলে। যাদের বাড়িতে কাজ করি, বলেইছি তো ওরা আমাকে আত্মীয়ের মতো দেখে, যদিও সেজন্য খাটুনি কিছু কম না। কিন্তু একবার ফ্রাসোয়াকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেই, বেশির ভাগ সন্ধ্যা আমার নিজের। হঠাৎ খুব বেশি বন্ধু হয়ে গেছে। জানই তো,

প্যারিসের ছাত্র মহল খুব কসমোপলিটান, এবং উদার। এর পরের বার যখন প্যারিসে আসব, তোমরা নিশ্চয় এস, (আবার প্যারিসে যাবে তনি? দীপক ভাবল) আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দেব, আমি জানি, তোমার ওদের ভাল লাগবে। আপাত চোখে মনে হতে পারে, কি পাগল ছাগলের সঙ্গে মিশি আমি! কিন্তু তুমি তো আমার বন্ধুদের দেখে অভ্যস্ত। মাকে আস্তে আস্তে কনভার্ট করতে হবে, কি বল?

তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। কত কথা যে বলার আছে না! তুমি শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে যাবে।

(দীপক হাসল, তনির কথা শুনে শুনে সে কবে অস্থির হয়েছে?)

তোমাকে বলছি আমি কি স্থির করেছি। লাফিয়ে উঠো না যেন! আমি আরো দু বছর চাকরি করব। (মেয়ে বলে কি?) তিন বছর চাকরি করলে গ্রান্ট পাব ইউনির্ভাসিটিতে যাবার। শোন, শোন আগে, কেন চাকরি করব স্থির করেছি। দুটো কারণে, ক) তোমাকে তো আগেই জানিয়েছি আমি জার্নালিজম করব। আমার জীবনে আরো অভিজ্ঞতা দরকার। (কবে জানিয়েছে?) মিশেল-এর সাহায্যে আমি গ্লাসগোর অক্সফ্যামে একটা চাকরি পেয়েছি। মাইনে কম, কিন্তু চলে যাবে খ) তিন বছর চাকরি না করলে আমি সরকারি গ্রান্ট পাব না।

তোমরা তপুকে পড়াচ্ছ আবার আরেকজনকে পড়াবার দায়িত্ব নেয়া তোমাদের উচিত হবে না। (আমাদের কি উচিত হবে না হবে তনি ঠিক করবে?) তোমরা আমাদের জন্যে যথেষ্ট করেছ এবং করছ। তোমার ঠাকুমা, কাকা, পিসিদের দেখতে হয়, (বিদেশে পড়ে আছি কেন, যদি নিজের মেয়েকেও না পড়াতে পারি?) সুতরাং এই অজুহাতে জার্নালিজম করার জন্যে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নেব।

তোমার সঙ্গে দেখা হলে ভাল করে বলতে পারব কি বোঝাতে চাইছি। 'বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ডে গেস্ট ওয়ার্কার আনিয়ে ওদের এক্সপ্লয়েট করছে, দরকার ফুরিয়ে গেলে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে। মিশেল চায় আমি বৃটেনের কালোদের মধ্যে কাজ করি। গ্লাসগোতে প্রচুর কালো আছে। আমার বয়সী যারা বিদেশে জন্মেছে বা মানুষ হয়েছে তারা কি ভাবছে, কি করছে, ম্যাগি থ্যাচারের দয়ায় কালো বেকারদের কি অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে মাল মশলা জোগাড় করব, মিশেল ছবি তুলে· দু জনে মিলে বই বার করব। (মিশেল, সব সময় মিশেল, যেন মিশেলই তনির জীবনের হর্তাকর্তা !) তোমাকে আর মাকেও কিন্তু ইণ্টারভ্যু করব, হেসো না, তোমরা আমাদের সম্বন্ধে কী ভাব (কী ভাবি ?) কী আশা কর কেন চাও, এই ধর, আমি না হয়ে, বাধ্য ভারতীয় মেয়ে হব, ইত্যাদি।

বাবা, আমি জানি তুমি গভীর চিন্তা কর, তুমি আমাকে উৎসাহ দেবে নিজের মতো করে বাঁচতে।

তপু নিশ্চয় খুব আদর খেয়ে গেছে। একদিনের জন্যে ওর সঙ্গে আর সুজানের সঙ্গে দেখা হল না। ও সুজানকে নিয়ে এত লেখে যে নিজের কথা বলতেই ভুলে যায়।

আমরা পরের সপ্তাহেই রওনা দেব। মিশেল আমাকে গ্রীস পর্তুগাল দেখিয়ে লণ্ডনে নিয়ে আসবে।

আমি ড্রাইভ করতে শিখেছি। মিশেলই শিখিয়েছে। (আবার মিশেল !) ও আমাকে লণ্ডনে পৌঁছে পরের দিন পোল্যাণ্ডে যাবে স্ট্রাইক নিয়ে কি হৈ চৈ হচ্ছে দেখার জন্যে। সোভিয়েট ব্লক-এ স্ট্রাইক ! ভীষণ ব্যাপার। ওয়েস্টার্ন প্রেস এই সুযোগে খুব অ্যান্টি সোভিয়েট প্রোপাগাণ্ডা করে নিচ্ছে।

আমার অনেক অনেক ভালবাসা নিও।

ওঃ তোমাকে বলতেই ভুলে গিয়েছি, 'এশিয়ান' বলে কাগজটা

হঠাৎ আমার হাতে পড়ল, তোমার বন্ধু তন্সুদ্দুক এডিটর। 'জেনারেশন গ্যাপ'-এর উপর একটা লেখা দেখলাম। তন্সুদ্দুককে চিঠি দিয়েছি। তুমি একটু ফোন করে মনে করিয়ে দিও যে আমি তোমার অযোগ্যা কন্যা (হাঃ হাঃ)।

মাকে আলাদা করে চিঠি দিলাম। তোমাকে জানাব কবে লণ্ডনে পৌঁছচ্ছি। তুমি পারলে একদিন ছুটি নিও। সারারাত গল্প করব তোমার সঙ্গে বসে। রাজি তো? তোমার তনি।

অফিস ট্রাফিক কমে এসেছে। দীপক খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরল। ওর মনে হতে লাগল স্পিড দিলেই গাড়ি ওর কণ্ট্রোল ছেড়ে নিজের মনে হুস করে কোথায় চলে গিয়ে একাকার কাণ্ড করবে।

বাড়ি ফিরে দেখল মলি বসে বসে টেলিভিশন দেখছে। সে ঢুকতে মলি চোখ না তুলে বলল, কি এখন খাবে না একটু পরে? অভেনে সব ঢুকিয়ে দিয়েছি, তোমার দেরী দেখে।

দীপক কোনো উত্তর না দিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে আগে টাই খুলল। ওর মনে হচ্ছিল যেন টাই ওকে জাপটে ধরে নিশ্বাস নিতে দিচ্ছে না। জুতো মোজা খুলে, বাথরুমে গিয়ে প্রস্রাব করে, মুখে প্রচুর ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিল। ও মুখ মুছে, তনির ঘরে ঢুকতে গিয়েও ঢুকল না। নিচে নেমে এল। নিচে নেমে সে সোজা রান্না ঘরে ঢুকে, গরম অভেন থেকে কালকের রান্না খাবার বার করে ডাকল মলিকে, খেতে এস। না কি টি. ভি. দেখতে দেখতেই খাবে?

মলি বলল, কিছু বলছ নাকি?

দীপক গলা উঁচু করে বলল, দয়া করে খেতে আসবে?

মলি ধাঁ করে টি. ভি. বন্ধ করে রান্না ঘরে এসে বলল, মেয়ে কি লিখেছে, তার ঝাল কি আমার উপর ঝাড়ছ?

দীপক উত্তর দিল না।

কি হয়েছে কি তোমার? গলার স্বর কি তনি কেড়ে নিয়েছে তোমার?

দীপক উত্তর না দিয়ে খাবার টেবিলে খাবার পাত্র রাখতে লাগল। ওর বিশ্বাস হল না, ও কথা বললে চীৎকার করবে না কেঁদে ফেলবে।

মলি খেতে খেতে বলল, বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। তবু একটু শান্তি। কে আবার কোথা থেকে চিঠি লিখে বসবে দেশ থেকে, আমি আসছি। হিথরোতে থেকো। মলি নিজের মনেই বকে চলল, জান আজকে ভুল করে কোথায় আমি চলে গিয়েছিলাম? ভসলে। আবার সেই পালটা ট্রেন নাও। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল হাসপাতালে যেতে। কোনোদিনও আমার এমন হয় না! বয়সের ভীমরতি হচ্ছে আমার। আজকে—

তনি কি লিখেছে? চিঠিটা দেখলাম না তো!

হাসপাতালে ফেলে এসেছি! কি সব আবোল-তাবোল লিখেছে। ওদের সব ইণ্টেলেকচুয়েল কথাবার্তা আমি কি বুঝব? তোমাকে কি লিখেছে? আমাকে লিখেছে তোমাকে নাকি ওর ভবিষ্যতে কি করবে না করবে লিখেছে। কি লিখেছে গো? মেয়ের মাথায় পোকা হয়েছে! আমার দিদিমা বলত।

পোকা নয় তো! দীপক চাপা রাগে বলল, মিশেল-পোকায় ওকে ধরেছে। হাতে মাংসের টুকরো নিয়ে মুখে তুলতে ভুলে গিয়ে বলল, আমরা এত গরীব, এত অথর্ব হয়ে গিয়েছি যে মেয়েকে কলেজে পড়াতে পর্যন্ত পারব না। ওকে তিনবছর চাকরি করে বৃটিশ সরকারের কাছে প্রমাণ করতে হবে সে স্বাধীন, মা-বাবার টাকা না নিয়ে, সে সরকারি গ্রাণ্ট উপার্জন করবে!

কি বলছ কি তুমি? মলি ভুরু কুঁচকে ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলল। আমি বলছি, দীপক মেপে মেপে বলল, এ দেশের নিয়ম মা-বাবার উপার্জন বেশি থাকলে ছেলেমেয়েরা পড়ার গ্রাণ্ট

পায় না।

সে তো জানিই। নতুন কি বোঝাচ্ছ আমাকে?

তোমার মেয়ের ধারণা তপুকে পড়াতে গিয়ে আমাদের জিভ বেরিয়ে গেছে। সুতরাং মেয়েকে তিনবছর চাকরি করে সরকারের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে, সে স্বাধীন, সে মা-বাবার দয়ায় মানুষ হচ্ছে না, সুতরাং গ্রান্ট নিয়ে পড়তে পারবে!

মলি চুপচাপ খেয়ে গেল একটা কথাও না বলে। দীপকের আধ-খাওয়া প্লেট, বাসন সব নিয়ে মেজে, পুঁছে, তুলে, কালকের সকালের চায়ের ব্যবস্থা করে বসার ঘরে এসে বসল।

দীপক টি· ভি· না চালিয়ে মেডিক্যাল জার্নাল-এর পাতা ওলটাচ্ছে। সে বলল, কই তনির চিঠি দেখি।

আমার কোটের পকেটে আছে। মলি উপর থেকে চিঠি নিয়ে এসে, চা খেতে খেতে পড়তে লাগল। মলি চিঠি পড়ে ভাঁজ করে খামে রেখে বলল, তুমি এত আপত্তি করছ কেন?

আপত্তি করছি কেন? দীপক জার্নালটা ছুঁড়ে ফেলে বলল, এই বয়সে তিনটে বছর ছুঁড়ে ফেলে দেবে, আপত্তি করছি কেন! আসুক তনি। আদর দিয়ে দিয়ে ওকে মাথায় তোলা হয়েছে। যা ইচ্ছে তাই করবে!

মিশেল! মিশেল নিজের জীবন তৈরি করে নিয়েছে, তনির মতো বাচ্চা মেয়ের জীবনকে নষ্ট করা কেন? ও আসলে, আমি ঘাড় ধরে ব্রাইটনে নিয়ে যাব, পড়ুক সাসেক্স ইউনিভার্সিটিতে। বাড়ি ছাড়তে হয় ছাড়ুক, কিন্তু পড়ুক। তার পরে যা ইচ্ছা তাই করুক।

তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মলি শান্ত গলায় বলল।

বেশ ঠাণ্ডা লাগছে আজকে। মলি নিজের মনেই বলল।

দীপক আবার জার্নালটা তুলে নিল!

ফোন বেজে উঠল। দীপক বলল, যেই ফোন করুক বল আমি বাড়ি ফিরি নি।

মলি উঠে ফোন তুলে বলল, হ্যালো!…তন্মুদ্ধক? আপনার কথাই আমরা বলাবলি করছিলাম!…কে? ও উপরে গেছে স্নান করতে।…হ্যাঁ, হ্যাঁ…। কবে, এই রবিবারে? আসুন সুখতোনী খাওয়াব।…আচ্ছা ধোঁকার ডালনাও খাওয়াব। রেস্টুরেন্টে এ-সব তো রান্না হয় না!…হ্যাঁ, তনি লিখেছে।…রোজমারী ভাল আছে তো?…ঠিক আছে রোববার দুপুরে দেখা হবে!

…আচ্ছা! আচ্ছা!

মলি ফোন রেখে অন্য সোফায় এসে বসল। দীপক খুব মনোযোগ দিয়ে জার্নাল পড়ছে!

মলি একটু হাসল।

কি হাসছ কেন?

তোমার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে?

মাথা আবার গরম দেখলে কখন?

বাব্বা! এত রাগ তোমার বহুদিন দেখি নি। মলি দীপককে দেখে নিয়ে বলল, তনি যা করতে চাইছে দাও না কেন করতে। না না, শোন আগে আমার কথা। মলি জোর দিয়ে বলল চায়ের কাপ তুলে নিয়ে, আমাদের জীবনে বাছাই করার সুযোগ ছিল না, শক্তি ছিল না। তথাকথিত গুরুজনরা রেললাইন পেতে দিয়েছিল, আমরা চলেছি।

দাঁড়াও। মলি হাত তুলে বলল, আমার কথা শেষ করতে দাও আগে। তনি ড্রাগ এডিক্ট হতে পারত। প্রেগনেণ্ট হয়ে বিয়ে না করে থাকতে পারত। ও চাইছে জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে, তার পরে পড়াশুনো করবে। নাই বা নিল আমাদের সাহায্য। আমরা তো আছিই। ও জানে আমরা আছি। ওর নিজের মতো বেঁচে থাকার আত্মগর্বকে কেড়ে নেয়ার অধিকার, আমরা মা-বাবা বলেই কি আমাদের আছে?

ওর আত্মগর্ব তো মিশেলের ফুঁ দেয়া বেলুনের মতো। মিশেল

রেললাইন পেতে দিয়েছে, তনি চলছে। দীপক রাগ বিরক্তি চাপা দিয়ে বলল।

আঃ হাঃ, মলি ঘাড় নেড়ে বলল, তুমি ভাল করেই জান, তনি কারুর কথায় চলার পাত্রী নয়। মিশেল ক্যারিয়ার ওম্যান, ওর সাহায্যে তনি যদি নাম করতে পারে, টাইমস্-এ গার্ডিয়ান-এ ওর লেখা বের হয়, তুমিই প্রথম গর্ব করে লোককে বলে বেড়াবে—এই দেখ, আমার মেয়ের লেখা! মলি হেসে হালকা করে বলল, কি বলে বেড়াবে না?

তোমাকে কি লিখেছে তনি? দীপক তীক্ষ্ণ চোখ রেখে বলল, চিঠিতেই দেখি তোমাকে কনভার্ট করে ফেলেছে! কি লিখেছে?

মা-মেয়ের কথা। ভালবাসার কথা।

ভালবাসার কথা?

আমি শুতে যাচ্ছি। সেই ভোর পাঁচটায় ওঠা। কই তপু তো ফোন করল না? বলেছিল পৌঁছেই ফোন করবে। মলি অনুনয় করে বলল উঠতে উঠতে, তুমি একটা ফোন করে দেখ না!

দীপক উঠতে গিয়েও বসে বলল, থাক্ ও ফোন করবেখন। যখন সুবিধে হবে। তুমি শুতে যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি। ফোন করলে ডেকে দেব।

মলি মুখে ক্রীম মাখতে লাগল। টিস্যু পেপার দিয়ে ক্রীম তুলে দেখল সাদা টিস্যু পেপার কালো হয়ে গেছে। লণ্ডন বড় নোংরা। রেডিও টু-তে গান হচ্ছে।

ক্যাচ এ ফলিং স্টার
ফোল্ড ইট ইন ইওর পকেট
সেভ ইট ফর এ রেনি ডে—

আয়নায় চোখ রেখে সে নিজের মুখ দেখতে পেল না।

তনি তোমার শোবার সময় হয়েছে।

চল।

বাবা আসবে।

বাবার আসতে আজকে দেরি হবে।

চল। মলি হাত বাড়িয়ে তিন বছরের তনিকে কোলে তুলে বলছে, চল। সুন্দর পরীর গল্প বলব।

তুমি না। তনি হাত পা ছুঁড়ে বলছে—তুমি না। বাবা বলবে। বাবা আসবে। মলি জোর করে তনিকে তনির ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। কী চিৎকার! বাবা আসবে। তুমি না। তুমি না।

দেখ কি সুন্দর জামাটা। পরে নাও।

বাবা পরাবে। ওটা সুন্দর না।

পরে নাও। তুমি আমি তপু পার্কে বেড়াতে যাব।

বাবা নিয়ে যাবে। তুমি না।

অমলেট খেয়ে নাও। তপুর মতো বড় হবে।

বাবা অমলেট খায় না।

যা বলছি খেয়ে নাও।

তুমি খাও।

আমি কিন্তু এক্ষুণি উঠে ভীষণ চড় মারব।

বাবাকে বলে দেব।

এই দেখ। কি সুন্দর ডল এনেছি তোমার জন্যে।

তপুকে দাও।

ছেলেরা ডল নিয়ে খেলা করে বুঝি? দেখ, চোখ পিট পিট করছে। আবার কাঁদেও।

আমি ডল চাই না।

না, না, না, না। মলি কালো আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পেল না। 'তুমি না।' তনি মাকে চায় নি। বাবা। শুধু বাবা। মা কেউ নয়। কালো আয়না যেন পেত্নীর মতো হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল মলিকে ব্যঙ্গ করে।

ফোন বাজছে। মলি আধমোছা ক্রীম-মাখা মুখে ছুটে এল নিচে।

তপু?

হ্যাঁ।

ভালমতো পৌঁছেছ তো! খুব কষ্ট হয় নি তো! পি-পি-পি ফোন নম্বর দাও। ফোন নম্বর দাও।

লাইন কেটে গেছে। দীপক রিসিভার হাতে করে মলিকে বলল, পয়সা ফুরিয়ে গেছে বোধহয়।

রিসিভারটা রেখে দাও না! আবার নিশ্চয় চেষ্টা করবে। মলি প্রায় চিৎকার করে বলল।

ফোন আর আসল না।

ফোন আর বাজল না সে রাত্রে। মলির কানে, কালো আয়নার পেত্নীর হাসি হিঃ হিঃ করে কেবল বাজতে লাগল! ঘুমের মধ্যেও।

ষোলো

সেই পঞ্চাশ সালে তসুদ্দুক লণ্ডনে এসেছিল, লণ্ডনেই থেকে গেছে। ও কি পড়তে এসেছিল, কি পড়েছে কেউ জানে না। কিন্তু আদৌ পড়তে নাও এসে থাকতে পারে। সে বিয়ে করেছে জার্মান মেয়ে রোজমারীকে। সে অনেক আসা যাওয়া, ওঠা নামা, ভাঙ্গা গড়া, বন্ধুদের জীবন, দেশের ভাগ্য দেখেছে লণ্ডনে বসে

বসে। পূর্ব পাকিস্তান বাঙলাদেশ হয়ে গেল, তাও দেখেছে, দেখে সুখী হয়েছে লণ্ডনে বসে।

তস্সুদ্দুকের সঙ্গে যারা এককালে স্বাধীনতা সংগ্রাম বা পার্টি করেছে, তারা আস্তে আস্তে পাল্‌টে গেছে। সে দেখেছে। কেউ ফ্রাসটেটেড হয়ে সিনিক হয়ে গেছে, কেউ দিব্যি দু-চার পয়সা করে তথাকথিত তরুণ বয়সের আদর্শকে নিয়ে তাচ্ছিল্যভরে হাসতে শিখেছে। যে যার ধান্দায় ব্যস্ত।

তস্সুদ্দুক কিন্তু অন্যদের মতো কেবল নিজের ধান্দায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে নি। হয়তো বা ছেলেমেয়ে নেই বলেই দেয়ালঘেরা জীবন ওদের বাঁধতে পারে নি। মধ্যবয়সেও সে তরুণ আদর্শের পোশাক পরে বিব্রত, চিন্তিত, কর্মরত।

তস্সুদ্দুকের নামের সঙ্গে 'গঙ্গা' রেস্তোরাঁ অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। সোহোতে 'গঙ্গা' রেস্তোরাঁর নাম ছিল ইংরেজিতে লেখা 'গ্যাঞ্জেস' বাংলায় লেখা 'গঙ্গা'। মশলা—ক্ষুধার্ত ইংরেজদের খাওয়ার মধ্য দিয়ে সে বাঙালি সংস্কৃতি চালু করার চেষ্টা করল। শুধু তন্দুরী চিকেন, মাদ্রাজ কারি, প্রন কারি দিয়ে ক্ষান্ত হতে চাইল না। এ-দেশের তথাকথিত 'ভারতীয়' রেস্তোরাঁর একটা মজা আছে—তরকারি ঝোল, চিংড়ি মাছ, বা যে-কোনো মাংসের ঝোলের স্বাদ একেবারে এক—ঝোল একটু কম আর বেশি। মনে হবে বৃটেনে কোথাও একটা ফ্যাক্টরি আছে ঝোল বা কারি তৈরি করার—রিটেল সেলাররা যেন সেই ঝোল সব রেস্তোরাঁয় বিলি করে বেড়ায়। সেদ্ধ করা তরকারি, মাছ-মাংসে সেই ঝোল মিশিয়ে টেবিলে সাজিয়ে দিলেই বিদেশী আর কুঁড়ে এশিয়ানরা হাপুশ-হুপুশ করে খেয়ে বলবে, বাঃ, চমৎকার রান্না।

রোজমারী আর তস্সুদ্দুক সেণ্ট্রাল ফ্যাক্টরি বয়কট করে আদি অকৃত্রিম ভারতীয় বা বাঙালি খাবার দেবার চেষ্টা করতে লাগল নিজেদের কল্পনা মিশিয়ে। সেই সোহোর 'গঙ্গা'তেই মলি-দীপকের

সঙ্গে ওদের আলাপ। গ্রন বাটারফ্লাই বা চিংড়ি প্রজাপতি খেয়ে মলি মুগ্ধ। মলি উৎসাহে আলাপ জুড়ে দিল বাংলায়, খাবার পরে কফির সময়ে রোজমারী আর তসুদ্দুক এসে বসল ওদের টেবিলে।

এর পরে বহুবার দেখা হয়েছে, কোনো সময়ে ঘন ঘন, কোনো সময়ে অনেক দিন পরে। সোহোর লীজ শেষ হয়ে গেছে। সেই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা চলছে। ওরা উঠে এসে বসেছে অন্য অ-সোহো পাড়ায়, এখন প্যাডিংটন স্টেশনের কাছে 'গঙ্গা' সরু হয়ে বইছে। সেই বাড়িরই উপর তলায় ছাপা হচ্ছে ইংরেজি পাক্ষিক 'এশিয়ান'। তসুদ্দুক-রোজমারী এখনো বিশ্বাস করে বাঙালি ভাগ্যে, বাঙালি সংস্কৃতিতে, বাংলা ভাষায়। বুদ্ধিহীন বাঙালি হিন্দুরা ওকে বলে 'নেড়ে'। বাংলাদেশী মুসলমানরা নাক কুচকে ওকে বলে 'হিঁদু ঘেঁষা'। ওরা আরো বিশ্বাস করে এ দেশের এশিয়ান এবং কালোদের ভাগ্য এক, সংস্কৃতি আলাদা হতে পারে। বৃটিশ বন্ধুরা ওদের উৎসাহ দেয়। সাহেব টিচার ব্ল্যার পীচ কি সাউথ হলের ভারতীয় ডেমোতে শুধু শুধু পুলিশের হাতে মারা গেছে!

এতদিন পরেও তসুদ্দুক উত্তেজিত হয়ে ওঠে 'ব্ল্যার পীচ'-এর কথা উঠলে। নাৎসী পার্টির আরেক নাম 'ন্যাশনাল ফ্রণ্ট' হয়েছে এখন বৃটেনে। ওরা বলছে—কালোদের হঠাও! জ্যুদের হঠাও! বৃটেনকে পবিত্র শ্বেত-দেশ করা হোক আবার। তা না হলে বৃটেনে 'রক্ত-বন্যা' বইবে। ওরা ইলেকশন মিটিং করবে সাউথ হল-এর টাউন হলে। 'সাউথ হল' একেবারে খাঁটি ভারতীয় পাড়া। সিনেমায় হিন্দী ছবি দেখানো হয়—দোকানে পুরী, পাকোড়া, কুমড়ো, পটল, মশলা বিক্রি হয়। হঠাৎ এখানে এসে পড়লে মনে হবে পাঞ্জাবের কোনো বর্ধিষ্ণু শহরে বুঝি এসে পড়েছি। সাধারণের কাছেও অঞ্চলটি পরিচিত 'বৃটেনের জলন্ধর' নামে। সেই পাড়ায় ন্যাশনাল ফ্রণ্ট ঘোষণা করল ওরা ইলেকশন মিটিং করবে। বন্ধ করুক দেখি কালোরা। অ্যান্টি-নাৎসী লীগও বা ছাড়বে কেন! তারাও পাল্টা

ডেমনস্ট্রেশনের ঘোষণা করল। বিরাট সংঘর্ষের আশঙ্কায় সাধারণ পুলিশে হবে না ভেবে স্পেশাল পুলিশ জড় করা হল।

পরে পুলিশের বক্তব্য : অ্যান্টি-নাৎসী লীগ 'ডেমো' বোতল ছুঁড়তে শুরু করেছিল প্রথমে। আর অ্যান্টি-নাৎসী লীগ বলে এসেছে পুলিশরাই ওদের আগে পেটাতে শুরু করেছে।

ব্ল্যারপীচ্—নিউজিল্যাণ্ডের সায়েব টিচার সাউথ হলের এক পাড়ায় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরে গেল কি করে? 'ইন-কোয়েস্ট' হবে না—শেষে আন্দোলনের জোরে এনকয়ারি-কমিশন বসানো হল। রায় বেরুল : কেউ বা কোনো লোক 'ট্রাঞ্চন' অথবা 'ওয়াকী-টকী' দিয়ে জোরে ব্ল্যার পীচের মাথায় মেরেছে—আর সেই আঘাতেই তার মৃত্যু। কিন্তু সেই 'লোক' যে কে আদৌ তার সনাক্ত হল না। অথচ দলে দলে ভারতীয় তরুণদের জেলে পাঠাতে লাগল ম্যাজিস্ট্রেট। প্রমাণ কোথায় যে তারা দোষী—কি দোষ করেছে তারা। খবরের কাগজে এই ঘটনা নিয়ে তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। 'এশিয়ান' পত্রিকা রিপোর্ট ছাপল, সম্পাদকীয় লিখল। তস্নুদ্দুক টি. ভি.-তে চ্যালেঞ্জ করল : ব্ল্যার পীচের হত্যাকারীকে সনাক্ত করা গেল না, অথচ হাজার-হাজার মানুষের ডেমো থেকে কিছু ভারতীয় তরুণকে তুলে ধরে দাঙ্গাবাজ বলে সনাক্ত করা গেল কি করে? 'সাউথ হল'-এর মতো ভারতীয় পাড়ায় ন্যাশনাল ফ্রন্টকে মিটিং করতে দেওয়া হল কেন? কেন শ-য়ে শ-য়ে স্পেশাল পুলিশের পেট্রোল নিয়ে আসা হল প্রভোক্ করার জন্য? 'এশিয়ান' পত্রিকা প্রশ্ন করছে, তারা এর জবাব চায়।

মলি শনিবার থেকে যত্ন করে রান্না করে রাখল। ওদের খাইয়ে আনন্দ আছে, ওরা সোৎসাহে, সানন্দে খায়। মাঝে মাঝে রবি-বারের দুপুর ছাড়া ওদের ছুটি নেই—রেস্তোরাঁ চালাও, কাগজ চালাও, ব্রীক লেনে মিটিং কর, টেলিভিশনে প্রোগ্রাম কর, কত

দায়িত্ব, কত কাজ, তার ওপর বাড়ি ভর্তি বেড়াল।

তসুদ্দুককে দেখলে মনে হয় বর্ধিষ্ণু গ্রামের স্কুলের মাস্টার। মাথায় চুল হালকা হয়ে এসেছে! ভেবে চিন্তে কথা বলে। রোজমারীর মুখে সবসময় হাসি। মলির খুব জানতে ইচ্ছে করে রোজমারী কখনো রাগে কি না, রেগে গেলে ও রাগ নিয়ে কি করে? রান্না করে না জার্মান কম্পোজিটরে টকাটক হাত চালায়? ওরা ইংরেজি ভুলে গিয়ে বাংলায় কথা বলতে শুরু করলেও রোজমারী মনোযোগ দিয়ে শোনে।

ওরা খেতে খেতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি, কুমড়ো ফুলের ভাজা, কই মাছ, ইলিশ মাছ, ইঁচড়, মোচার গল্প করল। আম, রসোমালাই, পাতক্ষীর-বাঙালি খাওয়ার মতো খাওয়া আছে! বাংলাদেশে, পশ্চিম বাংলায়?

এই দেখ বাংলাদেশ শব্দটা তোমরা কেমন টুক করে নিয়ে পূর্ব বাংলায় লাগিয়ে দিয়েছ। দীপক হাসতে হাসতে বলল, সোনার বাংলা এখন কার?

তোমার আমার আমাদের। তসুদ্দুকও হেসে বলল। সোনার বাংলাই বটে!

জার্মান রোজমারীও হেসে বলল, পূর্ব আর পশ্চিম-জার্মান তো এক। রাজনীতিবিদরা যাই বলুক, যাই করুক না কেন। জন্ম আমার ইস্ট বার্লিনে, বড় হয়েছি পশ্চিম জার্মানীর স্টুটগার্টে, বিয়ে করেছি বাংলাদেশীকে, বাস করি বৃটেনে। আমি কে? কোথায় আমার দেহ একদিন ছাই হয়ে যাবে, কে জানে! রোজমারী হাসি মুখে বলল, যেন বলছে—ধোঁকাটা তোমার চমৎকার হয়েছে, কী ভাবে করলে!

সেই হিমালয় থেকে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী কত নদীর জন্ম, কত দেশ বেয়ে, দেশ ঘিরে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। আকাশে মেঘ হয়ে বর্ষা নামাচ্ছে—বিশাল আকাশ কার, উত্তাল সমুদ্র কার! তসুদ্দক

হাত টেবিলে রেখে বলল, সেই প্রশ্ন নিয়ে ঝগড়া, না কি উত্তর নিয়ে ঝগড়া !

সকালে খবরের কাগজ খুললেই, দীপক হাত নামিয়ে বলল, চোখে ধাঁধা লেগে যায়। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিম রায়ট, পোল্যাণ্ডে স্ট্রাইক, ফরাসী পোর্টে ফিশারম্যানদের ব্লকেড, বৃটেনে তু মিলিয়নের উপর বেকার হতে চলল, কোন দিকে কোথায় তাকাব।

নিজেকে কষ্ট দেবার জন্যে খবরের কাগজ পড়া। মলি গম্ভীর ভাবে বলল, সকালে উঠেই ঝুড়ি ঝুড়ি মিছে কথা কি করে যে তোমরা পড় আমি বুঝতে পারি না। তুমি আমি কি করতে পারি ?

আঃ, তস্সুদ্দুক মাস্টারমশাইয়ের ভঙ্গিতে অবুঝ ছাত্রীকে বোঝানোর মতো করে বলল, তুমি, আমি জলের বিন্দুর মতো। জলের বিন্দুই তো সমুদ্র। যত মিছে কথা চুপ করে সহ্য করবে, ততই মিছে কথা লোহার পাহাড় হয়ে তোমাকে পিষে মেরে ফেলবে। তা ছাড়া ঘটনাগুলো তো মিছে নয়, ঘটনাগুলো কোন পাতায় কী ভাবে সাজানো হচ্ছে, কোন ঘটনা জানানো হচ্ছে না পাবলিককে, সেই হল আসল কথা।

চা খাওয়া যাক। ভাল দার্জিলিং চা আছে। মলি উঠতে উঠতে বলল।

না, না, রোজমারী প্লেট গুছিয়ে প্লেট পরিষ্কার করতে যাবে, মলি বাধা দিয়ে বলল, তোমরা বসে গল্প কর, কিছু করতে হবে না। তোমার আজ তুপুরের মতো ছুটি।

দীপক মলিকে বলল, তুমি বস। আমি কফি করছি। না কি বললে চা ?

রোজমারী খুশি হয়ে ভাল করে বসে বলল, তপু, তনি কেমন আছে বল ? তপুর সঙ্গে প্রায় বছর তুয়েক দেখা হয় নি।

তপু তো এই ফিরে গেল। ওর বান্ধবী নিয়ে এসেছিল দিন

দশেক। মলি বলল যেন নিজেকে বোঝাবার জন্যে, দেখ আমরা কত উদার!

তনি আমাকে চিঠি লিখেছে, তসুদ্দুক বলল, কি না কি বই বার করতে চায় এশিয়ান ছেলেমেয়েদের উপর। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে তোমাদের।

মলি কৃতিত্বটা নিল পিছন ফিরে থাকা দীপককে দেখে নিয়ে। কোনো কথা বলল না।

তনি কবে ফিরছে?

এই তো সপ্তাহ দুই তিনের মধ্যে।

আমাকে ফোন করে চলে এস একদিন। তনির সঙ্গে বসে আলাপ করা দরকার।

তসুদ্দুক দু হাত জড়ো করে টেবিলের উপর রেখে বলল, আমাদের বন্ধু ডাঃ মহম্মদ আনোয়ার এশিয়ান ছেলেমেয়েদের নিয়ে রিসার্চ করছে। ওর লেখা পড়ে থাকবে।

হ্যাঁ, মলি ঢোক গিলে বলল, ছেলেমেয়েরা আর প্রাচীন প্রথা মানতে রাজি নয়, ঘরবাড়ি ছেড়ে নিজের মতো থাকছে, ইচ্ছেমতো বিয়ে করছে।

দীপক ফিরে এল কফি নিয়ে। মলি কিছু বলল না যে চা করার কথা ছিল। থমথমে মুখ।

মা-বাবাদের, মলি যেন নিজের মনেই বলল, ছেলেমেয়েরা আর পছন্দ করে না। এ দেশের এক কথা—'আমার জীবন আমার মতো' যেন জীবনগুলো আকাশ থেকে পড়েছে, দায় নেই, দায়িত্ব নেই, সমাজ নেই। মলি হঠাৎ চুপ করে গেল।

চিনি?

হ্যাঁ, এক চামচ!

দুধ?

না।

দীপক, তস্‌দুক বরফ ভেঙ্গে বলল, তুমি কি তনিকে নিয়ে খুব ভাবছ না কি ?

দীপক কফির কাপে চামচ দিয়ে চিনি নাড়তে লাগল, চিনি নয় তো যেন পাথর। চোখ না তুলেই বলল, তনি কলেজে ফিরে যেতে চায় না। আরো দু বছর চাকরি করবে। মেয়ে বাবা-মার পয়সা বাঁচাচ্ছে।

সে কি! কলেজে ফিরবে না তনি? এত বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়ে!

ফিরবে না বলে নি। আরো দু বছর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চায়। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। মলি দীপকের হাত থেকে চামচটা নিয়ে বলল, ভাল তো! রোজমারী বলে উঠল, ও বলতে গেলে নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছে, বাবা-হীন মা ওকে কলেজে পাঠাবার কথা ভাবতেই পারে নি। অনন্যোপায় হয়ে এসেছিল লণ্ডনে ইংরেজি শেখার জন্যে।

কিন্তু পড়াশুনো করে তবে তো নিজের পায়ে দাঁড়াবে? দীপক অস্থির হয়ে বলল, কলেজে গেলে 'পা' তো আর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না!

তস্‌দুক, রোজমারী যেন হঠাৎ বুঝতে পারল ওরা আর টেবিলের গল্প করছে না, গভীরতর দ্বন্দ্ব আর ব্যথা কফির কাপে ঢেউ হয়ে উঠছে। সেই ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে চারজনে কিছুক্ষণ থমকে থাকল।

দীপক, তস্‌দুক জড়ো করা হাত খুলে কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, তনি আজেবাজে ফুর্তিবাজ মেয়ে নয়, ও চিন্তা করে, ভাবে, ও জীবনকে কিছু দিতে চায়। তস্‌দুক আবার হাত জড়ো করে হাঁটুর উপর রাখল। এ দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েকে দেখ; ওরা শুধু নিতে চায়, দায়িত্ব নেই, দাবী আছে। তনি তো শুধু দাবী করছে না নিজের মতো করে বাঁচবে বলে, দায়িত্বও নিতে চাইছে। ও ফিরে আসলে তুমি ওর সঙ্গে কথা বল, বোঝাও।

বোঝাব! দীপক নিজের দুঃখকে ব্যঙ্গ করে যেন হাসল, তনি তো সব বুঝে বসে আছে। তর্কে মেয়ের সঙ্গে পারবে না। তনিই আমাকে এমন করে বোঝাবে যে, দীপক রাগের মধ্যেও গর্বের সুর ঢাকতে পারল না, যেন আমাদের প্রশ্ন তোলাটাই খুব অবিবেচকের কাজ হয়ে গেছে। আর প্যারিসে থেকে তো, তপুর মুখে যা শুনি ও আরো দুর্দান্ত ইনটেলেকচুয়েল হয়ে গেছে। রোজমারী হেসে বলল, এ যুগ তো শুনি, অ্যান্টি-ইনটেলেকচুয়েলদের যুগ।

কখন যে কি ঢেউ ওঠে ওরাই জানে। মলি হাসিতে যোগ দিয়ে বলল।" চল, বসার ঘরে গিয়ে বসি। দীপক বলল।

তসুদ্দুক ঘড়ি দেখে বলল, এবার আমরা আস্তে আস্তে উঠি। ফিরতে ফিরতে পাঁচটা বেজে যাবে। রেস্তোরাঁ খুলবে ছ-টায়।

কি করে যে তোমরা এত খাট আমি বুঝতে পারি না। মলি বলল।

সবই অভ্যাস। তসুদ্দুক উঠতে উঠতে বলে। তনি আসলে জানিও কিন্তু। তোমাদের ছেলেমেয়েরা চমৎকার হয়েছে! চমৎকার!

ওরা চলে গেলে মলি সোফায় পা তুলে বসল। দীপক বাসন মাজছে। ফোন বেজে উঠল। মলির চোখ সবে বুজে এসেছিল। সে একটু বিরক্ত হয়ে রিসিভারটা তুলে বলল, হ্যালো!

মলি? হ্যালো?

লুইসা? কোথায় তুমি?

লণ্ডনে। এক বন্ধুর বাড়িতে। মঙ্গলবার উগাণ্ডায় যাচ্ছি।

বাঃ, তোমার সঙ্গে দেখা হবে না!

কালকে কি করছ? কাল তো ব্যাঙ্ক হলিডে।

কিছু না। আসবে না কি?

ভাবছিলাম নটিং হিল গেট কার্নিভ্যাল দেখতে যাব। কি যাবে নাকি?

ধর। দীপককে জিগ্যেস করে নিই।

মলি দীপককে গিয়ে বলতেই ও রাজী হল। ঠিক করল কোথায় দেখা হবে, মার্বেল আর্চের সিনেমার সামনে।

তিনটের সময়। দীপক গাড়ি করে ওদের তুলে নেবে।

সতেরো

নটিং হিল গেটের অ্যাফ্রো-ক্যারাবিয়ান কার্নিভ্যাল। বছর তিনেক আগে খুব মারামারি হয়েছিল পুলিশে আর কার্নিভ্যালের লোকদের। পুলিশ কার্নিভ্যালকে দোষ দিয়েছে। কার্নিভ্যাল পুলিশকে দায়ী করেছে। এখনো যারা যায় তারা একটু আশঙ্কা নিয়ে যায়। ওরা গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে হল্যাণ্ড পার্ক মিউজে গাড়ি রেখে পোর্টাবেলা রোড-এর দিকে হেঁটে চলল।

হল্যাণ্ড পার্ক এক জগৎ—পাশাপাশি নটিং হিল গেট আর এক জগৎ। হল্যাণ্ড পার্কের বাড়িগুলো আভিজাত্যে প্রাচীন, গম্ভীর সাদা ঝকঝকে। নটিং হিল-এর বাড়ীগুলোও প্রাচীন, কিন্তু দারিদ্র্যে ধোঁয়াটে কুৎসিৎ। কালোদের আর উচ্ছন্ন সাদাদের 'ঘেটো'—নটিং হিল গেট।

দলে দলে লোক চলেছে। রাস্তার দুপাশে গাড়ি ঠাসা, পাড়ার ভেতরে চারদিন ধরে গাড়ি চলাচল বন্ধ। রাস্তার দু ধারে বিয়ার আর কোক-এর টিন গড়াগড়ি যাচ্ছে। নোংরা কাগজের টুকরো আর ক্রীসপ্-এর ব্যাগ। আগস্টের সূর্য নম্রভাবে গরম। সবার মুখে হাসি হাসি ভাব, কৌতূহল, আকাঙ্ক্ষা, কি একটা আশ্চর্য ব্যাপারে যেন ওরা দল বেঁধে মজা দেখতে, মজা করতে যাচ্ছে। দুর্গাপুজোর প্যাণ্ডেল দেখতে যাওয়ার মতো। লণ্ডন যেন মুখে ঢাকা কাগজ ফেলে দিয়ে পিন স্ট্রাইপ স্যুট আর বোলার হ্যাট ঘরে রেখে এসে রঙ বেরঙে সেজে রাস্তায় নেমে পড়েছে নাচবে বলে। সাদা, কালো মেশানো ছেলেমেয়েরা, আফ্রিকান,

ক্যারাবিয়ান, সাদা বৃটিশ, পর্যটক (ক্যামেরা নিয়ে), পুলিশ (দুচারটে কালো আর নারী পুলিশ) ভিড় করে হাঁটছে। ভারতীয়দের বড় একটা দেখা যায় না। ওরা আসে না কেন— গোলমালে পড়ে যাবার ভয়ে, না, ওরা যে কালো নয় ব্রাউন সেটা প্রমাণ করার জন্যে কে জানে!

আঃ! শোনা যাচ্ছে যন্ত্র সঙ্গীত, ফ্লোট আসছে, বিরাট লরীতে জ্যাজ ব্যাণ্ড বাজছে, নাচ হচ্ছে লরীতেই। লরীর সামনে ছেলে-মেয়েরা মধ্যরাতের ডাকাত সেজে (midnight robbers) রাস্তায় নাচতে নাচতে আসছে। মেয়েদের উৎসাহ বেশি। মলি আর লুইসা হনহনিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। লুইসার বন্ধু টমাস আর দীপক পিছনে পিছনে চলেছে। অন্য রাস্তায় চল অন্য ফ্লোট দেখতে। রাস্তার ধারে ডিসকো হচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে কত রকমের খাবার। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান সিঙ্গাড়া। মলি তিনটে কিনল। দীপক খাবে না। এক একটার দাম পঞ্চাশ পেনি। গরম রুটি, পোলাও, মাংস, আইসক্রিম, ঠাণ্ডা বিয়ার, কোক, ক্যারাবিয়ান কায়দায় মাছ ভাজা বিক্রি হচ্ছে। ওরা দেখল সূর্য ফ্লোট, অ্যারাবিয়ান ফ্লোট। দেখল জিয়াস-এর সন্তান ফ্লোট, একজন পুরুষ মেয়ের বেশ পরে নাচছে, ক্যাথিটারে যেন পেচ্ছাবের বোতল হাতে করে। ও পেছন ফিরে ঝুঁকতেই, আরেকজন, ওর লম্বা স্কার্ট তুলে, জাঙ্গিয়া নামিয়ে দিল, কালো পশ্চাৎদেশ চকচক করে ধরা পড়ল পর্যটকের ক্যামেরায়। একজন সাদা পুলিশ বিয়ারে বুঁদ হয়ে এক কালো মেয়ের সঙ্গে নেচে নেচে আসছে। স্যার রবার্ট মার্কস, মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার বুক ঠুকে বলতে পারবে, দেখ আমার পুলিশ ফোর্স কী রকম সাধারণ কালোদের সঙ্গে 'ইনটিগ্রেট' করছে। একজন লম্বা চওড়া সুন্দরী আফ্রিকান মহিলা দু হাত তুলে নাচছে, আর বলছে, আধ বোজা চোখে, আনন্দ কর। আজকে আনন্দ কর। ওর ডাকেই বোধকরি, এক চলতি সাদা পুরুষ দু-হাত দিয়ে মহিলার দুই

স্তন ভাল করে উল্লে দিয়ে ভিড়ে মিশে গেল। সেই সুন্দরী কালো মহিলা স্বাভাবিক মাধুর্যে ওর দীর্ঘ পুরন্ত দেহ নিয়ে নাচতে নাচতে আধবোজা চোখে একই ভাবে বলে চলল, আনন্দ কর। আনন্দ কর আজকে।

মলির বুকটা একটু চমকে উঠল। এ কী রকম অসভ্য আনন্দ করা! ওর পাশে লুইসা, কাছেই দীপক আর টমাস, ও নিজের মনেই ভান করল যেন ও দেখে ফেলে নি এই অসভ্য আনন্দ করা। যাকগে, লণ্ডনের ভিড় পূজা প্যাণ্ডেল নয়, মেয়েদের দেহ সামলাতে সজাগ ব্যস্ত হতে হয় না, কে কোথায় অ-জায়গায়, কু-জায়গায় ভিড়ে লোভী চোরের কুৎসিৎ হাতে চিমটি কেটে যাবে। কিন্তু সাবধান হ্যাণ্ডব্যাগ, ছিনতাই আর পকেটমার আশেপাশেই আছে।

অনেক হয়েছে। এবার চল। অনেক দোকান কাঁচের শো কেস কার্ডবোর্ড দিয়ে ঢেকে রেখেছে। মাতলামী আনন্দ কখন কদর্য বোতল ছোঁড়াছুঁড়িতে লুটপাটে শেষ হয় কিছুই বলা যায় না।

ওরা বড় রাস্তায় বেরিয়ে এসে একটা পাবে ঢুকল হল্যাণ্ড পার্কে। বসে কী আরাম! ঘণ্টা তিন চার ধরে হাঁটা আর দাঁড়ানো—পা একেবারে ধরে গেছে। লুইসা নিল হুইস্কি, টমাস বিয়ার আর হুইস্কি এক সঙ্গে, দীপক নিল বিয়ার, মলি নিল ড্রাই মার্টিনী, অনেক বরফ দিয়ে। গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

কোনো মানে হয়! ষোল বছর ধরে এ কার্নিভ্যাল চলছে, আর আমি এই প্রথম এলাম! লুইসা হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল আফশোষ করে।

আমি তো প্রতি বছরই আসি। টমাসের নাইজেরিয়ান স্ত্রী, সবে বাচ্চা হয়েছে তাই আসতে পারে নি ওদের সঙ্গে। এ কার্নিভ্যাল যেন অন্য দেশের! লুইসা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আমার ইচ্ছা করছিল নাচতে নেমে পড়ি। জুবিলীর সময় রাস্তায় রাস্তায়

ফাংশন হয়েছে, কিন্তু এর সঙ্গে তুলনা হয় না। ওদের দেহে যেন নাচের অলস তরঙ্গ।

আরো বল কেমন জাতীয় সমন্বয় হচ্ছে। টমাস এক ঢোকে বিয়ারের জাগ খালি করে হাতের পিঠে মুখ মুছে বলল, এনক পাওয়েল শুধু শুধু রক্তবন্যার কথা বলে। ব্ল্যার পীচ তো সাউথ হলে পুলিশের ট্রানচনে মরে নি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজে নিজে মরে গেছে।

লেট আস ড্রিঙ্ক টু জাস্ট সোসাইটি অফ গ্রেট-বৃটেন!

তুমি বেশ তিক্ত আছ তো! মলি থাকতে না পেরে বলল।

ভণ্ডামি আমার সহ্য হয় না!

ভণ্ডামি কোন দেশেই বা নেই বল? দীপক জানতে চাইল।

নাইজেরিয়াতে এ রকম ভণ্ডামি নেই। টমাস বলল।

তবে নাইজেরিয়ায় গিয়ে থাক না কেন? লুইসা রাগ করে বলল।

যাব তো। ফাইন্যালটা পাশ করলেই যাব।

কি পড়ছ তুমি?

চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টেন্সি।

হ্যাঁ, বড়লোকদের ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকির অন্দিসন্দি ও সব জানে।

টমাস হো হো করে হেসে উঠল, কে কথা বলছে? কত প্রশ্ন, বাড়ি বিক্রি করে, কি করে কত কম ট্যাক্স দেওয়া যায়! কে জানতে চাইছিল?

বাঃ, সে জন্যেই তো তোমার সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব করেছি।

ভাগ্যিস বাড়ি বিক্রি করেছ! টমাস ভালবাসার চোখে হাসতে হাসতে বলল। বৃটেন একটা আজব জায়গা হয়েছে। টমাসই বলল আবার, আমাদের দেশে তেল থৈ থৈ করছে, তবু আমরা তেল কিনছি প্রায় দেড় পাউণ্ড গ্যালনে। টাকা নেই,

টাকা নেই! ফ্যাক্টরীর পর ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কার দোষ—ওয়ার্লর্ড রিসেশন। শ্রমিকরা কাজ করে না, মাইনে বেশি চায়। দেশপ্রেম চুলোয় গেছে। জাপানী গাড়ি, হংকং-কোরিয়ার শার্ট, ইটালীর জুতো, ফরাসী আপেল, জার্মান ওয়াইন, যা বিদেশী তাই চমৎকার! আসুক ইলেকশন, ম্যাগি থ্যাচার তেলের জমানো টাকা ছাড়তে শুরু করবে, মাইনে বাড়বে, ইনকাম ট্যাক্স কমবে, লুইসা তুমি বড় তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ। আমি আপেক্ষা করছি। ইলেকশন ইয়ারে টোরী ভোজবাজীর পরে নাইজেরিয়ায় যাব। তামাশাটা দেখে তারপরে যাব।

তুমি দেখ। তোমার অ্যাকাউন্টেন্সি মাথা নিয়ে। আমি তো ঘুরে আসি।

তুমি চেন কাউকে ওখানে? মলি জিগ্যেস করল।

না। টমাস আর ক্লারা কিছু নাম-ঠিকানা দিয়েছে।

তোমার ভয় করছে না? মলি তাও জানতে চাইল।

ভয়? লুইসা ভুরু কুঁচকে বলল, না, ভয়ের কথা মনে আসে নি। আবার নতুন জীবন, নতুন গাছপালা, নতুন বন্ধু, মধ্যবয়সে আমাকে অল্পবয়সী অ্যাডভেন্‌চারে পেয়েছে। দেশ তো আছেই। মন কেমন করলে চলে আসব।

অ্যাটম বোমা পড়ে সব নিঃশেষ না হয়ে গেলে, বাচ্চা তো হতেই থাকবে প্রকৃতির নিয়মে, লুইসার হেল্‌থ ভিজিটারের চাকরিও তোলা থাকবে। টমাস বলল।

এবার উঠতে হয়। লুইসা বলল। আমার এখনো প্যাক করা বাকি আছে। কাল সকালে প্লেন।

লুইসা আর দীপক পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল।

রাণার চিঠি পেয়েছ?

না। লুইসা ছোট্ট করে বলল, তুমি পেয়েছ?

হ্যাঁ।

চুপচাপ।

লিখেছে ভাল আছে। দেশের সমস্যা নিয়ে খুব চিন্তিত। দীপক চুপ করে গেল।

আমার কথা নিশ্চয়ই কিছু লেখে নি ?

না। দীপক অপরাধীর মতো উত্তর দিল। কিন্তু এখানকার সবার কথা জানতে চেয়েছে। তার মানে যেন তোমার কথাও লিখি।

লুইসা হাঁটতে হাঁটতেই দীপকের হাত হাতে তুলে নিয়ে বলল, আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?

পারলে নিশ্চয়ই রাখব।

বল রাখবে। না পারার মতো কোনো অনুরোধ আমি করব না।

রাখব।

লুইসা হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, আমার নাম কোনো দিনও ওর কাছে উচ্চারণ কোরো না।

তোমার সঙ্গে যদি যোগাযোগ করতে চায় ?

আমার মা-বাবার ঠিকানা ও জানে। আমার খোঁজ ওখানেই পাবে।

চুপচাপ।

তুমি কি খুব তিক্ত মন নিয়ে দেশ ছাড়ছ লুইসা ?

না দীপক। লুইসা একটু হেসে বলল, এক হাতে তালি বাজে না। দু জন দু জনকে শাস্তি দেবার জন্য বিয়ে করেছিলাম। আমরা দু জনেই মুক্ত হয়েছি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এত গভীর অথচ এত ঠুনকো ভাবলে মনে বিষাদ আসে, এই যা।

চিঠি দিও।

দেব। কিন্তু আমার অনুরোধ ভুলে যেও না।

ওরা রেড লাইটে রাস্তা পার হল। কিছু দরকার হলে জানাবে তো ? দীপক বলল।

জানাব দীপক। এ দেশে দু-চার জন বন্ধুর মধ্যে তুমিও একজন। লুইসা হেসে ফেলে বলল, রাণার ভয়ে কোনোদিনও তোমার সঙ্গে একা গল্প করার সুযোগ না হলেও আমি জানতাম তুমি আর মলি আমাদের দু-জনেরই বন্ধু।

এস গাড়ি এসে গেছে।

ওরা গাড়িতে বসে গাড়ির রেডিওতে শুনল, আজকে চল্লিশ হাজার লোক নটিংহিল গেট কার্নিভ্যালে গেছে। শান্তিপূর্ণ আনন্দ। কিছু মাতাল আর কিছু পিক-পকেট অ্যারেস্টেড হয়েছে।

টমাস আর লুইসা বিদায় নিল বেকার স্ট্রিটে।

কি ভাবছ ?

বেচারা লুইসা !

বেচারা লুইসা।

বেচারা কেন ? দীপক আপত্তি করল।

এ বয়সে আফ্রিকার কোন জঙ্গলে যাবে। এমন স্বামী-ঘরবাড়ি, গাড়ি। সব গেল।

দীপকের হঠাৎ মনে হল মলি যে এত খেলো তা তো সে জানত না ! সে বিরক্তি চাপা দিয়ে বলল, মলিনা, কোন বয়সের কথা তুমি বলছ আমি বুঝতে পারছি না। লুইসার মনের জোর আছে, যতদিন সে খেটে খেতে পারবে ততদিন ওর জন্যে দুঃখ করার কিছু নেই। রাণা বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। ও না চলে গেলে লুইসা ওকে ছেড়ে চলে যেত।

তোমাকে বলেছে লুইসা ?

সব কথা কি বলতে হয় বোঝার জন্যে ?

এতক্ষণ তোমরা এ-সব কথা বলছিলে ?

কিছুটা।

তুমি আমার উপর রাগ করছ কেন ?

তুমি সবাইকে একমূল্যে যাচাই করতে চাইছ বলে। ঘরবাড়ি গাড়ি, স্বামী—যেন সম্পত্তি গেলেই মানুষ গরীব হয়ে যায়! দীপক রাস্তায় চোখ রেখে স্টিয়ারিং ধরে বলল।

বলছ কি তুমি? মলি এবারে রাগ করে বলল, আমি যদি কালকে মরে যাই, ঘর-বাড়িতে আগুন জ্বলে যায়, তোমার অবস্থাটা কি হবে?

দীপক এক হাত স্টিয়ারিং থেকে সরিয়ে মলির হাত রগড়ে বলল, বললাম যে সবাইকে এক মূল্যে যাচাই করো না। আমি শুধু গরীব হয়ে যাব না, দীপক হেসে বলল, আমি উন্মাদ হয়ে যাব।

সত্যি বলছ? মলিও এবারে হেসে বলল, আমি মরে গেলে, না ঘরবাড়ি পুড়ে গেলে?

দীপক উত্তর দিল না।

কই বললে না তো?

নাই বা বললাম।

বেশ। তুমি আমাকে সত্যিই ভালবাস না?

অন্য কাউকে তো কোনোদিনও ভালবাসি নি, সুতরাং তোমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসি।

কেন তোমার সেই বৌদি? পিসতুতো না মাসতুতো?

সে তো আমাকে সিডিউস করেছিল। যৌন ভালবাসা। অপরাধী প্যাশন।

দীপক বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করতে করতে বলল, কি আজকে রাজি আছ?

যৌনতা না ভালবাসা?

দুটোই।

দেখা যাক। মলি মুখ টিপে গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

ঘরে ঢুকে মলি বলল, খাওয়া দাওয়ার কি হবে?

থাক না হয় এখন। এস।

মলি একটু অবাক হল, কিন্তু আপত্তি করল না।

ভালবাসার পর ওরা গল্প করল অনেকক্ষণ ধরে সসেজ, রুটি আর চা খেতে খেতে। লুইসার কথা। টমাসের গল্প।

টমাসের উপর আমার রাগ হচ্ছিল। মলি বলল, নিজের দেশকে নালাতে ফেলে ও যেন লাথি মারছিল। ইংলণ্ডের সব কিছু তো খারাপ নয়?

তুমি বেশ ইংরেজ ভক্ত আছ।

বাঃ, এ দেশের মাটিতে আছি, নুন জল খাচ্ছি, সব কি খারাপ হতে পারে? সব দেশেরই তো দোষ গুণ আছে।

কি চুপচাপ যে। তনির কথা ভাবছ?

হ্যাঁ। দীপক মলিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলল, এত বুদ্ধিমতী মেয়েটা জীবনটা নষ্ট করে ফেলতে পারে ভাবলে আমার অস্থির লাগে।

জানি। কিন্তু নষ্ট তো নাও করতে পারে। এক বছর তো চলেই গেল। আরো দু বছরও যাবে।

তারপরে যদি পড়ায় মন না বসে? এ দেশেও তো আজকাল ডিগ্রি নিয়েও লোকেরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে চাকরি পেতে!

মলি আবার বলল একটু চুপচাপ থেকে, দেখ। তনিকে তুমিও চেন না! একদিন আমরা গর্ব করে বলব তনি আমাদের মেয়ে।

হুঁ।

চুপচাপ।

জান একটা কথা?

বল।

আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছিলাম, মলি দীপকের খালি বুকে আঁচড় কাটতে কাটতে বলল, তপু তনি চলে যাওয়ার পর আমরা যেন আবার কাছাকাছি এসেছি।

দীপক মলিকে জড়িয়ে ধরল। কথা বলল না। মলি দেখতে পেল না দীপকের চোখে জল টলটল করছে।

শোন।

হুঁ।

তপু তো চলেই গেছে। তনিকে আমি কোনদিনও কাছে পাই নি।

জানি।

এবার আসলে মনে হয় ভাল হবে।

তনি তোমাকে কি লিখেছে দেখালে না তো!

ওঃ! মলি তাড়াতাড়ি বলল, অফিস থেকে চিঠিটা আনতে ভুলে যাই।

নিচে রাখা হ্যাণ্ডব্যাগেই তনির চিঠি গোঁজা আছে অনেক জঞ্জালের মধ্যে।

ময়লা।

হুঁ।

তুমি তনিকে ভালবাসতে পারবে?

পারব। এবারে পারব। মলি নিঃশ্বাস ফেলে বলল।

আমার থেকে পালিয়ে যেও না কিন্তু।

তুমিই তো তনিকে পেলে সব কিছু ভুলে যাবে।

ভয় নেই। তনিই পালিয়ে যাচ্ছে।

ফোন বেজে উঠল।

ধরতে হবে না। দীপক বলল।

বাঃ, মলি তাড়াতাড়ি শাড়ি দিয়ে গা ঢাকতে ঢাকতে বলল, যদি তপু বা তনি হয়?

হ্যালো।···ও তপু!···

কি আর করব। মলি দীপকের দিকে না তাকিয়ে বলল, টেলিভিশন দেখছিলাম।···

কি হচ্ছে ?   ঐ আজে বাজে।

মলি টি ভি-র ধোঁয়াটে কাঁচে চোখ রেখে বলল।

···দাঁড়াও ডেকে দিচ্ছি বাবাকে।

মলি তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেল ধরা পড়ে যাওয়ার মতো করে। যেন তপু ফোনের ভিতর থেকে দেখে ফেলবে মা-বাবা নগ্নদেহে জড়াজড়ি করে গল্প করছিল।

ডিক একদিন এসে হাজির ওর অ্যাফ্রো-হ্যাংস্টাইল নিয়ে। সঙ্গে ইংরেজ বন্ধু মাইক।

কবে আসছে ?   তনির জন্যে পার্টি দেব আমরা।

এই তো পরের শনিবারেই আসবে বলে লিখেছে।

প্লিজ, মলি তাড়াতাড়ি বলল, এই সপ্তাহটা ছেড়ে দাও। এর পরের শনিবার তনির জন্যে পার্টি দিও।   আচ্ছা।

মাদাম যা বলবে তাই হবে। ডিক অসংখ্য টিকির মতো বিনুনির শেষে রঙিন পুঁতি দুলিয়ে বলল।

মাদামের আপত্তি আছে আমি যদি শনিবার দিন শুধু 'হাই' করতে আসি।

এস। দীপকই বলল, ওরা গাড়িতে আসছে। লিখেছে—স্ট্রাইক এড়িয়ে অন্য পোর্ট থেকে আসবে। ইংলণ্ডে পৌঁছে আমাকে ফোন করে দেবে।

ঠিক আছে স্যার। আমি শনিবার দিন ফোন করব। চললাম।

একটু বস। বিয়ার খেয়ে যাও।

না। শনিবারের জন্যে তোলা থাকল। চিয়ারস!

বাই বাই।

অদ্ভুত ব্যপার সব আজকাল, মলি বিরক্ত হাসি হেসে বলল, মাইক নিশ্চয়ই ওর বয়-ফ্রেণ্ড।

হতে পারে।

মাদাম, স্যার, কথা শোন! তনি বন্ধুও জোটায় বাবা!

সত্যি! ডিক শুনলাম অক্সফোর্ডে যাচ্ছে। ডিক যদি তনির মন ঘোরাতে পারে!

লোকেরা যে হোমোসেকস্যুয়েল হয় কি করে আমি এখনো বুঝলাম না।

দীপক হাসতে লাগল। ও বলল, কিছুদিন আগেও এই মনের অবস্থাকে রোগ বলে ধরা হত। তারও আগে অপরাধী বলে ওদের জেলে পুরত। এখন ওরা বুক ফুলিয়ে মাইনরটি রাইট চাইছে। দীপক টি. ভি. চালিয়ে দিয়ে বলল। গে লিবারেশন।

ঐ চুল নিয়ে অক্সফোর্ড ওকে ঢুকতে দেবে?

কে জানে? আসলে জিগ্যেস কোরো। আমারও কৌতূহল আছে।

দীপক বসতে বসতে বলল, কালকে বৃহস্পতিবার, আটটা পর্যন্ত দোকান খোলা আছে। চল বাজার সেরে আসব।

লিস্ট করতে বলছ, তনি কি কি খেতে ভালবাসে?

করই না।

তোমার মনে আছে?

আছে। দীপকের যেন বয়স কমে গেছে, ওর সমস্ত দেহে, মুখে তারুণ্যের আনন্দ, হাসি।

তনি আসছে!

তপু কবে আসবে বলল?

শনিবার রাত্রে ফোন করবে বলছে। সুজান কাল চলে যাচ্ছে।

ওঃ।

কি নিশ্চিন্দি!

আবার কাকে বান্ধবী করবে দেখ।

এখন করে নিক। একবার বিয়ে করলেই তো হয়ে গেল।

এ যুগে কোনো সময়েই আর 'হয়ে যায়' না। কোনো যুগেই বোধকরি যেত না।

দীপক টি. ভি. দেখতে দেখতে বলল, এখন এরা খোলাখুলি কথা বলে, খোলাখুলি যা খুশি করে—এই যা তফাত।

হুঁ! চা খাবে না কি?

একটু কফি খেতে পারি। এস কফি খেতে খেতে লিস্ট করি।

টি. ভি. চলতে লাগল। তনি কি কি ভালবাসে—তার খাবার লিস্ট, সেই অনুযায়ী বাজার হবে।

সেপ্টেম্বরে যেন গ্রীষ্মকাল ফিরে এসেছে। চনচনে রোদ। দিনের আলো আটটাতে চলে যাচ্ছে এখন। অটম আসছে, পাতা হলুদ হয়ে ঝরতে থাকবে, হাওয়ায় পাতার পিছনে পাতা ছুটবে রাস্তায় রাস্তায়।

তনি আসছে!

সময় যেন কাটতে চায় না। ঘর বাড়ি পরিষ্কার কর। রান্না কর।

তনি কি ভালবাসে খেতে, এখনো কি ভালবাসবে? গ্রীক পিতা, আঙুরের রসের শুজুক, হেজেলনাট চকলেট, ভ্যানিলা আইসক্রিম, চানাচুর, আম, পাঠকের লেবুর চাটনী, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান চিলি সস। যদি ফরাসী চীজ খেতে ভালবাসে, যাও আবার নিয়ে এস। ও কোক। তনি কোক খাবার যম। মিশেল আবার কি খাবে? ফরাসী ওয়াইন? এক বোতল নিয়ে এসে রাখা যাক।

শনিবার। দীপকের ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে মলিকে না জাগিয়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। বাগান থেকে গোলাপ কেটে ফুলদানীতে সাজিয়ে তনির ঘরে রেখে এল। শিশির পড়ে ফুলগুলো চকচক করছে, টকটকে লাল, গোলাপী, হলদে, বেগুনী গোলাপ ফুল। তনি ধূপের গন্ধ পছন্দ করে। দীপক চন্দন কাঠি

কিনে এনেছে। একটা জ্বালিয়ে দিল। ঘরটা সুগন্ধ হয়ে থাকবে।

নিচে নেমে এসে সে চা করল। খবরের কাগজ এখনো আসে নি কেন আজকে? ও ট্রানজিস্টার খুলে দিল, পোলিশ মাইনাররা কাজে ফিরে যাচ্ছে দাবি আদায় করে। ইউর্কশায়ারের মাইনার স্কারগীল থ্যাচারের এম্পলয়মেণ্ট বিলকে চ্যালেঞ্জ করেছে।··· আজকের দিন ভাল যাবে। প্লেন ঠিক সময়ে ছাড়ছে। সি লিঙ্ক ঠিকমতো চলছে। দীপক ট্রানজিস্টার বন্ধ করে দিল। সব ঠিক আছে। তনির পৌঁছুতে অসুবিধা হবে না।

কাগজ এসেছে? দীপক আবার উঠল। অনেক দিন পরে হঠাৎ সেই বুকের ব্যথা ওকে প্রায় ধাক্কা মেরে সোফায় বসিয়ে দিল। আজকে কেন ব্যথা হবে? আজকে তো তনি আসছে! দীপক বুকে হাত রেখে একটুক্ষণ বসল। কেন?

তনির কিছু হয় নি তো? কি সে বোকার মতো আবোল তাবোল ভাবছে। কালকেও তো তনির কার্ড এসেছে। সব ভাল আছে।

দীপক আস্তে আস্তে উঠে খবরের কাগজ নিয়ে এল। শুধু সে দেখল বড় বড় অক্ষরে লেখা 'গারডিয়ন'—আর যেন সে কিছুই চোখে ধরতে পারল না। অসুস্থ গ্যেরেক ক্ষমতাচ্যুত। কে গ্যেরেক? ওর চোখ ভরে শুধু তনি। সেই ছোট্ট তনি, সকাল বেলা উঠে গুটি গুটি বাবার কোলে এসে বসছে।

বাবা পরীর গল্প পড়ছ?

না, রাক্ষসদের গল্প পড়ছি।

সেই রাবণের মতন?

হ্যাঁ গো মা! দীপক চোখ না সরিয়েই তনিকে বুকে জড়িয়ে বলত, অনেক রাক্ষস হয়েছে আজকাল পৃথিবীতে। রাবণের চেয়েও পাজী রাক্ষস।

রাক্ষসদের মারবে কে? বাবা বল না।

আঃ, তুমি আমাকে একটু কাগজও পড়তে দেবে না? তোমার খাতাটা নিয়ে এস না। ছবি আঁক!

রাবণের ছবি?

যা তোমার মন চায়।

বাবা।

কি মা?

তুমি আমাকে মা বলে ডাক কেন? মাকে তো মা বলে ডাক না?

তুমি যে আমারই মা।

বাবা।

উঁ।

এরোপ্লেন কত দূরে যায়?

অনেক দূরে।

কত দূরে?

হাজার হাজার মাইল দূরে।

রিজেণ্ট পার্ক জ্যু-তে যায়?

হুঁ। না।

কেন?

রিজেণ্ট পার্ক তো খুব কাছে?

খুব কাছে যেতে পারে না কেন?

তপুকে জিগ্যেস কর।

তপু মার সঙ্গে গল্প করছে।

আমাকে দয়াকরে একটু কাগজ পড়তে দেবে?

দেব। ···বাবা!

উঁ।

আমি তোমার কোলে এসে বসব?

এস। দীপক কাগজ নামিয়ে বলল হয়তো, মেয়েকে কোলে

তুলে, মা ডাকছে। যাও, স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেছে।

তুমি জামা পরিয়ে দেবে ?

না, মা দেবে।

তুমি দেবে।

তনি! দীপককে শুধু একবার গম্ভীরভাবে চশমা নিয়ে তাকাতে হত।

মলিও আজকে সকাল সকাল উঠে নেমে এসেছে।

দোকান খুললে তুমি একটু কিসমিস এনে রেখো। তনি পোলাও খেতে ভালবাসে। কই, কি ভাবছ তুমি ?

কি ভাবব ? কাগজ পড়ছি তো!

যাই আমি চা খেয়ে স্নানটান করে নিই। তারপরে রান্না চাপাব। তুমি আর চা নেবে নাকি ?

হুঁ। দীপক হঠাৎ বলল, তুমি আজকে শাড়ি পর, কেমন ?

কি বললে ? মলি রান্নাঘর থেকে জানতে চাইল।

কিছু না!

মলি নিজের মনেই কথা বলে চলল, তপুটা আসলে আজকে কত ভাল লাগত। ওঃ আবার মিশেল আসবে! এ বাড়িতে নিজের মতো করে থাকার উপায় নেই। সব সময় কেউ না কেউ আসছে, আসতে চাইছে। শুনছ ? ক্যাথি আসতে চেয়েছিল, আমি বারণ করে দিয়েছি। এতদিন পরে মেয়ে বাড়ি ফিরছে। কেমন দেখতে হয়েছে তনি কে জানে! প্যারিস তো ফ্যাশানের রাজত্ব। ওরা কি সুন্দর মেকআপ করে, মনে হয় ন্যাচারেল। তনির থেকে শিখে নিতে হবে।

দীপক কাগজ পড়তে পড়তে ভাবল, মলি এত কথা বলে কেন ? দীপক কাগজ ফেলে দিয়ে বাগানে বেরিয়ে এল দরজা খোলা রেখে। ফোন বাজলে শুনতে পাবে। দীপকের ভীষণ ইচ্ছা করছে

নিজের মনে একা একা কিছুক্ষণ থাকে। ভাল লাগছে না মলির বকর বকর। বাগানেও কি শান্তি আছে! দিনটা ভাল। পাশের বাগানে সারা গ্রীক পরিবার তিনটে বাচ্চা নিয়ে বাগানের টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে আর নিজেদের ভাষায় অনবরত কথা বলে চলেছে। কে কার কথা শুনছে কে জানে!

চা রেখে গেলাম। মলি ডেকে বলল।

দীপক না শোনার ভান করল। দীপক মুখ ফিরিয়ে নিল, ভাবল ওরা এত খায় কেন?

আমার হয়েছে কি? দীপক নিজেকেই বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করল, সবাইকে, সব কিছুকে এত খারাপ দেখছি কেন?

দীপক মুখ তুলে আকাশ দেখল—দেশের শরৎকালের মতো প্রায় আকাশ, একটা সুন্দর দিন কুঁড়ির মতো ফুটে উঠেছে।

ফোন বাজছে।

দীপক প্রায় ছুটে গেল।

হ্যালো হ্যালো।

বাবা!

তনি!

আমি ডোভার থেকে ফোন করছি। চা খেয়েই রওনা দেব। বেলা দেড়টার মধ্যে পৌঁছে যাব।

মিশেলকে ড্রাইভ করতে দিও।

বাবা!

সাবধানে গাড়ি চালিও। দীপক তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল।

বাবা। আমার ভীষণ ভাল লাগছে বাড়ি ফিরে আসছি বলে। তোমাকে আজ সারারাত ইয়োরোপ ট্যুরের গল্প বলব। বাবা শোন—

পিপ্-পিপ্—

তনি। তনি নম্বর বল, আমি ফোন করছি। কত নম্বর বল—

দীপক রিসিভার হাতে বোকা হয়ে গেল, লাইন কেটে গেছে। তনি কি বলতে যাচ্ছিল? বাবা শোন—

তপু ছোটবেলায় ভেঙ্গাত ওর বোনকে, বাবা শোন। বাবা শোন—যেন আর কারুর বাবা নেই।

দীপক রিসিভার রেখে সোফায় বসল, চায়ে চুমুক দিয়ে কাগজ তুলে নিল। অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে আজকে।

বাবা শোন—

বাবা শোন—আমি এখন বড় হয়ে গিয়েছি। আমি আর তোমার কোলে বসব না।

দীপক হাসতে হাসতে বলেছিল মলিকে। মলি গম্ভীর মুখে বলেছিল, ওর পিরিয়ড আরম্ভ হয়ে গেছে।

কি এইটুকু মেয়ের?

তুমি ডাক্তার হয়ে এইটুকু বলছ? ও এগারো বছরে পড়ল। এ দেশে—

ওঃ! দীপক মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বাবা শোন, আমি জোসেফিন-এর জন্মদিনের পার্টিতে যাব কালকে। আচ্ছা।

ঠিক আছে আমি পৌঁছে দেব।

না, না—আমি বড় হয়েছি না? নিজেই যাব। ঐ দুটো রাস্তা পরে তো ওদের বাড়ি।

আমি তুলে আনব। আটটার সময়।

আটটা! আটটাতে তো শুরুই হবে পার্টি।

তোমার বয়স কত?

বারো-তেরোতে পড়ব। আমাকে অন্তত দশটা পর্যন্ত থাকতে দাও।

মাকে জিগ্যেস কর গিয়ে।

তুমি জিগ্যেস কর গিয়ে।

তনি! দীপক সেই চশমাভরা চোখে বলল, আমি সাড়ে আটটায় তুলে আনতে যাব।

তনি ফিরে এসেছিল আটটার সময়। একা।

বাবা শোন, আমাদের স্কুল থেকে ব্রাসেলসে নিয়ে যাচ্ছে এক সপ্তাহের জন্যে। আমি যেতে পারি?

ক-জন টিচার যাবে?

বাবা! তনি ওর মাথা ভরা চুল ঝাঁকিয়ে বলেছে, আমি কি গরু না ভেড়া, মাঠে একা ছেড়ে দিলে কি করব তুমি জান না? এই দেখ, হেড মিস্ট্রেস-এর চিঠি।

তোমার মা যদি রাজি হয়। দীপক চিঠি খুলতে খুলতে বলল।

তুমি রাজি কিনা? বল। বল আমাকে।

পঁয়তাল্লিশ পাউণ্ড! দীপক একটু চমকে গেল।

আমি দশ পাউণ্ড জমিয়েছি। তপু আমাকে বলেছে পাঁচ পাউণ্ড দেবে, ওর কাগজ ফিরির জমানো টাকা থেকে।

তবু—

তোমার টাকা নেই বুঝি?

না, না আছে।

আমি এই হলিডেতে কাজ নিয়ে তোমার টাকা শোধ করে দেব।

তনি! চশমাভরা চোখ। এ-দেশের ছেলেমেয়েদের মতো কথা বোলো না।

কিন্তু আমি, তনি ভেবে বলেছে, আমি তো এ-দেশেই মানুষ হয়েছি।

এ-দেশে স্কুলে যেতে পার, কিন্তু আমরা তো এ-দেশীয় নই। আমাদের ভারতীয় মূল্য অন্যরকম।

এই শুরু হল ভারতীয় মূল্য। ভারতবর্ষে কি ধার নিলে শোধ করে না ?

তুমি যেতে চাইছ, যাবে। এর মধ্যে ধারেরও প্রশ্ন ওঠে না, শোধেরও প্রশ্ন ওঠে না ! আর কথা বোলো না।

তনি কিন্তু বাবার হাতে তিরিশ পাউণ্ড তুলে দিয়েছিল একবছর পরে। দীপক সেই টাকা বিল্ডিং সোসাইটিতে জমা করে দিয়েছিল তনির নামে।

তুমি কি আজকে সারাদিন ধ্যান করবে নাকি ?

তনি ফোন করেছিল।

আরে কখন ? কোথা থেকে ?

ডোভার থেকে।

কখন আসবে ?

বড় জোর ঘণ্টা তিনেক লাগবে।

তুমি যাও কিস্‌মিস নিয়ে এস। আর আমার জন্যে কটেজ-চীজ নিয়ে এস। ভীষণ মোটা হয়ে যাচ্ছি !

মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দেবে বুঝি ? দীপক এতক্ষণ পরে নিঃশ্বাস ফেলে হেসে বলল।

বুড়ি থপথপে মাকে প্যারিস-ফেরত মেয়ে একটুও পছন্দ করবে না। যাও তো ! কতজনের জন্যে রান্না করে রাখব বুঝে পাচ্ছি না।

ছ-'সাতজনের মতো করেতো রাখ। তনি কাকে বলে রেখেছে তার ঠিক নেই। থাকলে কাল খাওয়া যাবে।

যাও তো তুমি।

দীপক একটু ইতস্তত করে বলল, তনি যদি আবার ফোন করে ? কতবার বলেছি ওকে রিভার্স চার্জ করতে। কে কার কথা শোনে ? পয়সা ফুরিয়ে গেছে, লাইন কেটে গেল।

আমি তো মরে যাচ্ছি না। তুমি যাও তো।

আমি ওয়াশিং মেশিনটা চালিয়ে দিই। কাপড় চোপড় শুকিয়ে যাবে ওরা আসার আগে। কি সুন্দর রোদ উঠেছে। দেশের মতো।

দীপক অনিচ্ছার সঙ্গে গেঞ্জীর উপর শার্ট চাপিয়ে, জুতো পরে বেরোল। পনেরো মিনিট হাঁটা পথে দোকান। ও ইচ্ছা করে গাড়ী নিল না। বিরক্ত লাগে পার্কিং-এর জায়গা খুঁজতে। তাছাড়া একা একা সময় নিয়ে নিজের সঙ্গে একটু থাকাও যাবে। বাড়িতে থাকলেই এটা কর, সেটা কর। আর কথা। কথার শব্দ। ট্রানজিস্টারে গানের শব্দ। চারিদিক ঘিরে কেবল শব্দ।

বাবা শোন, আমি অত জোরে হাঁটতে পারছি না।

এস, আমার কোলে এস।

না। আমি বড় হয়েছি না।

কত বয়স তোমার?

ছ বছর। বব আর ডিক হাসে আমি কোলে চড়লে।

বেশ। আস্তে আস্তে হাঁটছি।

বাবা শোন, মিস্ বলেছে আমি খুব সুন্দর ছবি এঁকেছি।

কিসের ছবি?

গোল্ড ফ্লিনচ।

গোল্ড ফ্লিনচ কি?

এ মা! তাও জান না! তনি খিল খিল করে হেসে উঠেছিল, একটা পাখী, সুন্দর পাখী।

আমি তো এদেশের পাখী চিনি না।

কোন দেশ তোমার?

ভারতবর্ষ। তোমারও দেশ ভারতবর্ষ।

আমি তো দেখি নি।

দেখেছ। ভুলে গেছ।

কিছুক্ষণ পর।

বাবা আমাকে নিয়ে যাবে তোমার দেশে?

নিয়ে যাব। একটু পয়সা জমিয়ে নিই। আর বললাম না, ভারতবর্ষ তোমারও দেশ।

মা বলেছে কলকাতা আমাদের দেশ।

হ্যাঁ। ভারতবর্ষের একটা শহরের নাম কলকাতা।

আরেক দিন।

বাবা!

কি মা!

তপু বলেছে, ও বড় হলে এ্যাস্ট্রোনট হবে।

তুমি কি হবে?

পায়লট হব।

আমাকে ছেড়ে তুমি চাঁদে চলে যাবে?

তনি একটু ভেবে বলেছিল, তোমাকেও নিয়ে যাব।

আমি যে তখন বুড়ো হয়ে যাব।

তুমি কত বুড়ো হবে? এখনও তো তুমি বুড়ো।

বাঃ, আমি কি বুড়ো হয়ে গিয়েছি?

বাঃ, কাল যে তোমার পাকা চুল তুলে দিলাম?

ওঃ।

বাবা জান, ডিক বলে সব বাবারাই বুড়ো আর দুষ্টু। আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছি। বব বলছিল ডিক-এর বাবা নেই কি না, তাই ওরকম বলে।

তনি ছবি আঁকতে আঁকতে মুখ না তুলেই বলেছে, ওরকম করে ডিককে বলতে নেই, না? ও কাঁদছিল পরে।

দীপকের আট বছরের মেয়ে তনি।

ডিককে তুমি জ্যুতে নিয়ে যাবে?

ওর মা যদি যেতে দেয়, নিয়ে যাব।

ওর মা তো কাজে চলে যায়। ও একা একা থাকে সারাদিন।

বাবা শোন। ক্রীস্টমাসে তুমি আমাকে কি কিনে দেবে?

দেখা যাক, বুড়ো শান্তা ক্লজ কি নিয়ে আসে চিমনী দিয়ে।

খিল খিল হাসি।

যাঃ, শান্তা ক্লজ আবার সত্যি বুঝি। আমি কি বাচ্চা?

কি চাই তোমার?

সাইকেল।

সাইকেল চড়ে হাত পা ভাঙ্গুক আর কি! গাড়ির তলায় চাপা পড়।

সবাই তো চড়ে।

তোমার মা যদি রাজী হয়।

তুমি রাজী, কি না-রাজী!

ভেবে দেখি।

তপু বলেছে ও বড় হলে মোটর বাইক চালাবে। সুজুকী!

কোত্থেকে এত নাম জান তোমরা?

ডিক-এর মার বয় ফ্রেণ্ড যে মোটর বাইক করে আসে।

তোমার ডিক-এর সঙ্গে এত বন্ধুত্ব কেন? মেয়ে বন্ধু নেই?

মেয়েগুলো বোকা হয়।

তুমিও তো মেয়ে।

আমি বোকা মেয়ে নই। মিস্ বলেছে আমি বড় হলে কলেজে যাব।

কি পড়বে?

তোমার মত ডাক্তার হব। আমি একটা গল্প লিখেছি, দেখবে বাবা?

কই দেখি।

কি সারাক্ষণ গুজুর গুজুর করছ, খেতে আসবে না তোমরা? কখন থেকে ডেকে চলেছি। মলি ঘরে এসে বলছে। তনি তাড়াতাড়ি ওর খাতা বালিশে চাপা দিয়ে রাখল।

কি? কি হচ্ছে কি?

চল, আমরা খেতে যাচ্ছি। তনি এস। আমি পরে এসে দেখব।

আমি যেন এ বাড়ীর কেউ নই। সব সময় গুজ গুজ, ফিস ফিস। মেয়ে একটা কথা শোনে আমার? আদরে আদরে মাথায় তুলে দিয়েছ। তপু সব সময় আমাকে হেল্প করছে, মেয়েকে একটা কিছু বল, যেন কানে শুনতেই পায় না। কি মেয়ে তৈরী করেছ তুমিই জান। তনি, আজকে তুমি সব বাসন পুঁছে রাখবে।

আমিই তো পুঁছি। দীপক বলে।

তুমি কেন? ও করবে। মেয়ে হয়ে জন্মেছে না!

কালকে স্কুল আছে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুক ওরা।

শুয়ে পড়ুক! বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়া! সকালে ঘুম ভাঙবে কি করে? যেমন মেয়ে, তেমন ছেলে।

বাবা শোন—মা আমাকে দুচোক্ষে দেখতে পারে না।

তোমাকে মা খুব ভালবাসে। তুমি মার কথা শোন না, তাই মা রাগ করে।

শুনি তো!

মাঝে মাঝে তুমি শোন না।

তোমার কথা শুনি।

মার কথাও শুনতে হয়। মা সারাদিন এত খাটে তোমাদের জন্য এত করে, মাকে একটু হেল্প করতে হয় তো!

করব।

মনে থাকবে তো!

তুমি মনে করিয়ে দেবে।

তনি তুমি এখন বড় হয়েছ। তোমাকে সব সময় মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই।

আমার বয়স কত?

নয়। দীপক হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বলেছিল।

তাহলে? তুমিই তো বল আমি ছোট্ট মেয়ে।

মেয়ে তার্কিক হবে। আর কিছু না হোক।

বাবা! টি. ভি. থেকে একটু চোখ সরিয়ে আমার একটা কথা শুনবে?

কি বল।

তনি গিয়ে টি. ভি. বন্ধ করে দিল।

আঃ হাউয়াই ফাইভ হো হচ্ছিল।

হোক গে।

তোমার মা কখন ফিরবে?

তপু মাকে আনতে গেছে ক্লাস থেকে। মার নাকি একা আসতে ভয় করে।

হ্যাঁ, রাতে একা না আসাই ভাল।

বাবা শোন।

বল। দীপক নিজেকে সাবধান করে রাখল, মেয়ে কিছু আদায় করে নিতে চায় মলি বাড়ি ফেরার আগে।

কালকে রেবেকার জন্মদিন। ষোল বছরের জন্মদিন। আমি যাব।

বেশ তো!

পার্টি আরম্ভ হবে ন'টার সময়।

রাত ন'টার সময় পার্টি শুরু হবে, এ আবার কি রকমের পার্টি! শেষ হবে কখন?

ডিসকো দিচ্ছে। রাত দুটো কি তিনটেয় শেষ হবে।

অত রাত্রে—

বাবা ডিক আমাকে নিয়ে আসবে।

অসম্ভব।

বাবা, তনি বাবার মন বোঝার চেষ্টা করে বলল, তোমার ডিককে কোন ভয় নেই। ডিক মেয়েদের সে ভাবে পছন্দ করে না।

তবে তোমার সঙ্গে ওর এত, দীপক ভাল করে না বুঝে বলল, মেলা মেশা কেন?

আর কিছু নই। আমি ওর বন্ধু। তোমার যেমন রাণাদা বন্ধু। তনি যেন ছোট ছেলেকে বোঝাচ্ছে।

অত রাত্রে—

ডিক তো ছ' ফুট লম্বা। সঙ্গে তো ওর ছেলে-বন্ধু বব্‌ও থাকবে।

বারোটার সময় আমি নিয়ে আসব গিয়ে।

তুমি তো জান আমি তা হলে পার্টিতে যাব না। কারুর মা বাবা নিতে আসবে না। আর আমাদের তো পনেরো মিনিট হাঁটা পথ।

রেবেকার মা-বাবা থাকবে তো?

তনি এবার ফিক করে হেসে ফেলল। রেবেকা ওর মা-বাবাকে পাশের বাড়ির পার্টিতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তনি হাসতে হাসতে বলল, রাত দুটোর আগে ওদের বাড়ি ফেরা বারন।

তপুর নেমন্তন্ন নেই?

না। রেবেকা আর তপু দুজন দুজনকে দুচোক্ষে দেখতে পারে না।

ড্রিঙ্কস কি থাকবে?

বাবারে বাবা। ডাক্তার না হয়ে তোমার ব্যারিস্টার হওয়া উচিৎ ছিল। ড্রিঙ্কস থাকবে শুধু সাইডার আর কোক।

বেশী সাইডার খেয়ো না যেন।

সাইডার আমি পছন্দই করি না। আর কি জানতে চাও?

তনি চোখে দুস্টু হাসি রেখে বলল, পট্ চলবে কি না? চলবে না। রেবেকার বাবা-মা ঐ সর্তে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। ড্রাগ বাড়িতে ঢুকতে পারবে না।

দীপক কিছু বলল না। তনির চোখ থেকে চোখ নামিয়ে নিল। তনির চোখ গম্ভীর হয়ে এল। সে আস্তে আস্তে বলল, বাবা আমি কম্‌প্রিহেন্‌সিভ স্কুলে পড়ি, কনভেণ্টে পড়ি না। নিজেকে সামলে চলতে আমাকে ঠেকে শিখতে হয়েছে। আর তা ছাড়া, তনি হালকা ভাবে হেসে বলল, ডিক আমাকে বাঘের মত পাহারা দেয়, এধার ওধার হওয়ার উপায় নেই!

তুমি বারোটার সময় ফিরে এস।

একটা!

সাড়ে বারোটা। ব্যস্!

বেশ।

ডিক এসে নিয়ে গিয়েছিল তনিকে। ওরা চলে গেলে দীপক মলিকে বলল, পার্টিতে যাবে মেয়ে একটু সেজেগুজে তো যাবে! কি একটা জিন্ পরে যাচ্ছে!

আজকাল তো ওটাই সাজ।

কি সাজ বুঝি না। একটু শাড়ি পরাতে শেখালে পার।

আমি শেখাব তোমার মেয়েকে! সে ভাগ্য করে আসি নি। ডিক-এর সঙ্গে ওকে এত মিশতে দাও কেন?

ডিক ওর বন্ধু কেবল। মেয়েদের দিকে নাকি ওর মন নেই!

হোমোসেকস্থয়েল নাকি ও?

দীপক একটু চমকে চারদিকে দেখে নিল তপু আছে কিনা ঘরে। বলল, কি জানি। আজকালকার কারবার। তপু কোথায়?

ঘরে পড়ছে। শুতে যাবে না?

তুমি যাও। আমি মেডিকেল জার্ণালগুলো উল্টে পাল্টে দেখি।

মেয়ে না আসা পর্যন্ত তোমার চোখে ঘুম আসবে না জানি। আমি চললাম।

দীপক ঠিক জেগেছিল।

রাত সাড়ে বারোটার আগে থেকে ও ঘরে পায়চারী করতে শুরু করল। সাড়ে বারোটা বেজে যেতেই সে গায়ে ওভার কোট চাপিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। স্নো পড়ছে। দীপক ওভার কোটের ভিতরেও ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। সে রওনা দিল রেবেকার বাড়ির দিকে। অল্প পথ হেঁটে যেতে দেখতে পেল ওরা তিন জনে মিলে রাস্তায় নাচতে নাচতে আসছে। দীপক দূর থেকে দেখেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ীতে পালিয়ে এল। ওভার কোট খুলে সে জার্ণাল নিয়ে বসল।

বাবা তুমি এখনো জেগে আছ ?

এই একটু পড়ছিলাম। দীপক হাত ঘড়ি দেখে বলল, ঘড়িতে বারোটা বেজে চল্লিশ। তনি দেখল বাবা জার্নাল উলটো দিকে রেখে পড়ার চেষ্টা করছে।

সরি, আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। ওরা কিছুতেই আসতে দেবে না। চল। তনি বাবার হাত ধরে বলল।

তনি নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে বলল, ওঃ বাবা। মাথা পুছে শুয়ো কিন্তু। ঠাণ্ডা লেগে যাবে না হলে।

ঝকঝকে রোদ কখন কোন ফাঁকে পালিয়ে গেছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। দীপক বাজার করে ফিরল। রান্না ঘরে গিয়ে মলিকে জিগ্যেস করল, কি ফোন এসেছিল ?

তপু ফোন করেছিল। ও কাল সকালে আসবে। দু দিনের রান্না করে রাখছি। গল্প করার সময় পাওয়া যাবে তা হলে। কাল দিন ভাল থাকলে কোথাও ঘুরে আসব। আসুক তো আগে তনি !

তোমার মুখটা অত শুকনো কেন ?

কই ?

একটু কফি করে তুমি নাও, আমাকে এক কাপ দাও।

ফোন বেজে উঠল।

দীপক প্রায় ছুটে গেল।

হ্যালো। হ্যালো। তনি ?

বাবা।

কি তপু নাকি !

শোন আমি একটা লিফট পাচ্ছি আজকে। সন্ধ্যেবেলা পৌঁছে যাব।

খুব ভাল কথা। কখন রওনা দিচ্ছ ?

পি-পি-পি।

তপু !

লাইন কেটে গেল।

কি হল ? মলি পাশে এসে দাঁড়াল।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল। তপু আজ সন্ধ্যায় আসছে।

তপু-তনির ঐ এক দোষ। রিভার্স চার্জও করবে না, ফোন নম্বরও দেবে না। মলি রাগ করে বলল, ওরা সবসময় আমাদের পয়সা বাঁচাচ্ছে। ক-টার সময় আসবে বলল ?

সন্ধ্যাবেলা। এখন প্রায় দশটা বাজে। শনিবারের ট্রাফিক !

নাও। কফি নিয়ে যাও। তুমি তপুর ঘরটা একটু ঠিক করে দিও। মিশেল তো আজ রাত্রে থাকবে নিশ্চয়ই।

দেবখন। আর কি করব বল ?

হুভার করতে পার।

আচ্ছা।

গোলাপ ফুল কেটে বসার ঘরে সাজিয়ে রাখ। ক-টা তনির ঘরেও দিও। ও গোলাপ খুব ভালবাসে।

হুঁ! তপু থাকবে ক-দিন?

সোমবার ভোরে কোচ নিয়ে ফিরে যাবে।

ও একা আসছে?

মনে তো হল তাই।

দিনটা শুরু হল কী সুন্দর, আর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আশাকরি এই বৃষ্টিতে তনি গাড়ি চালাবে না!

মিশেল তো আছে।

তোমার মেয়ের সর্দারীও তো আছে।

তা আছে। মলি হেসে বলল, মেয়ে এখন উইমেনস লীব করছে, ও পারবে না এমন কিছু আছে?

দীপক বৃষ্টির মধ্যেই গোলাপ ফুল কাটতে গেল।

তোমার কাপড়চোপড় তো সব ভিজে গেল।

যাক গে। এই রোদ এই বৃষ্টি। লক্ষীছাড়া দেশ। এই গরম এই ঠাণ্ডা!

দীপক গোলাপ ফুলের কাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল—চল দেশে ফিরে যাই তনিকে নিয়ে।

মলি পালং শাক ধুতে ধুতে দীপকের মুখ দেখার চেষ্টা করে বলল, আসুক তো আগে মেয়ে বাড়ি ফিরে। মলি নিজের মনেই বলল, ও কি তেমন মেয়ে, আমরা বললেই মেয়ে দেশে ফিরে যাবে আমাদের সঙ্গে!

যেতেও পারে। দেশেও তো জার্নালিজম করতে পারে। দেশে মেয়েরা তো আজকাল কত কিছু করছে শুনি।

তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেশের স্বপ্ন দেখবে না ঘরের কাজ গুছিয়ে তার পরে বসবে।

যাচ্ছি। যাচ্ছি। তুমি একটু ভেবে দেখ।

দীপক কার্পেটে হুভার চালিয়ে দিল। হুভারের শব্দ দীপকের

সহ্য হয় না। কিন্তু সে যেন এখন আর কোনো শব্দ শুনতে পেল না।

বাবা শোন—কি বলতে যাচ্ছিল তনি। সেই আগেকার আবদারে মিষ্টি গলায় ?

মলি হুভারের সুইচ অফ করে দিয়ে ফোন ধরে বলল, হ্যালো ?··· ও ডিক !···ঠিক আছে। এস। চারটের সময়। মলি রিসিভার রেখে বলল, হুভার চালিয়ে দেখছি তুমি কালা হয়ে গেলে। কতক্ষণ ধরে ফোন বেজে চলেছে! আর এক জায়গাতেই তুমি পনেরো মিনিট ধরে হুভার করে চলেছ। কার্পেটটা যাবে। তুমি রাখ। আমি পরে করবখন। তুমি বরং দেখ গিয়ে বাথরুমের লকটা ঠিক করতে পার কিনা!

দীপক উপরে পালিয়ে বাঁচল।

আবার ফোন বাজছে।

মলি ফোন ধরল।

হ্যালো ?···ও প্রতিমা !···

আমরা ভাল আছি। তনি আজকে ফিরে আসছে।···কি করছি ?

এই রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত! লোকজন আসবে। তোমার কি খবর ?···

ওঃ। দেখ দু দিন পরে আবার ফিরে আসবে।···কি ? বিয়ে করে বসেছে! শোন, প্রতিমা, শোন, আমি একদিন অফিস থেকে তোমার বাড়িতে যাব। ওর বাবাকে জানিয়েছ তো ? হুঁ হুঁ হুঁ। দীপক একটু বেরিয়েছে। মলি দীপককে সিঁড়িতে দাঁড়ানো দেখে বলল। আচ্ছা-আচ্ছা বলবখন। ছেড়ে দিচ্ছি!

কি আধঘণ্টা ধরে তোমার বন্ধুর প্যানপ্যানানী শুনলে!

তোমার মেয়ে যদি বিয়ে করে বসত ? মলি রাগের ভান করে বলল।

আমি খুব খুশি হতাম।

একটা বুড়োধাড়ী বিদেশীকে বিয়ে করলে তুমি খুশি হতে?

হতাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মারা যেত। প্রতিমার হিংসে হচ্ছে নিজের স্বামী জোটে নি, মেয়ে বিয়ে করে বসল প্রায় ওর স্বামীর বয়সীকে!

জান। মলি দীপককে ভাল করে দেখে বলল, তোমাকে দেখলে মনে হয় তুমি ভীষণ ভদ্র সভ্য, সহানুভূতিশীল মানুষ। প্রতিমা আমার বন্ধু, কিন্তু কথা বলতে চায় তোমার সঙ্গে। যেন তোমার সঙ্গে কথা বললেই ওর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে!

আমার কড়া কড়া কথা শোনার জন্যে আমাকে মহিলারা ভালবাসে!

আচ্ছা! কই লুইসাকে তো কড়া কথা বল না!

কটা বেজেছে?

সাড়ে এগারোটা!

আমি একটু পার্কে হেঁটে আসি। প্রতিমাকে একটা ফোন কোরো এক সময়ে।

সে দেখা যাবে। তনি তো আসুক আগে।

তনির জন্যে কিন্তু লণ্ডন চুপচাপ অস্থির হয়ে বসে নেই। গাড়ি চলছে হুশ হুশ করে। পাশের বাড়ির গ্রীক-কর্তা-গিন্নী মেয়েদের নিয়ে বাজারে যাচ্ছে। ইস্ কি মোটা মেয়েরা, বাচ্চাগুলো পর্যন্ত মোটা। দীপক একটু হেঁটে মুখ ফিরিয়ে নিল। ও মাঝে মাঝে ওদের বিনে পয়সায় উপদেশ দেয়, বাচ্চাদের অসুখ-বিসুখ করলে। ও হাঁটতে শুরু করল পার্কে ঢুকে। টেনিস কোর্টে টেনিস খেলা হচ্ছে। ব্যাডমিণ্টন কোর্টে কালো ছেলেরা খেলছে। ফুটবল খেলা হচ্ছে বৃষ্টি ভেজা মাঠে। সবাই ব্যস্ত।

দীপক হাঁটতে হাঁটতে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল।

ওরা কেউ জানে না যে তনি আসছে। জানলেও ওদের ভ্রূক্ষেপ কি! দীপকের দেহের আর্টারীতে রক্ত চনমন করে উঠছে। আমার মেয়ে আসছে, আমার তনি আসছে ফিরে—দীপকের চিৎকার করে ঘোষণা করতে ইচ্ছে করল। সে বিড় বিড় করে বলল, তনি তুমি কি বলছিলে?

পাশে বসা এক বুড়ো খবরের কাগজ মুখ থেকে সরিয়ে বলল, পারডন মি, তুমি কি আমাকে কিছু বলছ?

না! দীপক হেসে বলল, নিজেকেই বলছিলাম। আমার মেয়ে ফিরে আসছে কিনা আজকে প্যারিস থেকে!

ওঃ। আশীর্বাদ হোক। আমার মেয়ে তো কুড়ি বছর আগে ক্যান্সারে মারা গেছে। ব্রেস্ট ক্যান্সার। দুটো হতভাগা ছেলেকে রেখে।

ওঃ। আমি দুঃখিত।

তোমার কাছে একটা সিগারেট হবে?

আমি স্মোক করি না। দুঃখিত। দীপক বলতে বলতে উঠে আবার হাঁটতে শুরু করল। জোরে জোরে। দুনিয়ার হতভাগারা যেন জোট বেঁধেছে ওর আনন্দ নষ্ট করবে বলে। প্রতিমার মেয়ে পালিয়ে বিয়ে করেছে। বুড়োর মেয়ে ক্যান্সারে মারা গেছে! যত্তো সব!

দীগক হাঁটতে হাঁটতে আরেক বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। এক তরুণী বাচ্চা নিয়ে বসে আছে। দেখলে মনে হয় ষোলো সতেরো বছর বয়স। বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে। দীপক নিজেকে শাসালো, মুখ দিয়ে যেন শব্দ না বেরোয়। ওর খুব ইচ্ছে করতে লাগল, একটা সিগারেট পেলে হত। সেই মেডিকেল কলেজের পর সে স্মোক করা ছেড়ে দিয়েছে।

বাবা তুমি এত দেশ দেশ করে মর কেন? ভেবে দেখ একবার তোমরা যদি দেশে থাকতে, আমার বিয়ের জন্যে তোমার ঘড়ি

পর্যন্ত বাঁধা দিতে হত!

কেন?

মা বলেছে, দেশে কালো মেয়েদের বিয়ে হয় না।

তোমার মতো সুন্দরী—

তুমি আর আমার ইংরেজ বন্ধুরা আমাকে সুন্দরী দেখে। মনে আছে, দেশে গিয়েছিলাম, আমাকে দেখে, তনি হেসে হেসে বলল, ঠাকুমার কি আফশোস—এ কালো মেয়ের বিয়ে দিবি কি করে দীপু! দীপক তর্নির কাঁধে হাত রেখে বলেছে, আমার কালো হীরেকে পেলে যে কোনো ছেলে বর্তে যাবে।

না বাবা। তনি দুষ্টু হেসে বলেছে, ছেলেরা বুদ্ধিমতী মেয়েদের দেখলে ভয় পায়। পালিয়ে যায়।

তোমার তো দেখি ভক্তের অভাব নেই।

সে তো আলাদা কথা।

ধাঁ করে ফুটবলটা দীপকের পায়ের কাছ দিয়ে ঘেঁষে গেল বেঞ্চির তলায়। দীপক চমকে উঠল। পাশে বসা মেয়েটির বাচ্চাটা প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করে দিল। দুটো ছেলে ছুটে আসছে ফুটবলের জন্যে। মেয়েটি চাপাস্বরে ওদের গালাগাল দিতে লাগল। কোথাও শান্তি নেই। মাঠে লোকে আসবে হাঁটতে, শান্তিতে বসতে, ফুটবল খেলা কেন? যত সব বাউণ্ডুলে হুলিগান জুটেছে লণ্ডনে। কালোসাদা-মেশা ছেলেটা মুখ তুলে বলটা নিতে নিতে বলল, কিছু বলছ আমাদের?

মহিলা কোনো কথা না বলে বাচ্চাকে প্র্যাম থেকে কোলে তুলে নিল।

সরি! ছেলেটা বলে দৌড়তে দৌড়তে মাঠে চলে গেল।

সরি। বল মারার সময় মনে থাকে না, সরি! মেয়েটি গজগজ করতে লাগল, বাচ্চাটাও পাল্লা দিয়ে কাঁদতে লাগল।

মেয়েটি হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। দীপক ক্লিনিকে রোজই প্রায় মা-দের কান্না দেখে, শোনে। সে সামান্য একটু বিব্রত হয়ে বলল, আমি কিছু হেল্‌প করতে পারি ?

মেয়েটি বাচ্চাটাকে জাপটে ধরে চোখ মুছে বলল, এক্সকিউজ মি। সারারাত জনি কাঁদে, জাগলেই কাঁদে। আমি আর পারি না সহ্য করতে।

দীপক এ কথা কতবার শুনেছে। সে আর শুনতে পারবে না। তনি কাঁদত না ? সারারাত সারাদিন! প্রথম সে তনিকে কোলে নিয়ে জেগে থাকত, কট্‌-এ শুইয়ে দিলেই কান্না! তারপর হঠাৎ একদিন সে সজাগ হল, আমি ক্লিনিক-এ মা-দের উপদেশ দিই, আমি নিজে কেন কাজে লাগাই না ? মলি রাত্তিরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমুত। দীপক প্রায় দু-সপ্তাহ তনির চিৎকার সহ্য করেছে, কটের সামনে গিয়ে উঁকি মেরে দেখেছে সব ঠিক আছে কিনা, মেয়েকে ছোঁয় নি। তনির রাত্তিরের কান্না থেমে গেছে নিজের থেকেই। কোলেই যদি কেউ না তুলল, কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে লাভ কি ?

দীপক বলল মেয়েটিকে তনির কথা। কী ভাবে ওর কান্না থেমেছিল।

জনি যখন কাঁদে না, তখন ওকে খুব আদর কর। যেই কান্না শুরু করবে অমনি প্র্যামে রেখে অন্য ঘরে চলে যেও।

আমার যে একটাই ঘর।

একটু কষ্ট সহ্য করে অন্য কাজে মন দিও, দেখবে সাতদিনে কান্না থেমে যাবে!

তুমি বলছ ?

উ হু! দীপক উঠতে উঠতে বলল, আমি যাই। আমার মেয়ে আসছে। বাই বাই!

থ্যাঙ্কু! বাই—ই! মেয়েটি বাচ্চাকে প্র্যামে রাখতে রাখতে বলল।

দীপক জনির চিৎকার-করা কান্না শুনতে শুনতে মাঠ পেরিয়ে ঘরের দিকে রওনা দিল। সিঙ্গল পেরেণ্ট ফ্যামিলি নিশ্চয়ই। এ দেশের আরেক গুরুতর সমস্যা।

দরজা খুলতে খুলতেও যেন শুনতে পেল সেই সাহেবী বাচ্চার বিশ্রী চিৎকার।

ঘরদোর সব পরিষ্কার। মলি এখনো রান্নাঘরে ঠুকঠাক করছে।

কি এত রান্না করছ ?

তুমি হাপাচ্ছ কেন ?

ঘড়িতে দেখলাম প্রায় একটা বাজে! একটা বাচ্চা যা বিশ্রী চেঁচাচ্ছিল না!

মনে আছে তনি কি চেঁচাতো!

মনে নেই ? মেয়েটিকে তাই বললাম। কি করে আমাদের কান্না সারাতে হয়েছিল!

এত রাগ হত না তোমার উপর! মলি হেসে বলল, বলতে কোলে তুলো না কাঁদলে। কোলে না তুলে পারা যায়! মেয়েও ছিল কোলে তুললেই কান্না বন্ধ।

আমার [illegible]-তোলা ওষুধে সেরেছিল তো কান্না শেষ পর্যন্ত!

হ্যাঁ! দু জনেরই নার্ভাস ব্রেকডাউন হবার অবস্থা হয়েছিল।

কটা বাজল ?

কেন তোমার ঘড়ি চলছে না! কিছু খাবে নাকি ?

না। তনি আসুক। একটা বিয়ার খাই। তুমি নেবে নাকি ?

না। আমার রান্না একটু বাকি আছে। সেরে নিয়ে বসছি।

আমি কিছু করব ?

তোমাকে দিয়ে আজকে কিছু হবে না। তুমি টি. ভি. খুলে বস গিয়ে তো!

আচ্ছা! আচ্ছা!

দীপক টি· ভি· খুলে দিল। বি. বি· সি· ওয়ান-এ লর্ডসে জিলেট কাপ ফাইন্যাল—মিডেলসেক্স বনাম সারের খেলা হচ্ছে।

ইস দেড়টা বেজে গেছে। ও দরজার দিকে তাকাল। মলি বিয়ার নিয়ে এসে বসল কিছুক্ষণ পর। কি যে ঘোড়ায় ডিম ক্রিকেট দেখ আমি বুঝি না। এত বোরিং না।

দীপক দরজা থেকে চোখ সরিয়ে বলল, ক্রিকেটের মতো খেলা হয়?

তমুদ্দুক ফোন করেছিল।

কি বলে?

কালকে দুপুরে ওদের ওখানে খেতে বলছিল।

হুঁ।

আমি বললাম ওদের চলে আসতে। প্রচুর রান্না করা আছে।

আসবে না কি?

বলল, কাল সকালে ফোন করে জানাবে।

হুঁ।

আরেকটা বিয়ার দেব?

দাও।

যা ছটফট করছ তুমি! খেলা দেখছ না দরজা দেখছ জানি না।

দুটো বেজে গেল।

কোথায় ট্রাফিকে আটকে গেছে দেখ!

মলি ক্যান এনে জাগে ঢেলে দিল ঠাণ্ডা বিয়ার।

বাড়িতে সিগারেট আছে?

তপুর ঘরে তো দেখলাম এক প্যাকেট পড়ে আছে।

দীপক উঠে গিয়ে নিয়ে আসল।

তুমি আবার সিগারেট ধরলে কবে থেকে?

আজকে খুব ইচ্ছে করছে।

একটা কিছু খেয়ে নিলে পারতে।

না। তনি আসুক। তুমি কিছু খেয়ে নাও।

আমি একটা আপেল খেয়ে নিয়েছি। তুমি নেবে একটা ?

না।

তনি আসুক! মলি দীপককে নকল করে বলল, কি ধন্যি করে মেয়ে জন্মেছিল বাবা!

দীপক এবার হেসে ফেলল, তোমার হিংসে হয় ?

হবে না! আমার বাবা বছরে একটা চিঠি দিলে আমি বর্তে যাই।

ইস। দীপক প্রায় লাফিয়ে উঠল, দেখ দেখ স্পিন বলে সোজা ছক্কা—

চুপচাপ।

কটা বাজল ?

মলি উত্তর দিল না।

আমার ঘড়িটা বোধহয় ফাস্ট। তিনটে বেজেছে নাকি ?

হ্যাঁ। তিনটে বেজে গেল, এখনো ওরা আসল না!

দেখ কোথায় লাঞ্চে বসেছে।

না, তনি বলেছে সোজা চলে আসবে!

বেলা চারটে। দীপক রাস্তায় বেরিয়ে দেখে এল।

বেলা পাঁচটা। দীপক ঘর আর বার করছে।

ডিক এসে বলল, হ্যালো, ডক্টর। টোনি আসে নি বুঝি ?

কেন তা বুঝতে পারছি না! ডিকের চকচকে কালো মুখে ঝকঝকে সাদা দাঁতের হাসি নিভে গেল।

ও তো আমাকে ফোন করেছিল।

কখন ?

তোমাকে ফোন করার পরেই।

কটার সময় ?

এই দশটা হবে। বলল, ওরা চা খেয়ে নিয়েছে। এক্ষুণি রওনা দিচ্ছে।

কি বলল ?

বলল তো বাড়ি ফিরে লাঞ্চ করবে। মাছ ভাত খাবে। কতদিন নাকি খায় নি!

ডোভারে একটা ফোন করব ? দীপক যেন নিজেকেই বলল।

তোমরা দয়া করে ঘরে আসবে ? মলি দরজায় দাঁড়িয়ে বলল।

কেউ, কেউ ফোন করেছে নাকি ?

তনি করে নি। দীনেশ ফোন করেছে। ওরা আজকে আসতে চাইছিল।

বারণ করে দিয়েছ তো!

হ্যাঁ।

ওরা ঘরে এসে ঢুকল।

মলি কফি আর বিস্কিট নিয়ে এল।

সাড়ে পাঁচটা বাজে মেয়ে এখনো এলো না! মলি কফি খেতে খেতে বলল।

দীপক ঘরে পায়চারি করতে করতে বলল, না, ডোভার-পুলিশকে ফোন করি।

না। ডোভার-পুলিশ কোনো অ্যাক্সিডেন্টের কথা জানে না। ঐ পরিচয়ে, চেহারায় কিছু জানলে ফোন করে জানাবে। ডিক কফি আর বিস্কিট শেষ করে উঠে বলল, আমি একটু ঘুরে আসছি!

দীপক ধাঁ করে টি. ভি-র কান মলে ছবি আর শব্দ বন্ধ করে দিল। যত বাচ্চাদের বাজে প্রোগ্রাম।

একটু বসে কফিটা খাও তো! পাগলের মতো করছ!

তুমি কি করে যে বসে আছ তা তো বুঝি না।

বসে থাকব নাকি তোমার মতো লাফাব।

তুমি কোনোকালে তনিকে দু-চোক্ষে দেখতে পার না!

তুমি কোনোদিনও আমাকে সুযোগ দিয়েছ আমার নিজের মেয়েকে দেখার!

দীপক উঠে বাথরুমে চলে গেল, দরজা বন্ধ করল দড়াম করে! মলি দু-হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। তনি আসছে না ওর দোষ! কোথায় মেয়ে ফুর্তি করছে কে জানে। না, না, তনি সেরকম মেয়ে নয়।

বাথরুমে দরজা খোলার শব্দ হল। মলি উঠে বাগানে চলে গেল। মোলায়েম হয়ে এসেছে দিন। রোদ নেমে গেছে। গ্রীষ্মকাল, তথাকথিত ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকাল চলে .[redacted]প্টেম্বর। বৃষ্টি আর পাতা ঝরার দিন শুরু হবে। [redacted] হ[redacted] আসত[redacted]কবে দিন।

উঃ মাগো! মলির হাতে গোলাপের কাঁটা ফুটে গেল, রক্ত ফুটে উঠল। সে জিভ দিয়ে শুষে নিল।

মলি। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ঘরে এস।

মলি বাধ্য মেয়ের মতো ঘরে ফিরে এল।

কটা বেজেছে? মলিই এবার জিগ্যেস করল।

দীপক উত্তর দিল না।

কি হল তনির?

দীপক উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরাল। ওর হাত কাঁপছে।

আমি প্রায় সব হাসপাতালে ফোন করেছি, কোনো খবর নেই। দীপক ফাঁকা গলায় বলল।

কি হতে পারে?

হঠাৎ দরজায় বেল। সুর বেজে ওঠে। দু' জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে।

ইয়েস? দীপক দরজা খুলে বলল।

তুমি কি ডক্টর বোস?

হ্যাঁ। তোমরা কে?

আমরা পুলিশ অফিসার। অত্যন্ত দুঃখিত—

আমার মেয়ের—

টনিমা বোস?

হ্যাঁ। কোথায়?

চ্যারিংক্রস হাসপাতালে। গাড়ির অ্যাকসিডেণ্ট—

ডিক পাশে দাড়িয়ে বলল, আমি ড্রাইভ করছি।

দীপক ডিক-এর পাশে উঠে বসল।

মলি পিছনে প্যাসেঞ্জার সীটে।

মলি শুকনো চোখে নিজের মনে জপ করে যেতে লাগল—তনি আমাকে ভালবাসার সুযোগ দে। লক্ষীছাড়া মেয়ে আমাকে যেন ভালবাসার সুযোগ দেয়। মা! জপের মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ল তপু এসে পড়তে পারে। কিছুই বুঝতে পারবে না বাড়ি খালি কেন। ও পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে দীপককে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। প্যাসেঞ্জার সীটে একা বসে বসে মনে হল সে যেন চিরকালের জন্যে স্বামীকে হারিয়ে ফেলেছে।

বাবা শোন—দীপকের কানে শুধু দুটো শব্দ ওর চোখ কান ভরে বাজতে লাগল। তনি কি বলতে যাচ্ছিল? বাবা শোন—সেই আবদারের মিষ্টি গলায়! বাবা শোন—!

শনিবারের সন্ধ্যার ট্রাফিক। লণ্ডন সেজেগুজে ফুর্তি করতে বেরিয়ে পড়েছে। সিনেমা, থিয়েটার, কনসার্ট, স্ট্রিপটিজ ক্লাব, গ্যাম্বলিং, ক্যাসিনো, ডিসকো, পাব, রেস্তোরাঁ, পার্টি—সারা সপ্তাহের রোজগেরে আর অ-রোজগেরে দিন যাপনের ছুটোছুটির ক্লান্তি সে

ফুর্তির ফোয়ারায় ভুলে যাবে। ডুবে যাবে নেশায়। নেচে যাবে।

ঐ ট্রাফিক কাটিয়ে, এক সময়ে অ্যাম্বুলেন্স অন্য সময়ে পুলিশের গাড়ি সানাই বাজিয়ে ট্রাফিক কাটিয়ে, ট্রাফিক বন্ধ করে ধাঁ ধাঁ করে বেরিয়ে গেল। আরেক লণ্ডন। বিরাট লণ্ডনে কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু ঘটছে।

ডিক ট্রাফিকের লাল আলোতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভাবল, হয় তিনি মরে গেছে, নয় তার আঘাত এমন কিছু গুরুতর নয়, না হলে, পুলিশরা ওদের গাড়িতে সানাই বাজিয়ে ট্রাফিক কাটিয়ে নিয়ে যেত।

'অত্যন্ত দুঃখিত—'

শালা, বাঞ্চৎ! ওদের সাদা প্যাঁচা মুখ দেখে কিচ্ছু বোঝবার উপায় নেই।

ডিক পরের লাল ট্রাফিক লাইট উপেক্ষা করে এক্সিলেটারে জোরে পা চেপে দিল। হর্ন বেজে উঠল দুদিক থেকে।

চ্যারিংক্রস হাসপাতাল। অ্যাকসিডেন্ট অ্যাণ্ড ইমারজেন্সি ডিপার্টমেন্ট। আলো জ্বলছে। এ্যাম্বুলেন্স। পুলিশের গাড়ি। ত্রস্ততা। ক্যাসুল্টি।
